# বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা

( সেকাল ও একাল পর্ব )

# বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা

(সেকাল ও একাল পর্ব)

গীতা মুখোপাধ্যায়



কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রকাশক : কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০১২

মুদ্রক : প্রবর্তক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড হাফটোন লিমিটেড
৫২/৩ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০১২

## উৎসর্গ

আমার পরলোকগত পিতৃদেবের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

# মুখবন্ধ

শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায় এম. এ. বহু পরিশ্রম করে, নানা স্থান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 'বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নামেই পরিচয়। মধ্যযুগ ও আধুনিক কালে ভূস্বামী, জমিদার, সামন্ত ও আধা-সামন্ত সম্প্রদায় বাঙালীর মনে, সমাজ ও সাহিত্যে যে গভীর প্রভাব সূচিত করেছেন, তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ এর মূল বক্তব্য। লেখিকা তাঁর বিশ্লেষণ ও চিন্তা প্রধানতঃ সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেও প্রাসঙ্গিক ভাবে রাজনৈতিক পটভূমিকা, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও কৃষিপ্রথার আলোচনাও করেছেন।

সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি রসবস্তু যে-কোন একটা আধারকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। যে-গীতিকবিতা সবচেয়ে বস্তুভারহীন, তারও পিছনে সমাজের ও পরিবেশের সূক্ষ্ম প্রভাব থাকে। সাধারণ ভাবে সাহিত্যের প্রতি ক্ষেত্রে সমাজের স্থূল সূক্ষ্ম প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়। এর মধ্যে ভূমির প্রভাবই সবচেয়ে বেশী, বিশেষতঃ যে-গুলি বস্তুপ্রধান সাহিত্য। বাংলাদেশের সামন্ত, উপসামন্ত, জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীরা একদা এবং কিছুকাল পূর্বেও বাংলার গ্রামীণ জীবনধারাকে পরিচালিত করতেন। কর্ণওয়ালিসের কলমের খোঁচায় রাতারাতি অনেক জমিদার নিঃস্ব হয়ে গেলেন। কেউ-বা অষ্টমের ডাকে বা সূর্যাস্ত আইনের আওতায় দেউলে হয়ে গেলেন। আবার কেউ কেউ 'বনরাজ্যে শিয়াল রাজা' হয়ে সুদুর পল্লী অঞ্চলে সরল দরিদ্র গ্রাম্য সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে রইলেন। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নানা দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। একদা জমিদার সম্প্রদায় গ্রামেই বাস করতেন, ফলে সেকালে গ্রামে খানিকটা শান্তি, শ্রী ও সম্পদ ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে তার আকৃতি পালটে গেল। ইংরেজের পক্ষপুটে অর্ধশিক্ষিত অলসবিলাসী জমিদার শ্রেণী বর্ধিত হতে লাগল। উপরন্তু রাজধানী কলকাতায় হাজার প্রলোভনে সাড়া দিয়ে অনেক জমিদার গ্রামকে অবহেলা করে কলকাতার নাগরিক জীবনে 'গাণিক্যচন্দ্র' হয়ে বসলেন। সেই অবহেলা গ্রামের জীবন, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে আনল। মধ্যযুগ থেকে একালের সাহিত্যের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করলে এই নির্মম সত্যটি আত্মপ্রকাশ করবে।

শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী থেকে শুরু করে একাল পর্যন্ত বাংলার জমিদারতন্ত্র, কৃষিব্যবস্থা ও তার অবক্ষয়ী প্রভাবে গড়ে ওঠা বাংলা সাহিত্যের

বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অনেক নতুন তথ্যের আমদানি করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক, বস্তুগত তথ্যবহ ও বিশ্লেষণধর্মী। সাহিত্য বিচারের এ-পদ্ধতি পাশ্চাত্যে নতুন নয়, কিন্তু আমাদের দেশে এখনো এ ধরনের নিঃস্পৃহ বৈজ্ঞানিক সমালোচনারীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। লেখিকার এই রচনা সেই ধরণের স্বল্পসংখ্যক রচনার সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে। যাঁরা সাহিত্য সম্পর্কে চিরাচরিত প্রথায় অভ্যস্ত তাঁরা এর থেকে অনেক নতুন চিন্তার ইঙ্গিত পাবেন। লেখাটি তত্ত্ব ও তথ্যমূলক হলেও, এর মধ্যে তথাকথিত গবেষণার ভীতিজনক আস্ফালন নেই। এটি সুখপাঠ্য হয়েছে। এইজন্য তাঁকে আমি অভিনন্দন জানাই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

# নিবেদন

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে চিরকাল ধরেই ভূমির মালিকানা নিয়ে নানান জটিলতা এবং বিরোধ ছিল। সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য বহু আন্দোলন বিক্ষোভ রাজায়-রাজায়, রাজায়-প্রজায় সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূমিব্যবস্থার নানাবিধ সংস্কার ও পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক তা নিয়ে কতটা চিন্তা করেছেন, কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার ভালমন্দের দিক বিচার করেছেন এবং তাদের সাহিত্যের মাধ্যমে সেই বিষয়ের কতখানি প্রতিফলন ঘটেছে তারই একটি ধারাবাহিক রূপরেখা অঙ্কন করার চেষ্টা নিয়ে আমার "বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা" গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে।

এই বিষয় নিয়ে লিখবার প্রথম পরিকল্পনা আমার মনে জাগে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে পড়ার ফলে। সামন্ততন্ত্রের প্রভাব যে যে উপন্যাসে দেখা যায় তিনি সেই সব উপন্যাস এবং লেখকের নামোল্লেখ করেছেন। সেই সূত্র ধরেই আমি ক্রমশঃ বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

আমার এই কাজে শ্রীঅনিলকৃষ্ণ মুখার্জী এম. এ, এল. এল. বি, বার-এট-ল মহাশয় ইতিহাস এবং আইন বিষয়ক বহু তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য এবং উৎসাহিত করেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রীতিভাজন ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। কারণ তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই পুস্তক মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করত না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনা করে দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

সর্বশেষ কে. পি. বাগচী পাবলিশার্স-এর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার এবং কর্ম তৎপরতার জন্য আমি তাঁদেরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এ ছাড়া আরও একজনের নাম উল্লেখ না করলে আমার বলা অসমাপ্ত থাকে। তিনি আমার পূজনীয়া মা শ্রীযুক্তা ঊষারাণী চক্রবর্তী। অস্পষ্ট বাংলা টাইপ্

হরফে লেখা আমার বইখানির মূল পাণ্ডুলিপি তিনি তাঁর স্বল্পদৃষ্টিতে, অসীম ধৈর্য ও আগ্রহ সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করে সর্বপ্রথম তাঁর মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর আশীর্বাদ এবং প্রেরণা আমার জীবনে সকল কাজের সহায়। আমাদের দেশের লেখিকাদের পক্ষে সাধারণতঃ যে সব প্রতিবন্ধকতা থাকে—যেমন, সময় ও সুযোগের অভাব, বহু সাংসারিক দায়িত্ব ইত্যাদি—আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সে সকল অসুবিধার মধ্য দিয়েও আমার পরিকল্পনাকে যথাসাধ্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। সে কারণে ত্রুটি বিচ্যুতি হয়তো কিছু থাকতে পারে। তবে সহৃদয় পাঠকের সমাদৃতির মধ্য দিয়েই আমার প্রচেষ্টার সফলতার যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হবে আশা রাখি।

চারুচন্দ্র কলেজ
**রথযাত্রা**

**গীতা মুখোপাধ্যায়**

# বিষয় সূচী

# ভূমিকা

বাংলাদেশের সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসকে কালানুক্রমে দুই পর্যায়ে ভাগ করে দেখানো যায়, (১) বাদশাহী ও নবাবী আমলের জমিদারি রূপ, (২) ইংরেজ আমলের জমিদারিপ্রথা ও তার পরবর্তীকাল।

"সামন্ততন্ত্রে শোষন" বলতে বোঝায় বাদশাহী আমলের তথা নবাবী আমলের জমিদারিপ্রথা। এই আমল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতিমধ্যে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা ও নূতন নূতন আইনের প্রবর্তনে জমিদারতন্ত্রের বিবর্তন ঘটেছে।

"সামন্ততন্ত্রের একাল" বলতে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে শুরু করে স্বাধীনতা লাভের পর জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ ও তার প্রভাব কাল পর্যন্ত ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন যুগের সামন্ত শাসনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন কবি ও সাহিত্যিকদের রচনায়। তাই সামন্ততন্ত্রের সেকাল ও একাল বোঝাতে সেকালের ও একালের লেখকগোষ্ঠীর বিশিষ্ট কতকগুলি গ্রন্থকে নিরিখ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে—যার মধ্য দিয়ে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে জমিদারিপ্রথার উদয়-বিলয়ের কার্যকারণ চরিত্রচিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বহু আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে একদিন যেমন সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল আবার তেমনি আভ্যন্তরীণ জটিলতা ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রজা-বিদ্রোহের আঘাতে আঘাতে সামন্ত শাসনের ভিত্তিমূল ক্রমশঃ দুর্বল হতে হতে কি-ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল তারই একটি ধারাবাহিক সমালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে।

যেসকল কবি সাহিত্যিকের গ্রন্থ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে—কালের বিচারে তাঁরা যেমন বিভিন্ন যুগধর্মের অধীন সামন্তপ্রথা সম্পর্কে সকলের দৃষ্টিভঙ্গিও সমান নয়। সামন্ত শাসনে 'কু' ও 'সু' দু-দিকই তাঁদের গ্রন্থে ধরা দিয়েছে। কেউ কেউ নিজে ব্যক্তি-জীবনে সামন্তশ্রেণীর অত্যাচারে হয়তো বা তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন—তাই তাঁদের রচনা সোচ্চার হয়ে উঠেছে জমিদার শ্রেণীর নিন্দায়। আবার কেউ আছেন যারা হয়তো জমিদার বংশোদ্ভূত অথবা জমিদারশ্রেণীর দ্বারা উপকৃত তারা এই জমিদারিপ্রথা অবলুপ্তির বেদনায় বিষাদ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন আবার কোনও লেখক আছেন আশাবাদী, সামন্ত শাসনের

শোষণের অবসান ঘটিয়ে গণশক্তির অভ্যুত্থান ঘটতে চলেছে দিকে দিকে—প্রজা বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে—তাঁরা সাগ্রহে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাকে।

কোনও কোনও রচনায় বিলাস-ব্যসনপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল সামন্ত চরিত্র এবং তার অন্তর্ঘাতের সামগ্রিক রূপায়ণ যেমন ঘটেছে আবার, কোনও লেখক সামন্ত চরিত্রের বদান্যতা ও মহানুভবতার বিশ্লেষণ করেছেন সামন্তশ্রেণীর পরিবর্তে পুঁজিবাদী বণিক প্রাধান্যকে মেনে নিতে পারেন নি। সেই সঙ্গে এ কথাটিও প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে প্রকৃত প্রজাশোষক আসলে বনেদী জমিদারশ্রেণীর নন। তাঁদের নামে শোষণ করে আসলে নায়েব গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীরা। তাদের অত্যাচারেই ঘরে ঘরে প্রজা-কৃষকের লাঞ্ছনা ঘটে আদালতে তারা সুবিচার পায় না—কারণ আইন আদালতও ধনীর জন্য দরিদ্রশ্রেণীর জন্য নয়। জমিদার ও প্রজার মাঝখানে এই মধ্যস্বত্বভোগীরা আপন স্বার্থে প্রজাদের যেমন শোষণ করে অন্যদিকে জমিদারের চারিত্রিক দুর্বলতা, বিলাস ব্যসন ও ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে তাঁদেরও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেন। অথচ নিন্দার ভাগী হন জমিদারশ্রেণী—যদিও কার্যতঃ অপরাধ করেন সেই মধ্যস্বত্বভোগীরা। আসল জমিদার অনেক ক্ষেত্রেই দয়ালু থাকেন হয়তো সুবিচারও করেন কিন্তু প্রার্থীর আবেদন গোমস্তা নায়েবকে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

একপক্ষ যেমন জমিদারশ্রেণীকে শোষণের দায় থেকে অব্যাহতি দেবার চেষ্টা করেছেন আবার অন্যপক্ষ এইটিই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সমগ্র জমিদারি ব্যবস্থাটি তার জন্মকাল থেকেই শোষণমূলক। কারণ জমিদারি অর্জনের মূলেও যেমন ডাকাতি লুণ্ঠন অত্যাচার তার সংরক্ষণ ও সংবৃদ্ধির জন্যও তেমনি ব্যবস্থা আছে প্রজা শোষণের। প্রজার রক্ত শোষণ করেই জমিদারের ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে ওঠে। তা তার প্রকাশ যেরকমই হোক। এবং সেই পাপের অর্থকেই অনেকে দানধ্যান ও ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যয় করে প্রায়শ্চিত্ত করে থাকেন। তাঁদের আনুকূল্যে গড়েও ওঠে বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান জলাশয়, সৌধ মন্দির। ফলে এই জমিদারবংশের মধ্যে অচিরে অন্তর্ঘাত শুরু হয়। প্রাচীন জমিদারিসংস্কার তার ঐতিহ্য চালচলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায় হয়তো বংশেরই কোনও প্রজাবৎসল স্বার্থত্যাগী সন্তান—দুই ভিন্ন ভাবধারার মধ্যে তখন প্রবল সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়—এবং উভয় পক্ষের জয়পরাজয়ের কাহিনী নিয়েই রচিত হয় গল্পের কথা বস্তু।

আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ জমিদারচরিত্রে নিজের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পূর্বপুরুষের আজন্মসঞ্চিত পাপের ঋণ তিনি পরিশোধ করতে

চান সমস্ত অর্থসম্পদকে মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করে এমন কি নিজের দেহের রক্ত মোক্ষণ করে সেই পাপরক্তের যন্ত্রণা থেকে নিজেকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা তার জেগেছে। বংশবিস্তার রুদ্ধ করে সে চেয়েছে জমিদারবংশের চিরবিলুপ্তি ঘটাতে।

একদিকে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের বিদ্রোহ আর একদিকে জমিদার বংশের মধ্যে স্বতঃবিরোধিতা জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদকে অবধারিত করে তুলেছে।

জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের পরও কিন্তু প্রজা-জমিদারের সম্পর্কের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা প্রচুর রয়ে গেল। আইনতঃ প্রজার অধিকার স্বীকৃত হলেও কার্যতঃ জমির মালিকানা নিয়ে প্রশ্নই থেকে গেল। বহু লোকের রচনায় এই অধিকারের প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে।

আসল কথা জমিদার বলতে কাকে বোঝায় এই বিষয়টির মূল বহুদূর অতীত পর্যন্ত নিহিত। জমিদারগণের উদ্ভব ক্ষমতালাভ অধিকারের সীমা নির্ধারণ, বংশাবলীর বিবরণ ইত্যাদি অনুসারে জমিদারশ্রেণীকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম দিকে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু জমিদারিব্যবস্থার পত্তন করেন ঐ শতাব্দীর শেষভাগে এই জমিদারশ্রেণীই ইংরেজ আমলে স্থিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সবচেয়ে বেশি মর্মান্তিক দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্বে বাংলাদেশে জমিদারিপ্রথার নজির পাওয়া যায় বাদশাহী ও সুলতানী আমলে এবং তারও আগে গুপ্ত অথবা পালযুগে।

সুলতানী আমলে বিভিন্ন প্রদেশে জমিদারগণ সরকারকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিত এবং কৃষকেরা তাদের এলাকায় ভূম্যধিকারী ছাড়া অপর কোনও কর্তৃত্বকে জানত না।

মোগল বাদশাহরা যাদের জমিদার বলতেন—তাঁরা ছিলেন বিশেষ কর্মে নিযুক্ত এক শ্রেণীর কর্মচারী। তাদের প্রধান কাজ ছিল ভূমিরাজস্ব আদায় করা। এই শ্রেণীর জমিদাররা বিভিন্ন উৎস থেকে আগত ছিলেন। তাঁদের কিছু-সংখ্যক বাংলাদেশে মুসলিম আক্রমণের ফলে পুরুষানুক্রমে জমিদার নাম পেয়েছেন। তাঁরা অনেকেই ছিলেন ভূস্বামী। আবার অনেকে ছিলেন জন্মসূত্রে রাজপুত্র তাঁরা দিল্লীর সম্রাটদের কিছু পরিমাণ করদান করে অর্থনৈতিক আনুগত্য রক্ষা করে চলতেন। আবার যাঁরা কেবল কর্মসূত্রে জমিদারশ্রেণীভুক্ত হয়েছেন তাঁরাও পূর্বোক্ত জমিদারদের চেয়ে কোনও অংশে কম প্রভাবশালী ছিলেন না।

তবে এঁদের মধ্যে প্রাচীন হিন্দুরাজারাই ছিলেন প্রথমশ্রেণীর জমিদার। যেমন

আসাম, ত্রিপুরা, কুচবিহার, কামরূপ, বিষ্ণুপুর, বীরভূম, ছোটনাগপুর ও রামগরের রাজারা এই শ্রেণীভুক্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন সেইসব বৃহৎ ভূস্বামীরা যাঁরা মোগলযুগে বহু কষ্ট ভোগ করে অথবা রাজানুগ্রহ লাভ করে জমিদারশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। রাজশাহী, দিনাজপুর, বর্ধমান, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভূস্বামীরা এই ধরনের জমিদার। তাঁরা নিয়মিতভাবে কিছু পরিমাণ অর্থ সরকারী তহবিলে প্রেরণ করতেন। এই অর্থ কর অথবা জমির খাজনা বাবদ দেওয়া হত। এই সকল ভূস্বামীরা ন্যাড়াজোল প্রভৃতি স্থানের সামন্তপ্রধানদেরই সমতুল্য ছিলেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী ব্যবস্থায় করদানরত কৃষকরাও 'জমিদার' আখ্যা পেয়েছিল। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ আমলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই সব জমিদারদের মধ্যে অনেকেই শোচনীয় দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, অনেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছেন আবার অনেকে দৈবাৎ টিকে গিয়েছেন। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বহু নতুন জমিদারের বা জমির মালিকের উদ্ভব হয়েছে।

তবে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত যেসকল ব্যক্তি বা পরিবার জমিদার হিসাবে গণ্য হতেন তাঁরা কেবলমাত্র জমির কর আদায়কারী বা তহশীলদার মাত্র ছিলেন না এবং তাঁদের খুশিমত বরখাস্ত করা যেত না। জমিদারদের যে কাজ প্রায় বংশগত ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তা হল নবাবের রাজকোষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নজর দেওয়া। নবাবরা সময় সময় তাঁদের কাছ থেকে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করে নিতেন—আবার দিতে না পারলে রাজা জমিদারকে কারারুদ্ধ করে রাখতেন। তারও নজির ইতিহাসে আছে। সেরকম কোনও আইন না থাকলেও এইভাবে তাঁরা মাঝে মাঝে বেআইনী কাজ করতেন। মোগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকারে অস্বীকৃত হয়ে যেসব সামন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তারাই ইতিহাসে বারভুঁইয়া নামে খ্যাত। আমরা জানি শেরশাহের সময়ই প্রথম জরিপ ও সরকারী খাজনা আদায়ের একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা হয়। তার আগে ভূমিসংক্রান্ত কোনও সুষ্ঠু নিয়ম ছিল না।

শেরশাহের সময় প্রথম সুশৃঙ্খল প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। একটি প্রদেশ কতকগুলি পরগনায় বিভক্ত হয়। সরকার মুন্সেফপ্রধান, শিকদার প্রধান নিয়ে গঠিত এবং শিকদাররা মুন্সেফপ্রধান আমিন প্রভৃতি সকলের কাজকর্মের— তত্ত্বাবধান করতেন, পরগনায় প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন শিকদার, আমিন, কোষাধ্যক্ষ, মুন্সেফ প্রভৃতি। এ ছাড়া ছিল পাটোয়ারী, চৌধুরী, মুকর্দ্দমা, চৌকিদার যারা সরকার ও জনগণের মধ্যস্থতা করত।

শিকদাররা ছিল সামরিক আর আমিন ছিল অসামরিক কর্মাধ্যক্ষ। আমিনরা শিকদারদের সাহায্যে জমির খাজনা সংগ্রহের কাজ করতেন। এই সকল সরকারী পদমর্যাদা অনুসারে বাংলাদেশে বহু পদবীর উদ্ভব হয়েছিল।

শেরশাহের সময় জমিদাররা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় যাত্রীসাধারণের নিরাপত্তার প্রতি নজর রাখতেন—ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে কারণ প্রজা-শোষক অত্যাচারী জমিদারকে শেরশাহ সায়েস্তা করতে জানতেন।

সম্রাট আকবরের সময় রাজা টোডরমল চাষীদের সঙ্গে ভূমিবন্দোবস্ত ( xabti ) করেন। অজন্মার বছর চাষীদের খাজনা মকুব করা হত এবং অন্য সময় দেওয়া অগ্রিম ঋণ যা তারা কিস্তিতে পরিশোধ করত। কর সংগ্রহকারীদের মাসিক বিবরণ পাঠাতে হত। টোডরমলের ভূমিব্যবস্থায় বাংলাদেশ চৌত্রিশটি সরকারে এবং প্রতিটি সরকার পরগনা বা মহালে বিভক্ত ছিল।

সরকারের সঙ্গে রায়তের অর্থাৎ কৃষকদের এবং খাজনা আদায়কারীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই এই ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

মোগল সরকার বড় বড় কর্মচারীদের ওপর রাজস্বসংগ্রহের ভার দেন নি। এ ব্যাপারে আমিনকে সাহায্য করত বিতিকিচি, পোদ্দার, কানুনগো, মুকদ্দম এবং পাঠোয়ারী। আমিনদের ছিল অনেকরকম কাজ যথা বিদ্রোহী জমিদারদের কঠোর হস্তে দমন করা, অনাবাদী জমির খবর রাখা এবং আবাদী জমির যথার্থ উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা। এই ব্যাপারে তাঁকে জমির জরিপকার, জমির খাজনা ধার্যকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করতে হত। তিনি পাটোয়ারী প্রভৃতিদের দ্বারা রচিত দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করেন এবং তাঁর এলাকাধীন কৃষিকার্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে সম্পর্কে সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেন। কৃষিকার্যের সময় হবার পূর্বে তিনি কানুনগো জমিদার চৌকিদার প্রভৃতির কাছ থেকে রাজস্ব সম্পর্কিত দশ বছরের কাগজপত্র গ্রহণ করে থাকেন। বিতিকিচির কাজ হল কানুনগোর কাজের তত্ত্বাবধান করা।

টোডরমলের ভূমিবন্দোবস্ত সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়। পোদ্দাররা চাষীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার বিনিময়ে রসিদ দিত। এরা ছিল খাজাঞ্চী। 'কানুনগো' হচ্ছে গ্রামের সমস্ত কৃষি আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, সরকার হল গোমস্তাবিশেষ। আর গ্রামে থাকত মুকদ্দম বা মুরুব্বী এবং পাটোয়ারী।

সুবাদার ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা, ফৌজদার রাজস্ব সংগ্রহকর্তা। জমিদার সুবেদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুবাদারকে পরিদর্শনের আহ্বান জানাতেন।

এ ছাড়া গ্রাম-বাসীদের নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। এইভাবেই সমগ্র প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হত।

অবশ্য আকবরের ভূমিবন্দোবস্ত এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করে থাকেন—"He (Ser Shah) has been rightly called a fore runner of Akbar. He anticipated him in many ways. His revenue reforms were on the same lines as those of Akbar later on." অর্থাৎ এ ব্যাপারে সম্রাট আকবর ছিলেন শেরশাহেরই অনুবর্তী। তবে এ কথা স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে মোগল যুগে জমিদারশ্রেণী শাসনব্যবস্থারও অন্যতম অঙ্গ ছিল। অবশ্য বাংলাদেশে পরে মুর্শিদকুলি খাঁ শেরশাহ, আকবর প্রভৃতির অনুসরণে সুষ্ঠু ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশে বহু পূর্ব থেকেই ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী বা সামন্তদের আধিপত্য। পূর্বেই বলা হয়েছে এ'দের অনেকেই ঘোরতর মোগল বিদ্বেষী ছিলেন—এবং মুঘলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকারের অসম্মতি জানিয়ে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এইরকম বিদ্রোহী ভূস্বামীরাই—সম্ভবতঃ সংখ্যায় তাঁরা বারোজন ছিলেন—ইতিহাসে দ্বাদশ ভূস্বামী বা বারভূ'ইঞা নামে খ্যাত হয়েছিলেন। অবশ্য বারভূ'ইঞা হিসাবে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের সম্পর্কে বহু মতান্তর আছে এবং এ'রা সকলেই যে প্রকৃত মুঘল বিদ্বেষী ছিলেন এমন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অনেকের মতে আপন স্বার্থরক্ষার খাতিরেও অনেকে মোগলদের সঙ্গে বিরোধিতা করেছিলেন। যেমন প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে দুই বিপরীত মতবাদই প্রচলিত। কেউ তাঁকে আদর্শ দেশপ্রেমিক ও বিদ্রোহী বাঙ্গালীরূপে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন আবার অনেকে তাঁর চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছেন স্বার্থপরতার অভিযোগে। তিনি নাকি মোগলসম্রাটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে ব্যর্থ হয়েই মোগলদের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। তবে আকবর বাদশাহ থেকে শুরু করে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ও তারও পরে বাংলা-দেশের বিদ্রোহী সামন্ত বা ভূস্বামীদের দমন করতে মুগলশক্তিকে যে অনেক বেগ পেতে হয়েছে সে সম্বন্ধে ইতিহাস পাঠক মাত্রেই ওয়াকিবহাল। এই সকল ভূস্বামী বংশপরম্পরায় দানশীলতা ও দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এবং স্বদেশ রক্ষার জন্য মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বশীভূত ও দমন করবার জন্য বিভিন্ন মোগলসম্রাটের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বিভিন্ন সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এবং এই সকল সুবাদারদের অত্যাচারে বহু ভূস্বামী তাঁদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন—এবং তাঁদের স্থানে নতুন লোক জমিদারী লাভ করতে লাগল। এই সকল সুবাদাররা গোপনে ইংরেজ বণিকদেরও বাণিজ্য করার সুবিধা করে দিতে থাকেন।

আবার এই সুবাদারদের অকর্মণ্যতার সুযোগেও বহু জমিদার ইচ্ছামত লুঠপাট করে আপন সীমানা বাড়িয়ে নিতে থাকেন এবং অপর দুর্বল সামন্তদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেন। বাহুশক্তির দ্বারা অনেক নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তিও জমিদারে পরিণত হন।

সম্রাট আকবরের জীবৎকালে মানসিংহ বাংলাদেশের সুবাদার নিযুক্ত হয়ে বাংলাদেশের বিদ্রোহী সামন্ত তথা বারো ভুঁইঞাদের দমনকার্যে নিযুক্ত হন। আকবরের মৃত্যুর পরও তিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ব্যাপীও সাত আট জন সুবাদার বাংলাদেশে নিযুক্ত হয়ে বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত থাকেন। জাহাঙ্গীরপুত্র সম্রাট শাজাহানের আমলেও বাংলাদেশ শাসনের জন্য ক্রমান্বয়ে চারজন সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে যাঁরা বাংলার সুবাদার ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন শায়েস্তা খাঁ, মীরজুমলা, ইব্রাহিম খাঁ, দাউদ খাঁ প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অনেকেই সুচতুরতা ও দক্ষতার বলে বহু জমি সরকারের খাসে আনয়ন করেন এবং রাজ-কোষের অর্থ বৃদ্ধি করেন, দেয় রাজস্ব দিতে না পারায় বহু জমিদার অত্যাচারিত ও ধর্মত্যাগে বাধ্য হতেন।

বাংলাদেশের শাসনকর্তা হিসাবে এই সুবাদার গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করা হল তার কারণ তাঁদেরই পরবর্তী সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলাদেশের জমিদারি প্রথার ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত রয়েছেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলাদেশের দেওয়ানরূপে দেখা দিলেন এবং ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর বছরেই তিনি বাংলার ডেপুটি সুবাদার হন এবং অপরিসীম দক্ষতা ও বুদ্ধি-চাতুর্যের দ্বারা ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।

বাংলাদেশে সুবাদারি শাসনে মোঘল সম্রাটের যুদ্ধ ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ নানাভাবে আদায় করা হত। বাংলাদেশকে নানাভাবে শোষণ করে সুবাদাররা সম্রাটের তহবিলে মোটা অঙ্ক জমা দিতে বাধ্য ছিলেন। তাছাড়া ইংরেজ-বণিকদের সঙ্গে চোরাপথে নানা ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায়ে তাঁরা আপন আপন মুনাফাবৃদ্ধি করতে থাকেন। তাঁহাদের প্রসাদে কিছু কিছু জায়গীরদার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি আখের গুছিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সকল শ্রেণীর মুনাফার শিকার ছিল ভাগ্যহত শ্রমজীবী মানুষের দল, কৃষক, মজুর ও জনসাধারণ যারা দিবারাত্র পরিশ্রম করে শাসক গোষ্ঠীর উদর পূর্তির ব্যবস্থা করত আর নিজেরা পেত লাঞ্ছনা আর নির্যাতন। অত সস্তা গণ্ডার দিনেও তাদের দুঃখ দারিদ্র বার মাসই লেগে থাকত। অন্য দিকে ইংরেজ-

বণিকের আনুকুল্য লাভ করে মোগল সুবাদারদের শাসনে ক্লিষ্ট বহু জমিদার গৃহস্ত ও সম্পন্ন প্রজা ভাগ্য ফেরাবার সন্ধানে ইংরেজের উমেদারী করার জন্য নবগঠিত শহরাঞ্চলের বাসিন্দা হয়ে গেল।

এ'রা জমিদারি প্রথার আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচণা করলেন। বাংলা সাহিত্যে আমরা এই বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর জমিদারেরই সাক্ষাৎ পাব। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য, এখন আবার সেই মুর্শিদকুলিখাঁর প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক।

মোঘল আমলের সুবাদারি শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই রাজসরকারে কর্মচারী হতে হলে ফার্সী ভাষা শিক্ষা করতে হত। ফার্সীই ছিল সে যুগের সরকারী ভাষা এমন কি নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতির জমিদারদের সভাতেও ইসলামি ভাষারই প্রাধান্য ছিল, মুর্শিদকুলিখ'ার পূর্ব থেকে বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীরও রূপান্তর ঘটেছিল। অর্থাৎ বংশ সূত্রে য'ারা ছিলেন জমিদার তাঁরা উচ্চহারে রাজস্ব দিতে না পারায় সুবাদারের কর্মচারীরা তাঁদের বিষয় সম্পত্তি কিনে নিয়ে বা গ্রাস করে বিত্তবান জমিদারে পরিণত হলেন যদিও বংশমর্যাদায় তাঁদের সে জমিদারি কৌলীন্য বা আভিজাত্য ছিল না। এই হঠাৎ জমিদারদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ( ৩য় খণ্ড ) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন "যে সমস্ত পুরাতন ভূস্বামী ও রাজবংশ টোল চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্বাহের জন্য নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি দিতেন, গুরুপুরোহিতের জন্য বার্ষিকের ব্যবস্থা করিতেন, হঠাৎ জমিদারদের নুতন শাসনে অর্থাভাবে সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা শুষ্ক হইতে লাগিল।"

যাই হোক মোগল আমলের সুবাদারী শাশন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অর্থসম্পদ যে পরিমান বাইরে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হত সেই তুলনায় কোনও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সোনার বাংলা মুঘলদের কাছে একটা শোষণের কেন্দ্র মাত্র হয়েছিল।

কিন্তু মুর্শিদকুলীখ'াই প্রথম বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিলেন। তারপর তার জামাতা সুজাউদ্দিন তাঁর প্রাক্তনের শাসনব্যবস্থার ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি বাংলার সিংহাসন অধিকার করলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুর্শিদকুলি খ'াই ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব।

সুবাদারদের শাসন ব্যবস্থায় ফৌজদার জমিদাররা দুর্ণীতিপরায়ণ আইনের সাহায্যে দেশের ফৌজদারী শাসন পরিচালনা করতেন এবং দেশরক্ষা করতেন।

কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁ আভ্যন্তরীন শান্তিরক্ষার চমৎকার সুব্যবস্থা করেন। নবাব যিনি একই সঙ্গে সুবাদার এ দেওয়ান দুইই ছিলেন তাঁরই তত্ত্বাবধানে আমিন জমিদার এবং কানুনগোরা পরস্পরের সহযোগিতায় কার্য নির্বাহ করতেন। ভারতের অন্যত্র মোগল শাসনব্যবস্থা বিনষ্ট হতে বসলেও বাংলাদেশে কিন্তু তা নবরূপ নিয়ে দেখা দিল। শক্তিমান শাসক গোষ্ঠী মাত্রেই অত্যাচারী এবং দুর্বলের পীড়ক হয়ে থাকে। কিন্তু বৃহত্তর শাসনব্যবস্থার অঙ্গমাত্র এই হিসাবে জমিদার শ্রেণী অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী ছিলেন এবং ভূমি ও কৃষিকার্যের উন্নতির ব্যাপারেও তাঁদের উর্ধতনদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। ঔদাসীন্য এবং অমনোযোগিতার জন্য যদি ভূমি ব্যবস্থার উন্নতি রুদ্ধ হয়—তার জন্য জমিদাররা নিন্দার পাত্র হতেন। কানুনগোরা বস্ত্রশিল্প ও ব্যবসা-যার দ্বারা সবচেয়ে বেশি আয়বৃদ্ধি হয়, তার যথাযথ হিসাব রাখতেন। এইভাবে নতুন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের শান্তি, ব্যবসাবাণিজ্য এবং অর্থসম্পদ সুরক্ষিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল, নবাব আলিবর্দ্দির সময়ও সেই ঐতিহ্য পূর্ণভাবে বজায় ছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁর সময় ৬১৫টি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল ১৬ জন বড় জমিদারের ওপর। এ ছাড়া আরও প্রায় ১৬০০টি পরগনার ভার ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট জমিদার ও তালুকদারের ওপর। এই সব জমিদার ও তালুক-দারদের বেশীর ভাগই হিন্দু ছিলেন। দস্তিদার, সরকার, বকসী, কানুনগো, চাকলাদার, তরফদার, লস্কর, হালদার এই সব উপাধিযুক্ত হিন্দুদের পূর্বপুরুষরা অবশ্যই মুর্শিদকুলী কিংবা তাঁর পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দিন বা আলিবর্দ্দির সময়ে মোগল দরবারের কর্মচারী ছিলেন বলে বোঝা যায়। ব্রিটিশদের আগমণের বহু পূর্ব থেকেই এই সব জমিদাররা এবং তালুকদাররা আহ্‌লকার ও মুৎসুদ্দীর পদ অধিকার করেছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলাদেশে বড় বড় জমিদারদের তৈরী করেছিলেন এবং এক এক জন জমিদারের ওপর বহুল সংখ্যক পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়েছিলেন। ফলে মুর্শিদকুলির সময় জমিদারদের গুরুত্ব ও অধিকারের সীমা যে যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল তা আনায়াসেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে এই জমিদাররাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জমিদারী দেশীয় বণিকরা গ্রাস করে নিয়েছিলেন প্রাক্তন জমিদারদের যথাসময়ে খাজনা দিতে না পারার সুযোগে। এ ছিল Sale Law-এর অন্যতম কুফল।

এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নূতন এক জমিদার শ্রেণী তৈরী হলেন। তাঁরা আসলে ছিলেন ধণী বণিক। কিন্তু বিপুল জমিদারির মালিক হবার

ফলে তাঁদের সমস্ত সঞ্চিত মূলধন এবং সেই সঙ্গে মনোযোগ নিবদ্ধ হল ভূসম্পত্তির প্রতি। ইংরেজ বণিকেরা সেই সুযোগ গ্রহণ করে এ দেশে ধীরে ধীরে নিজেদের ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তুলতে লাগল। দেশীয় বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। দেশীয় বণিকরা যখন ব্যবসা বাণিজ্য ত্যাগ করে জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হলেন তখন বিদেশী বণিকরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জগতে নব উদ্যমে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই ভাবে।

বাদশাহী আমলের প্রাক্‌কাল থেকে পলাশীর যুগ অতিক্রম করে ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত—এই হল জমিদার শ্রেণীর ধারাবাহিক রূপ-রেখা। এই পর্যন্তকেই আমরা বলেছি সামন্ততন্ত্রের সেকাল। বর্তমান গ্রন্থে সেই সেকালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে যে কবির আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনা করে সমকালীন সামন্ত প্রভাবের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা আছে।

এই সেকালের মধ্যে তিনজন কবিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তাঁরা হলেন যথাক্রমে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ। এর মধ্যে মুকুন্দরামকে বাদ-শাহী আমলের ও ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদকে তার পরবর্তী নবাবী আমলের কবি-রূপে দেখানো হয়েছে। তাঁদের রচনাকে সামগ্রিকভাবে বিচার না করে কেবলমাত্র যে যে বর্ণনা ও ঘটনায় সামন্ততন্ত্রের উল্লেখ বা সমালোচনা আছে সেই অংশগুলিই মাত্র এখানে আলোচিত হয়েছে।

সামন্ততন্ত্রের একালে অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে স্বাধীনতা উত্তর-কালের জমিদারি উচ্ছেদ পর্যন্ত জমিদার ও প্রজার অধিকার, সংঘর্ষ, তায় ভালমন্দ, সুফল কুফল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যাঁরা কাহিনী রচনা করেছেন অথবা প্রবন্ধ নিবন্ধ সে সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন সেই সব লেখকদের প্রত্যেকের গ্রন্থ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই সব লেখকরা বিভিন্ন যুগের মানুষ হলেও সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা ধারার ঐক্য তাঁদেরকে একই সমালোচনার ভিত্তিভূমিতে স্থাপন করেছে। চিন্তাসূত্রের এককত্ব তাঁদের মধ্যে এনে দিয়েছে গভীর সাযুজ্য। এই প্রসঙ্গে যাঁদের রচনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মীর মশারফ্ হোসেন, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, বিমল মিত্র, সুবোধ ঘোষ, অমিয় মজুমদার প্রভৃতি।

এইভাবে দুই পর্যায়ের লেখক গোষ্ঠীর রচনা আলোচনা করে সামন্ততন্ত্রের

সেকাল ও একালের চেহারা তার প্রতিফলন এবং তার সম্পর্কে বিভিন্ন মতের দ্বন্দ্ব এই বিষয়গুলিকে সংগ্রথিত করে আমার পরিকল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের কবি সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরাই আমার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সে সম্পর্কে কতখানি স্পষ্টতা আনতে পেয়েছি সে বিচার হবে পাঠকমহলের কাছে।

# সেকাল পর্ব

## কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে বাংলাদেশে প্রথম সুষ্ঠু জমিদারি-ব্যবস্থার পত্তন হয়। ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের রচনায় যে জমিদারিপ্রথার ইঙ্গিত আছে তা হল একান্তভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বকালীন অর্থাৎ নবাব আলিবর্দ্দির কাল।

কিন্তু তারও দুই শতাব্দীকাল আগে ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডী-মঙ্গলে যে জমিদারের শোষণের চিত্র এঁকেছেন—সে হল সুলতানী—তথা তুর্ক-আফগান রাজত্বের অবসান ও আকবর বাদশার অধিকার বিস্তারের প্রথমাবস্থার ছবি। তখন ভারতে মোগল রাজত্বকাল।

হুমায়ুনের সময় বাংলাদেশ নামেমাত্র মোগলদের অধিকারে আসে। সেখানে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে অনেক বিলম্ব হয়। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর স্বয়ং তদানীন্তন বাংলাদেশের শাসনকর্তা দাউদ খাঁকে বহিষ্কৃত করে মুনিম খাঁর ওপর বাংলাদেশের শাসনভার অর্পণ করে ফতেপুর সিক্রীতে ফিরে আসেন এই ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এর পূর্ববর্তী ইতিহাস মুহম্মদ আদিল শাহের সংক্ষিপ্ত অথচ সংঘাতসঙ্কুল রাজত্বকালে বাংলাদেশে শূর রাজারা ক্রমশঃ স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের চেষ্টায় ছিল। ১৫৬৪ পর্যন্ত এই শূর রাজাদের রাজত্বকাল। তারপর তদানীন্তন তরুণ রাজার হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তা সুলেমান কার্ণানী। বাংলাদেশের ওপর তাঁর অধিকার বিস্তৃত হল ১৫৭২ পর্যন্ত তিনি সম্রাট আকবরের প্রতি বাহ্যিক সৌজন্য বজায় রেখে বাংলাদেশ শাসন করেন এবং রাজধানী গৌড় থেকে তাণ্ডায় স্থানান্তরিত হয়। এই সুলেমান কার্ণানীর পুত্রই ছিলেন দাউদ খাঁ কার্ণানী। তবাকাৎ গ্রন্থের রচয়িতার মতে এই দাউদ খাঁ ছিলেন শাসন পরিচালনায় অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু আকবর বাদশা কর্তৃক বিতাড়িত হয়েও দাউদ খাঁ বার বার বাংলাদেশের ওপর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আক্রমণ চালাতে থাকেন। আকবর নিযুক্ত মুনিম খাঁ শত্রু প্রতিরোধের ব্যাপারে এতই উদার নীতি অবলম্বন করেছিলেন যার ফলে দাউদ কার্ণানী আক্রমণের সুযোগ পাচ্ছিলেন। শেষবারের মত মোগল সৈন্য দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে রাজমহলের কাছে ১৫৭৬-এর জুলাই মাসে সে তাঁকে চিরতরে পরাস্ত

করেন। ঐ যুদ্ধে দাউদ খাঁ নিহত হন। এবং বাংলাদেশ মোগলসাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে তারপর থেকেই। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তা মুজফ্‌ফর খানের কঠোর ব্যবস্থায় এবং রূঢ় আচরণের ফলে বাংলাদেশে নূতন রকমের কতকগুলো অসুবিধার সৃষ্টি হল। এ ছাড়াও সরকারের নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে বুখবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল—এইসব বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন পূর্ববঙ্গের ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চন্দ্রানীড় ( বাখরগঞ্জ )-এর কন্দর্পনারায়ণ, যশোরের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি এঁরা মোগলদের অধীনতাকে অস্বীকার করেন। এর পর ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা ( কলিঙ্গ ) মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এ পর্যন্ত যে ঐতিহাসিক অধ্যায় আলোচিত হল তার থেকে আমাদের গ্রহণ-যোগ্য সেইটুকুই অর্থাৎ মুকুন্দরামের বা তাঁর পূর্বসূরী মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গল রচনাকাল এবং সেই সময়কার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। ডঃ সুকুমার সেন বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য বিশ্লেষণ করে মুকুন্দরামের দেশত্যাগ কাল ১৫৪৪-এর কিছু পরে এবং গ্রন্থ রচনাকাল অর্থাৎ সমাপ্তিকাল ১৫৯০-৯৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নয় বলে মনে করেছেন। মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে মুকুন্দরামের রচনার মধ্যেই অবশ্য সর্বপ্রথম ভূমিব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের অক্ষম সুলতান মামুদশাহের সহযোগিতায় ও সুযোগদানের ফলে শেরশাহ অনায়াসে বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। শেরশাহের পর তাঁর বংশধররা বেশ কিছুকাল বাংলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু শেরশাহের নাবালক পৌত্র ফিরোজ খানের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল—এবং সেই সঙ্গে রাজা বদল হন। রাজা হলেন শূরবংশীয় ফিরোজ খানের মাতুল মহম্মদ আদিল শাহ যিনি ছিলেন একটি অপদার্থ-বিশেষ। ফলে হিমু নামে এক ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি যে সামান্য বণিক থেকে শূর-বংশের মুখ্যমন্ত্রী হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল—সে এবার মনিবের অক্ষমতার সুযোগে রাজ্যগ্রাসের চেষ্টা করতে লাগল। এর পরবর্তী ঘটনা আদিল শাহের বাংলাদেশের অধিকারচ্যুতি।

অতএব এই সময় যে বাংলাদেশে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল সন্দেহ নেই। শেরশাহের ভূমিব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীর উপর খাজনা আদায়ের ভার থাকে। বিশৃঙ্খলার ও অরাজকতার সুযোগে এইসব ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ইচ্ছামত মুনাফা অর্জন করতে থাকে। ফলে কৃষক প্রজা ও ভূমিজীবী পরিবারগুলি বিশেষভাবে অত্যাচারিত হয়। এই সম্পর্কে History of

Bengal-এ বলা আছে "...the actual imposition of imperial peace and orderly Mughal abministration on Bengal was still far off. That province remained for many years a scene of confusion and anarchy."

ডঃ সেনের মতানুযায়ী মুকুন্দরামের দেশত্যাগ কাল যদি ১৫৪৪-এর কিছু পরবর্তীকালে হয় তবে হয়তো শূরবংশের অবসানও বাংলাদেশে আদিল শাহের রাজত্ব কিংবা তারও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, অরাজকতা, কুশাসন ইত্যাদির ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণ এক শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। তারই ফলে বহু মানুষকে ঘরছাড়া হতে হয়। সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা না থাকলে যা হয়।

আকবর বাদশাহের জন্ম হয় ১৫৪২ খ্রীঃ এবং তাঁর বাংলাদেশ বিজয়ের কাল পূর্বেই বলা হয়েছে ১৫৭৪। মুকুন্দরামের গ্রন্থ রচনাকালের ব্যাপ্তি ১৫৯০ অনুমান করা হয়। অতএব এই ৪০।৪৫ বৎসরব্যাপী বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে বিভিন্ন রাজবংশ ও শাসকগোষ্ঠীর উদয়-বিলয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অপরিহার্যরূপে ধরা দিয়েছে বাস্তবরসের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে। এইসব ঘটনা যে ঘন সন্নিহিত এমন মনে করার হয়তো কোনও যুক্তি নেই। কারণ জীবনের সুদীর্ঘ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র ঘটনাই এই কাহিনীর উপাদান হয়ে উঠেছে।

তবে মুকুন্দরামের দেশত্যাগের ঘটনা ও মানসিংহের বাংলাদেশের সুবাদারী লাভ যদি এককালীন ঘটনা নাও হয়—তবু একই জীবনের ঘটনা এ কথা স্বীকার্য। অতএব শেরশাহ এবং আকবর বাদশার সমকালীন ভূমিবন্দোবস্তের ইঙ্গিত মুকুন্দরামের কাব্যে একই সঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে থাকবে। তবে মানসিংহের স্পষ্ট উল্লেখ থাকার দরুন মুকুন্দরামের রচনাকাল আকবরের রাজত্বকাল ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

( এবারে আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। আফগান শাসনের অবসান ও মোগল অধিকারের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা এই মধ্যবর্তীকাল সময় বাংলাদেশে প্রায়ই যে স্বৈরতন্ত্র দেখা দিয়েছে তা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ছিল। রাজার শাসন না থাকলে সচরাচর যা হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। উর্বরা-পতিত নির্বিশেষে ভূস্বামীরা সকল জমির রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়ে প্রজা শোষণ করতে থাকেন এবং খাজনা আদায়ের নামে লুঠতরাজ ঘরবাড়ী জ্বালানো প্রভৃতি অত্যাচার চালাতে থাকে। ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে মুকুন্দরাম স্বয়ং ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ডিহিদারও প্রায় ক্ষুদ্র জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিল। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে মৌজা

আর কতকগুলি মৌজা নিয়ে হত ডিহি। এই ডিহিদারদের সেই ভূখণ্ডের সরকারী অধিকার দেওয়া হত। তারা নিজ নিজ এলাকায় খাজনা আদায়ের নামে অত্যাচার করত। গোপীনাথ নন্দীর সরকারী খেতাব ছিল নিয়োগী। তাঁর পূর্বপুরুষ হরি নন্দীর আমল থেকেই তাঁদের তালুকে মুকুন্দরাম পুরুষানুক্রমে বাস করতেন। তালুকের নাম দামুন্যা—মুকুন্দরামের পৈতৃক পেশা ছিল চাষবাস। গোপীনাথ নন্দী অবশ্য সেলিমাবাদ শহরে বাস করতেন। তিনি সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু এই ডিহিদারের অত্যাচারেই শেষ পর্যন্ত মুকুন্দরামকে গৃহত্যাগ করতে হয়। ডিহিদারই এখন সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। সমগ্র ভূমি-ব্যবস্থাটাতেই গলদ দেখা দিয়েছে এবং সর্বত্র অসাধু ব্যাপার চলেছে, অরাজকতার সুযোগে। জমির জরিপ বা সার্ভে করার প্রথা প্রথম শেরশাহ প্রবর্তন করেন। আকবরের সময় টোডরমল্লের ভূমিব্যবস্থায় পূর্বতন পদ্ধতিই অনুসৃত হয় কিন্তু এই অরাজকতার সুযোগে জমির মাপে জুয়াচুরি শুরু হল। প্রজার আবেদন নিবেদন নিষ্ফল হল। জমি জরিপের কাজে নিযুক্ত ছিল আমিনশ্রেণী। তাদের এখন প্রবল প্রতাপ। এর মূলে আসল যে কারণ ছিল তা হল—নতুন ভূমিব্যবস্থার ফলে সরকারী তহবিলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমা দেবার দায়িত্ব ছিল জমিদার, ডিহিদার বা তালুকদারদের ওপর। এবং এই রাজস্ব আদায়ের তাগিদ দেবার জন্য আরও একশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। নির্দিষ্ট অর্থ জমা না দিতে পারলে জমিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর পীড়ন হত। এই কারণে তারা প্রজাদের ইচ্ছামত শোষণ করে মোটারকম টাকার অঙ্ক নিজেদের জন্য আদায় করে রাখত। অর্থাৎ সকল উচ্চ-শ্রেণীর অত্যাচারই শেষ পর্যন্ত পড়ত গিয়ে ভূমিজীবী প্রজাসাধারণের ওপর।

মুকুন্দরামের জীবনকাহিনীতে সেই চিত্রই সামগ্রিকভাবে ফুটে উঠেছে। সরকার, পোদ্দার ইত্যাদি নামকরণ এই সময় হয়েছিল। অনুর্বর জমিকে চাষযোগ্য ভূমি এই কথা ঘুষ খেয়ে লিখে দিত সরকার। সরকার নামটি শেরশাহের আমলেই বিশেষভাবে পাওয়া যায়। শেরশাহ প্রদেশকে কতকগুলি সরকারে বিভক্ত করেন এবং এই সরকার দুজন কর্মাধ্যক্ষ—যথা মুন্সেফপ্রধান এবং শিকদার এঁদের দ্বারা পরিচালিত হত। বলাবাহুল্য, এই সরকার প্রধানেরা ছিলেন বিচার ও আইনের দণ্ডমুণ্ডকর্তা। কিন্তু সেই সরকার সম্পর্কেই মুকুন্দরাম লিখেছেন—

সরকার হইল কাল, খিলভূমি[১] লেখে লাল[২] বিনা উপকারে খায় ধুতি[৩]।

অতএব ন্যায়দণ্ডের কর্তাই যখন ঘুষ খেয়ে বেআইনী কাজ করেন তখন সামান্য

১। খিলভূমি—অনুর্বর জমি। ২। লাল—চাষযোগ্য জমি। ৩। ধুতি—ঘুষ।

প্রজারা যায় কার কাছে। অথচ শেরশাহের সময় থেকে ভূমির উর্বরতা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল।

উপরন্তু আছে পোদ্দারের অত্যাচার। এই পোদ্দারশ্রেণী সম্পর্কে ঐতিহাসিক সংজ্ঞা হল—The Potdar or Khizandar received money from cultivators and issued receipts for all payments. (History of India Since 1526—By Mahajan and Sethi—Third edition, page—88)

এই পোদ্দাররা প্রজাদের কাছে যমস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব আদায় করে প্রতি টাকায় আড়াই আনা কম হিসাবে রসিদ দিত অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেছিল ফলে সমস্ত কিছুর আঘাত গিয়ে পড়েছিল প্রজাদের ওপর। অথচ শেরশাহ এবং আকবর বাদশাহ দুইজনেই তাঁদের ভূমিবন্দোবস্তের মধ্যে কৃষক ও প্রজাগণকে জায়গীরদার ও জমিদারের প্রলোভন ও উৎপীড়নের সমস্ত রকম কৌশল থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে—ডিহিদারের অত্যাচার চরমে উঠেছে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্য সরকারী কর্মকর্তারা। মুকুন্দরাম অবশ্য এই সমস্ত ব্যাপারটাকেই প্রজার পাপের ফল বলে অদৃষ্টকে দায়ী করেছেন। কারণ যা হবার নয় তাই হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জানা উচিত ছিল যে সমগ্র ভূমিব্যবস্থার মূলেই শোষণের একটা সুযোগ রয়ে গেছে—যেটা যুগে যুগে বেড়েই চলেছে—কমে নি এতটুকু।

ডিহিদারের পাওনাগণ্ডা মেটাতে প্রজাদের শেষ সম্বল কড়িগুলোও শেষ হয়ে যায় অথচ ধান্য গরু কেনার লোক নেই যার বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

স্বয়ং জমিদার গোপীনাথ নন্দীও মহা বিপদে পড়লেন। ডিহিদার মামুদ শরিফের ক্রমবর্দ্ধমান, অত্যাচার থেকে নিজের তালুকের প্রজাদের রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি আমলাতন্ত্র প্রবল হয়ে উঠেছে। এদিকে চারিদিকে পেয়াদা নিযুক্ত হয়েছে পাছে প্রজারা খাজনা না দিয়ে পালায় তাদের দরজায় কড়া প্রহরা বসান হয়েছে। নিরুপায় প্রজারা তখন বাধ্য হয়ে নামমাত্র মূল্যে ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রয় করে দেয় অর্থ সংগ্রহ করতে। এইভাবে দামুন্যা গ্রামের সকল প্রজার অন্যতম ভুক্তভোগী মুকুন্দরাম একদিন বর্দ্ধমানের দামুন্যায় ছয়-সাতপুরুষের বাসভূমি ত্যাগ করে মেদিনীপুরের দিকে যাত্রা করলেন। এই ছিন্নমূল জীবনের ব্যথা মুকুন্দরামকে চিরদিনের জন্য দুঃখবাদী কবি করে রেখেছে। এবং এর মূল কারণ ভূমিব্যবস্থার অদূরদর্শিতা।

সুলতানী আমলের বাংলাদেশ সম্পর্কে ইবনবতুতা যদিও মন্তব্য করেছিলেন যে বাংলাদেশের মত এত সুলভ ও সস্তার জিনিসপত্র তিনি অন্যত্র দেখেন নি কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে ধনীরাই সে যুগে ভোগ বিলাস করত। কৃষিজীবীরা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র।

শেরশাহ এবং আকবর বাদশাহ প্রজাদের দুঃখদুর্দশা মোচন এবং অত্যাচারী জমিদার, জায়গীরদারের শোষণের অত্যাচার থেকে তাদের মুক্ত করার মহান পরিকল্পনা নিয়ে যে কাজ করেছিলেন তা অদূরভবিষ্যতে তাঁদের রাজত্বকালের মধ্যেই যে কত ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে মুকুন্দরামের এই ঘটনা তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমনি হয়তো সে যুগে ভুরি ভুরি ঘটনা হামেশা ঘটতো মুকুন্দরাম তার একটিরই সাক্ষী তবু সে ঘটনা যেন অসংখ্য ঘটনার প্রতীকস্থানীয় হয়ে উঠেছে। এই কারণেই ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করে থাকেন "Mukundarm's work depicts a graphic picture of the Social & Economic conditions of Bengal of his time and it is for this that Prof. Cowell has described him as the 'Crabbe of Bengal."

এর পরে আরও বহু বিক্ষিপ্ত বর্ণনায় মুকুন্দরাম ভূমিবন্দোবস্তের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। সেই অংশে মুকুন্দরামকে কেবল বাস্তববাদী নয় তীব্র Satirist-ও বলা চলে। যেমন বনের পশুদের দেবী চণ্ডীর নিকট সমবেত আবেদন। ইতিহাসের গবেষক মোরল্যাণ্ডের মতবাদ এ প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে মোগল আমলে দেশের ক্ষুদ্র মানুষ অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যেই দিন কাটাত কারণ জিনিসপত্র সস্তা হলেও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত দীন ছিল। তবে সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন যে কোনও কোনও এলাকায় বাসিন্দারা স্থানীয় রাজপুরুষের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে কখনও কখনও সুফল পেত।

আবার মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থের আলোচনা করে তার ঐতিহাসিক উপাদানে কিছু সন্ধান করা যাক। এ বিষয়ে চণ্ডীমঙ্গল আখ্যানের দুটি বিষয় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ কবির আত্মপরিচয় এবং দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থের বিষয়বস্তু অর্থাৎ সেই সব অংশ যা সমকালীন রাজনৈতিক ও সমাজজীবনকে প্রতিফলিত করে।

গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে গোপীনাথ নন্দী ওরফে নিয়োগীর উল্লেখ আছে। গোপীনাথ নন্দীর তালুকেই মুকুন্দরাম ছয়-সাত পুরুষ যাবৎ বসবাস করতেন এবং চাষবাসই ছিল তাঁদের জীবিকা। নিয়োগী উপাধিটি অবশ্যই সরকারী খেতাব। এই নিয়োগীরা বিনা রাজস্বে জমি ভোগদখলের অধিকারী হত অথবা তাঁরা ছিলেন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। অন্যান্য উপাধিধারীদের মধ্যে উজির হল রায়জাদা —অর্থাৎ মোগল আমলে উজির অথবা দেওয়ানরা ছিলেন "Usually the

highets officer in the state being in sole charge of revenues and finance" আর পোদ্দাররা ছিল district treasurer-বিশেষ। অর্থাৎ এই উজিরই পরে হন দেওয়ান। তাঁদের প্রধান অমাত্যও বলা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মোগল আমলে অত্যাচারী ও বিদ্রোহী জমিদারশ্রেণীকে দমন করার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। বনের পশুরা সমবেতভাবে যে আবেদন রেখেছে তাতে প্রজাদের উপর জমিদার তথা ডিহিদার এবং সকল অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে, বিক্ষোভ সোচ্চার হয়েছে। তাদের বক্তব্য—

উই চারা খাই আমি নামেতে ভালুক
নেউগী চৌধুরী নই না রাখি তালুক।

নেউগী বা নিয়োগী ছিল গ্রামের প্রধান ব্যক্তির উপাধি-বিশেষ। চৌধুরী ছিল সামন্ত রাজাদের উপাধি অর্থাৎ হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক এই চতুঃশক্তির যাঁরা অধিকারী। গোপীনাথ নন্দীও ছিলেন নিয়োগী কারণ তিনিই ছিলেন গ্রামের প্রধান এবং তালুক-মুলুকের অধিকারী। সুলতানী আমলে অবশ্য চৌধুরীরা পরগনার রাজস্ব আদায়কারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। জমিদারদের মত এরাও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর সরকারী তহবিলে দিতে বাধ্য ছিলেন পরে অবশ্য তাদের করদানের নিয়ম-কানুনগুলোর কিছু রকমফের করা হয়।

অতএব বোঝা যায় সরকার তাঁর প্রাপ্য আদায়ের জন্য নিয়োগী, চৌধুরী বা জমিদারশ্রেণীর উপর চাপ দিতেন। নিয়োগী, চৌধুরী ও তালুকদাররা তখন অধীনস্থ প্রজাদের শোষণ করে সে কর আদায় করে নিতেন। সেই কারণেই পশুদের অভিযোগ—সরকারের নিয়োগী চৌধুরী প্রভৃতি বণিকশ্রেণীকে বাদ দিয়ে কেন সামান্য প্রজার উপর সরাসরি বর্ষিত হবে? প্রজা ও কৃষকেরা তখন তাঁদের ঊর্ধতন মালিক বলতে জমিদার ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না। জমিদার তালুকদার পর্যন্তই তাদের যোগাযোগ ছিল। জমিদার তালুকদার নিয়োগী চৌধুরীরা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। সরকারী হামলার বাতাস প্রজাদের গায়ে লাগবার কথা নয়। অথচ সরকারী অব্যবস্থার ফলে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা এবং শাসন শোষণ যথেচ্ছরূপ গ্রহণ করেছিল। মুকুন্দরাম নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে সে অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিলেন এবং পশুগণের আবেদনে সে বক্তব্যই প্রকাশিত অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে আমলাতান্ত্রিক অত্যাচার। অতএব প্রজাদের অবস্থা উভয়সঙ্কট।

মুকুন্দরামকে আকবরের আমলের লোক মনে করার আরও কতকগুলি

যুক্তিসংগত কারণ আছে। রাজা মানসিংহ ছিলেন তখন বাংলা উড়িষ্যার সুবাদার। এবং উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের দমনে আকবর তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন।

আকবরের সময় সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে বিদ্রোহ ও অশান্তি চলে তা ছিল মূলতঃ জমিদার ও প্রজা তথা কৃষকসম্প্রদায়ের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করেই উদ্ভূত। রাজা টোডরমল্ল ভূমিবন্দোবস্তের দ্বারা রাজস্বের একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়ে তুললেও বিদ্রোহ হ্রাস পায় নি। এই বিদ্রোহই পরে বারভুঁইয়া বা বারজন ভূস্বামীর বিদ্রোহে পরিণত হয়। এঁদের মধ্যে চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিতা প্রভৃতি বিখ্যাত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক কাহিনী চণ্ডীকাব্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। তথাকথিত এই বারভুঁইয়াগণ মোগল বাদশাহকে কর দিতে অস্বীকৃত হন এবং বাংলাদেশের এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য মোগল বাদশাহরা বংশপরম্পরায় যে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন তার বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে—এবং এইসব বারভুঁইয়াদের বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম সৈনিক হিসাবে দেশপ্রেমিকের যে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে তার কিছুটা তাঁদের প্রাপ্য হলেও যে সর্বাংশে সত্য নয়—সে কথাও পূর্বে বলা হয়েছে।

মুকুন্দরামের রচনায় বারভুঁইয়াদের উল্লেখ নেই কিন্তু বিক্ষুব্ধ ও জমিদারের অত্যাচারে জর্জরিত বাংলাদেশের কথা আছে। ডিহিদার মামুদ শরিফ সেই অত্যাচারী শোষকশ্রেণীর অন্যতম।

বরং সেই তুলনায় মুকুন্দরামের মধ্যে আকবর-মানসিংহ প্রীতি দেখা যায় হয়তো এই কারণেই, যে তাঁরা প্রজাস্বার্থে মনোযোগ দিয়েছিলেন। মুকুন্দরামের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ছিল না—তিনি উভয়েরই ভালমন্দ নিরপেক্ষ-ভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী কবি দ্বিজ মাধবাচার্যের নামও স্মরণ করা উচিত।

হিন্দু ভাঁড়ু দত্ত কিম্বা মুরারি শীলও যেমন অত্যাচারী, প্রবঞ্চক, মুসলমান ডিহিদার মামুদ শরিফের বিরুদ্ধেও তেমনি তিনি সোচ্চার হয়েছেন। মুকুন্দরামের মতে প্রজার পাপের ফলেই মামুদ শরিফের মত ডিহিদার হয়েছিল। শাসকেরা হয়ে উঠেছিল শোষক। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তখন সকল ক্ষমতাসীন ব্যক্তিই প্রজার উপর আপন আপন ক্ষমতাবিস্তারে সচেষ্ট। সরকার পোদ্দার প্রভৃতি সরকারী কর্মচারী যাদের উপর ভূমিসংক্রান্ত তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁরা ঐ সকল বিষয়ে শাসককে ওয়াকিবহাল করেন। কিন্তু তারাই নিত ঘুষ। আপন স্বার্থে অত্যাচার চালিয়ে যেত প্রজাদের উপর। জমিদার ভাল হলেও যে ঐ সকল

সরকারী কর্মচারীদের বাধা দিতে পারতেন না—তার দৃষ্টান্ত গোপীনাথ নন্দীর বা নিয়োগীর অসহায় নিশ্চেষ্ট অবস্থা। তিনি যেন নিজ গৃহেই পরবাসী হয়েছিলেন। যে কারণে প্রজাদের দেশত্যাগে তিনি বাধা দিতে পারেন নি গোপীনাথ নন্দীর এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মুকুন্দরাম লিখেছেন—

"প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।"

এমতাবস্থায় অত্যাচারীর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য সামান্য প্রজাদের উচ্চতর শক্তির কাছে প্রার্থনা জানাবার প্রয়োজন হয়। চণ্ডীমঙ্গলে পশুদের চণ্ডীর কাছে আবেদনের মধ্য দিয়ে প্রজাদের দুঃখবেদনাই রূপকত্ব লাভ করেছে। নিয়োগী চৌধুরী বা জমিদার তালুকদার শ্রেণীর উপর শাসকের পীড়ন তবু স্বাভাবিক—কিন্তু সামান্য প্রজার উপর এ দ্বিমুখী অত্যাচার কেন? একদিকে জমিদারি শোষণ তো আছেই অন্যদিকে আবার সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার।

আসল কথা নতুন ভূমিব্যবস্থার ফলেই এই দ্বিবিধ অত্যাচার শুরু হয়। অবশ্য বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা বহু প্রাচীনকালেও ছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বাংলাদেশের প্রাচীন ভূমিবিন্যাস সম্পর্কে যে বিস্তৃত অধ্যায় রচনা করেছেন—তার থেকে মূল কয়েকটি কথা গ্রহণ করে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশ চিরকালই ছিল কৃষি-ভূমিনির্ভর কাজেই ভূমিব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই বাংলাদেশে গ্রামের পত্তন শ্রেণীবিন্যাস এবং রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক ও অধিকারের প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। জমির মাপ, ক্রয়-বিক্রয়, দান ও দখলীস্বত্ব নিয়ে নানা ব্যবস্থা এবং বিরোধ তখনও চলত। ভূমির উর্বরতা চাষযোগ্যতা বাসযোগ্যতা ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারেই তার মূল্য এবং কর ধার্য হত। বিভিন্ন শিলালিপি তাম্রলিপিতে রাজকীয় দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দেবতা এবং ব্রাহ্মণকেই ভূমিদান করা হত। যে রীতি এবং নাম এখনও চলে আসছে দেবত্র এবং ব্রহ্মত্র জমি হিসাবে। এইসব জমি হত নিষ্কর এবং ক্রয়-বিক্রয়ের বহির্ভূত। বিভিন্ন যুগে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে অথবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ভূমিদান ও ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত রীতিনীতির উল্লেখ আছে। তবে পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে শুধু দানের কথাই আছে এবং সে দান হত 'সচৌরদ্ধরণা এবং পরিহৃত পীড়া'। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে রাজা যখনই ব্রাহ্মণ বা অপর কাউকে ভূমিদান করতেন তখনই তাঁর দানের ভাষায় কতকগুলি চুক্তির প্রসঙ্গ থাকত যথা জনসাধারণকে চোরডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করার দরুন রাজা প্রজার নিকট থেকে যে কর ভোগ করতেন—বর্তমানে গ্রহীতা সেই কর ভোগের অধিকারী হবেন.

—কারণ তিনিই হবেন ভূমির মালিক। সেই সঙ্গে তিনি দানকর্তার সকল প্রকার পীড়ন থেকেও মুক্তিলাভ করবেন।

দ্বিতীয় কথা পরিহৃত পীড়ার অর্থ অনেকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে রাজার পীড়ন থেকে দত্তভূমির প্রজাসাধারণ যে মুক্তিলাভ করেছে এজন্য তারা গ্রহীতাকে পারিশ্রমিক দান করবে।

অর্থাৎ প্রাচীনকালেও যে ভূমির করব্যবস্থা ছিল এবং রাজাই ছিলেন সে রাজস্ব গ্রহণের প্রকৃত মালিক উক্ত দানপত্রগুলি থেকে তা স্পষ্টই অনুমান করা যায়। আবার, সেই কর অনাদায়ে যে রাজশক্তি কর্তৃক প্রজাপীড়ন তখনকার দিনেও চলত তার প্রমাণস্বরূপ নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস ( ১ম খণ্ড ) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"বাংলার ভূমি দান বিক্রয় সম্পর্কিত লিপিগুলিতেও পরিহৃত সর্বপীড়া পদটির উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ভূমি যখন দান করা হইতেছে তখন দানকর্তা দানগ্রহী-তাকে উল্লিখিত সর্বপীড়া হইতে মুক্তি দিতেছেন। ইঙ্গিতটা এই যে সাধারণতঃ সকল প্রজাদেরই এইসব পীড়া বা উৎপীড়ন অল্পবিস্তর ভোগ করিতে হইবে। চাটভাট প্রভৃতি উপদ্রবকারীদের সংখ্যাও কম ছিল না। রাষ্ট্রকে দেয় কর উপকরও কম ছিল না। সম্পন্ন ও বিত্তবান গৃহস্থদের পক্ষে এইসব কর দেওয়া ক্লেশকর ছিল না, এরূপ অনুমান করা যায়। কিন্তু সমাজের অর্থনৈতিক নিম্নশ্রেণীর পক্ষে করভার একটু বেশিই ছিল বৈকি তা ছাড়া রাজপুরুষের নানা-প্রকার পুরস্কার উপহার গ্রহণ করিতেন—অর্থে ফলে শস্যে এবং অন্যান্য দ্রব্যে। পাল ও সেন আমলের ভূমি ও কৃষিনির্ভর রাষ্ট্র ও সমাজে ভূমিবান মর্ত্তের কুটুম্ব সাধারণ গৃহস্থদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বৃহৎ ভূমিহীন গৃহস্থ এবং সমাজ শ্রমিকগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা যে খুব স্বচ্ছল ছিল এমন মনে হয় না। যে দুঃখ দারিদ্র্যের চেহারা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিম্নতম স্তরে বাংলার পল্লীগ্রামে সহরের দুঃস্থ পল্লীতে আজও দৃষ্টিগোচর হয় তাহা তখনও ছিল।"

প্রাচীন বাংলাসাহিত্য চর্যাপদ কিম্বা সদুক্তি কর্ণামৃতের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্লোকে বাঙ্গালীর দারিদ্রের যে চিত্র বর্ণিত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন ডঃ রায় এবং সে যুগেও যে বাঙ্গালী সাধারণ মানুষের কত দুঃখ-কষ্টে জীবন কাটত তার প্রমাণ দেখিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে একটি মূল্যবান মন্তব্য যুক্ত করেছেন—

"সমাজের এই দুঃখ দৈন্য সম্বন্ধে রাষ্ট্র যথেষ্ট সচেতন ছিল বলিয়া মনে হয় না। অথবা শ্রেণীবিন্যস্ত, ব্যক্তিগত অধিকার নির্ভর সামন্ততন্ত্র আমলাতন্ত্র ভারগ্রস্ত, একান্ত ভূমি ও কৃষিনির্ভর সমাজের ইহাই হয়তো সামাজিক প্রকৃতি।" মুকুন্দরামের

ফুল্লরার বারমাস্যা বর্ণনায় দুঃখী প্রজা ও সম্পন্ন পরিবারের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বাস্তব চিত্র পরিস্ফুট।

অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে রাজারা বহু দানধ্যান করতেন এবং তাঁদের আনুকূল্যে বহু দরিদ্র কবি ও গুণী ব্যক্তি ভিক্ষাজীবিকা ত্যাগ করে লক্ষ্মীর মুখ দেখেছিলেন। তার নজীরও আছে। মুকুন্দরামও অন্য এক রাজার আনুকূল্যে গ্রন্থ রচনা করেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে মুকুন্দরাম যে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন—বাংলাদেশের জীবনে সেটা নূতন কিছু নয়। বাদশাহী আমলের আগেও হিন্দু-রাজত্বে যে প্রজারা উৎপীড়িত হত তারই নজির তুলে ধরেছেন ডঃ রায় বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে।

যে সামন্ততন্ত্রের আলোচনা আমরা বর্তমান গ্রন্থে করবার ইচ্ছা করেছি—সেই সামন্ততন্ত্র প্রাচীনকাল থেকে যে কত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অবশেষে জমিদার-তন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে তারও একটা বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় সেন যুগের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে।

যদিও সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিতে' বিভিন্ন বংশীয় স্বাধীন নৃপতি বিদ্রোহপরায়ণ নায়কগণ ইত্যাদি সকলকেই 'সামন্ত' আখ্যা দিয়েছেন তথাপি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রকৃত সামন্ত কারা তার একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সেই মূল্যবান মন্তব্য বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে করি।

তিনি বলেছেন—"এই সামন্তদের সঙ্গে মহারাজাধিরাজদের সম্বন্ধের রূপ ও প্রকৃতি কি ছিল পরস্পরের দায় ও অধিকার কি ছিল বলা কঠিন। এ সম্বন্ধে কোনো তথ্য অনুপস্থিত। তবে অনুমান হয়, কোনো কোনো সামন্ত তাঁহারা একেবারে মহাসামন্ত অথবা সামন্ত মহারাজ, প্রকৃতপক্ষে প্রায় স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপেই রাজত্ব করিতেন, শুধু মৌখিকতা বা দলিলপত্রে নিজেদের সেই-ভাবে প্রচার করিতেন না। তবে মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও রাষ্ট্র দুর্বল হইলে অথবা অন্য কোনো উপায়ে সুযোগ পাইলেই তাঁহারা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া বসিতেন। কোনো কোনো সামন্ত মহাসামন্ত মহারাজাধিরাজের উচ্চ-রাজ-কর্মচারীরূপেও কাজ করিতেন। সামন্ত রাজাদেরও আবার সামন্ত থাকিতেন।

পরবর্তীকালের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে সামন্তদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্যবাহিনী দিয়া এবং নিজে যুদ্ধে যোগ দিয়া মহারাজাধিরাজকে সাহায্য করা। এই সামন্ত মহাসামন্তরা বস্তুতঃ মহারাজাধিরাজেই একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। সামন্তপ্রথা এখন হইতে ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিয়াই চলিবে। এবং পাল আমলে তাহার পূর্ণতর রূপ দেখা যাইবে। এ পর্বের বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্র এবং গৌড়তন্ত্র এই আমলাতান্ত্রিক ও সামন্ততন্ত্র লইয়াই গঠিত।"

অতএব প্রকৃতিপুঞ্জের নায়ক বলতে রামচরিতে যাদের বলা হয়েছে তারাই এই সব সামন্ত নায়ক।

এ তো গেল সামন্ত নায়কদের কথা—নিজ নিজ এলাকায় যাঁরা প্রায় স্বাধীন নরপতির মত ছিলেন। অবশ্য এইসব এলাকার বিস্তৃতির ওপরই এইসব নায়কদের মর্যাদা নির্ভর করত। সে যুগে ভূমি অবশ্য খুব দুর্লভ ব্যাপার ছিল না এবং বাহুবলের দ্বারাই হোক দানগ্রহণের মাধ্যমেই হোক ভূমির অধিকার অর্জিত হত এবং সেই সঙ্গে জন্মাত পাঁচ প্রকার করলাভের অধিকার যথা, ভাগ ভোগ কর হিরণ্য এবং উপরিকর। উপরিক. বিষয়পতি, মণ্ডলপতি, দাশগ্রামিক এবং গ্রামপতিরা এই সকল কর আদায় করত।

ভূমির মাপজোখ করার জন্য তখন যে কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন তাকে বলা হত প্রমাতৃ। জমির উর্বরতা, অনুর্বরতা অনুসারে কর ধার্য হত। সকল গ্রামবাসীর কিছু না কিছু জমি থাকলেও জমির প্রকৃত অধিকারী কে অর্থাৎ রাজা না জনসাধারণ তা নিয়ে প্রাচীনযুগেও নানা সমস্যা দেখা দিত ভূমি নিয়ে লড়াইও চলত। তবে শেষ পর্যন্ত ভূমিজীবী প্রজাদের পালন রক্ষণ ইত্যাদির অধিকর্তা হিসাবে রাজা বা রাষ্ট্রই হলেন ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী। এইসব রাজারা আবার ভূমি উন্নয়ন দানধ্যান ইত্যাদি করতেন। বহু কবি সাহিত্যিক তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন এবং সেই দানের ভূখণ্ড গ্রহণ করে বহু ভূস্বামী কালে প্রতাপশালী হয়ে উঠতেন। তবে তখনকার দিনে রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে গ্রামপ্রধানদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত।

সম্ভবতঃ এই সকল গ্রামপ্রধানই কালে নিয়োগী, চৌধুরী ইত্যাদি জমিদারি খেতাব লাভ করেন এবং রাজা ও প্রজার মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীর কাজ করেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে পাল রাজাদের সময়ই প্রকৃতপক্ষে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয় এবং বাংলাদেশেও সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এই সময়ই হয়। এই সকল ক্ষুদ্র সামন্ত নায়কগণ মহারাজাধিরাজের রাষ্ট্রাধিকারের মধ্যে প্রায় স্বাধীন নরপতির মতই আচরণ করতেন, এবং তার প্রমাণস্বরূপ, পালযুগের লিপিমালা এবং রামচরিতের[১] উল্লেখ করা যায়।

সুলতানী আমল থেকেই চৌধুরী, মোকদ্দম নামক কর্মচারী পদ সৃষ্ট হয়েছিল —এঁরা প্রাদেশিক সরকার ও প্রজাদের মধ্যস্থতা করতেন। সরকারের সঙ্গে এঁদেরই ছিল প্রত্যক্ষ যোগ।

১। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত্র—পালযুগের বঙ্গাধিপ রামপালদেবের কাহিনী, রামায়ণের রামচন্দ্রের রূপকে বিরচিত। রামচরিত্র রামপালদেবের ঐতিহাসিক কীর্তির কাহিনী।

এবার আবার পূর্বপ্রসঙ্গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কথায় ফিরে আসা যাক। প্রজার উপর সামন্ত বা জমিদারশ্রেণীর উৎপীড়নের ঘটনা যে চিরন্তন ব্যাপার এবং মুকুন্দরামের জীবনে তার পুনরাবৃত্তিই মাত্র ঘটেছে কেবল একটু ভয়াবহভাবে সে কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

সেই কারণেই বোধ হয় কবি হিসাবে কবিকঙ্কণ স্বপ্ন দেখেছিলেন এক আদর্শ শোষণ বিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের। তাঁর গুজরাট নগরপত্তনের বর্ণনায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিজে অত্যাচারিত ছিলেন বলেই তিনি এমন এক রাজ্যস্থাপনের কল্পনা করেছিলেন—যেখানে প্রজার অধিক্যার কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না। এবার সে কথায় আসা যাক।

কাহিনীর মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কলিঙ্গ বিজয় ও গুজরাট নগরের পত্তন। সমসাময়িক ইতিহাসের ছায়াপাত এখানে অবশ্যই ঘটেছে এ কথা বললে অসম্ভব কিছু বলা হবে না। আকবর বাদশাহের দুটি বিজয় অভিযান হয়েছিল কলিঙ্গ এবং গুজরাটে। মুকুন্দরাম সে সংবাদ অবগত থাকবেন।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে গুজরাট ও কলিঙ্গের কল্পনা কেন স্থান পেয়েছে সে সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"কলিঙ্গ ও গুজরাট এই দুইটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জনপদের নাম কেন ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা কৌতূহলপূর্ণ-অনুমানের ব্যাপার। কলিঙ্গ যাহা হউক প্রতিবেশী প্রদেশ—মেদিনীপুর হইতে উড়িষ্যার ব্যবধান তখনকার দিনের পক্ষেও খুবই সামান্য। কিন্তু ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তস্থিত সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত গুজরাট দেশ কেন যে বাঙ্গালী কবির কল্পনাকে অধিকার করিয়াছিল তাহার কারণ ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। ষোড়শ শতকে ঐতিহাসিক সংঘটনের দিক দিয়া না হইলেও হয়ত কোন ধর্মগত আন্দোলনের সূত্র ধরিয়া গুজরাট বাংলার মনোরাজ্যের অতি সন্নিহিত হইয়া থাকিবে।"

অবশ্য কবি মুকুন্দরামের পূর্বেই তাঁর অগ্রজ কবি গুজরাট ও কলিঙ্গের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। মুকুন্দরাম সম্ভবতঃ তাঁর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন তবে দ্বিজ মাধবের কাব্য সারদা চরিতের রচনাকাল যদি বিভিন্ন বাদানুবাদ সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধরা হয়—তবে কবি দ্বিজ মাধবও যে আকবর বাদশাহের রাজত্বকালের মানুষ ছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ তাঁর কাব্যে পাওয়া যাবে। ইতিহাসের বিবরণ অনুসারে জানা যায় সম্রাট আকবর ১৫৭৩ সালেই তাঁর গুজরাট বিজয় সম্পন্ন করেন এবং ১৭৫৮ সালে মারাঠাদের অধিকারে আসার পূর্ব পর্যন্ত গুজরাট মোগল কর্তৃত্বাধীনে থাকে।

অতএব ১৫৭৯-র পূর্বেই গুজরাট বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। উড়িষ্যা বা কলিঙ্গ

বিজয় করতে মুঘলদের বহু সময় লাগে। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে ১৫৯২ সালে মানসিংহের আঘাতে উড়িষ্যা মুঘলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ কলিঙ্গরাজ মোগল বাদশাহের বিরক্তির কারণ হয়েছিল। উড়িষ্যা বিজয়ের ফলও যে সন্তোষজনক হয় নি তার প্রমাণও History of Bengal-এ মেলে। এই বিষয়ে উক্ত গ্রন্থে যে মন্তব্য আছে তা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি "...The conquest of Orissa did not bring peace to the Mughals in the Eastern Provinces ; it only shifted the disease to another part of the body politic."

অতএব 'আকবর বাদশাহ' কিম্বা রাজা মানসিংহের প্রতি অনুরাগী কবিরা যে কলিঙ্গ রাজ্যের প্রতি কিছুটা বিরূপ এবং সেই সঙ্গে মোগল অধিকৃত গুজরাট নগরের শান্তিশৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্তের প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকবেন তাতে খুব আশ্চর্য মনে হয় না। কলিঙ্গ রাজার রাজ্য ভাসিয়ে গুজরাট রাজ্যের বসতি নির্মাণচিত্রের মধ্যে কি তারই আভাস ফুটে ওঠে না। দেবী চণ্ডী কালকেতুর প্রতি কৃপা বর্ষণ করতে গিয়ে অহেতুকভাবেই কলিঙ্গ রাজ্যের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন। সম্ভবতঃ দাউদ খাঁ কারণানীর বার বার মোগল বিদ্রোহে 'এবং উড়িষ্যা লুণ্ঠনের ঘটনার' এ ছিল পরোক্ষ শাস্তি। কারণ উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করেই আফগান-মোগল সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। অতএব মনে হয় ধর্মান্দোলনের সূত্র ধরে না হলেও আকবর বাদশাহের দ্বিগ্বিজয়ের সূত্র ধরেই ঐ দুই রাজ্য বাঙ্গালী কবির কল্পনা জগৎ অধিকার করেছিল। অথচ চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের প্রথম দিকে আছে, কলিঙ্গ-রাজের প্রতি স্বপ্নাদেশ দিয়ে দেবী তাঁকে যুদ্ধে জয়ী করে পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি করার নির্দেশ দিয়েছেন অবশ্য তাঁর পূজাপ্রচারের সর্তে। কলিঙ্গরাজ সেই আদেশ মত প্রতি ঘরে ঘরে দেবীপূজার আদেশ প্রচার করলেন এবং স্বয়ং মহাধুমধামে চণ্ডীপূজা করলেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরে দেখা যাচ্ছে দেবী চণ্ডী আপন বরপুত্র কালকেতুর রাজ্য সংস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

অভয়া বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধুপতি।
দেহ নদ নদীগণ আমার সংহতি ॥
হাজার হাজার কলিঙ্গ দেশ বসাব নগর।
ঘোষণা রাখিব বীরের অবনী ভিতর ॥

দেবীর নির্দেশমত প্রবল প্লাবন ও ঝড়ঝঞ্ঝায় কলিঙ্গ রাজ্যের প্রজারা বাস্তুচ্যুত হল। শস্যক্ষেত্রসকল মজে গেল। নিরুপায় প্রজারা তখন আশ্রয়লাভের জন্য গুজরাট রাজ্যের অভিমুখী হল।

কলিঙ্গরাজ দেবীপূজায় ফাঁকি দিয়েছিলেন কিনা সে কথার উল্লেখ চণ্ডীমঙ্গলের কবি করেন নি—এবং সে প্রসঙ্গ প্রয়োজনীয়ও নয়।

আমরা আলোচনা করব কলিঙ্গ রাজ্যের প্রজাদের দুর্দশা নিয়ে—যা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী, আর সেই সঙ্গে কালকেতুর নতুন রাজ্য পরিকল্পনার আদর্শ—যেখানে প্রজা অধিকারের মূল কথাগুলি স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

কলিঙ্গ রাজ্যে দুর্যোগের ব্যাপারটিকে দৈব নিবন্ধন হিসাবে বর্ণনা করলেও বাস্তবে এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্লাবন, অজন্মা লেগেই থাকে এবং সেই সময়ে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না। ভূমিজীবী প্রজারা সাধারণতঃ শস্যের উপরই নির্ভর করে থাকে। কিন্তু শস্য উৎপাদন না হলে অথবা নষ্ট হলেও রাজার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় ঠিকই আদায় করা হয়। সর্বস্বান্ত হয়েও তাই প্রজাদের প্রথমেই ভাবনা হয় কিভাবে রাজা জমিদারদের খাজনা মকুব করানো যায়। সকল প্রজারা যখন হৃতসম্পদের জন্য শোকার্ত—বুলান মণ্ডলের মত বাস্তববাদী প্রজার তখন অন্য ভাবনা জাগে—

বুলান মণ্ডল বলে শুন প্রজা ভাই।
হাজিল বিলের শস্য তাহে না ডরাই।
মজীল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।
প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি॥

রাজা সামন্ত জমিদার ইত্যাদি সকল শ্রেণীর প্রতি চিরকালের প্রজাদের একই মনোভাব। প্রজাশোষণের চিত্রও একইরূপ। খাজনা আদায়ের জন্য অজন্মা বা শস্যহানির বছরেও প্রাপ্য আদায় না হলে প্রজার উপর অত্যাচার ঠিক একইভাবে চলে। শস্যের এক-তৃতীয়াংশ মাসের প্রথমেই কররূপে আদায় না হলে প্রজার হাতকড়া পড়ে।

অতএব গুজরাট নগরে মুনাফালাভের আশায় কলিঙ্গ রাজ্যের সব প্রজারা পলায়ন করে গুজরাটে বসতিস্থাপনে মনোযোগ দিল।

গুজরাটের রাজ্যপাট তখন রাজা কালকেতুর। সে প্রজাদের যেসকল আশ্বাস দিয়ে নিজ রাজ্যে ডেকে নিয়েছিল—তার সবগুলিই ছিল সে যুগের প্রজাদের কাম্য। প্রথমে বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতুর উক্তিটি উদ্ধৃত করা গেল—

আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥

নাহিক বাউড়ি দেড়ি বয়্যা বস্যা দিবে কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশ গাড়ি নানা বারে যত কড়ি
নাহি নিব গুজরাট বাসে॥
পার্বণী পণ্ডক যত গুড়া লোণ সানা ভাত
ধানকাটি কলম কসুরে।
যত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে॥
যত বৈসে দ্বিজবর কার নাহি নিব কর।
চাষ ভূমি বাড়ি দিব দান॥

শেষ চরণটির পাঠান্তর হল—

যত প্রজা বৈসে ঘর তার না লইব কর
চাষি জনে বাড়ি দিব ধান॥

অবশ্য শুধু প্রজারাই নয় সর্বস্ব হারিয়ে কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ভূস্বামীরাও গুজরাট রাজ্যে আগমন করেছিল অতিরিক্তপাঠে তার উল্লেখ আছে। তাদের সকলের ক্ষেত্রে কালকেতু যে আশা দিয়েছিল তার সারমর্ম হল—

ইচ্ছামত চাষবাসের উপর জুলুম থাকবে না তার নবনির্মিত রাজ্যে। তিন সনের খাজনা প্রথমেই মকুব করা হবে।

খাজনার হারও হবে প্রজাদের আর্থিক ক্ষমতার আয়ত্তাধীন। উৎকোচ সেলামী ইত্যাদি গ্রহণ গুজরাটে নিষিদ্ধ হবে। জমির ফসল বৃদ্ধি পেলেও এবং শস্য ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা প্রজার আয় বাড়লেও করের পরিমাণ বাড়ানো হবে না। সবচেয়ে বড় কথা কবি লিখেছেন—

'ডিহিদার নাহি দিব দেশে' অর্থাৎ নিজে ডিহিদারের অত্যাচারে তাড়িত হয়েছিলেন বলেই তাঁর মানসরাজ্যে তিনি ডিহিদার নামক ভয়ানক ব্যক্তিটিকে প্রথমেই বাতিল করতে চেয়েছেন। প্রজাদের নিষ্কর চাষভূমি দান করবেন—বিনা সুদে টাকা দিবেন।

এই অংশটির মধ্যে আকবরের ভূমিবন্দোবস্ত এবং প্রজানুরঞ্জকতার আদর্শ যে প্রতিফলিত হয় নি—এ কথাই বা বলি কি করে? কালকেতুকেও মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন আকবর বলে মনে হয় না কি? একদিকে বীর ও অত্যাচারী অন্যদিকে গভীর প্রজানুরঞ্জক শাসক—সম্রাট আকবর চরিত্রের এই দুই বিরোধী গুণের সমাবেশ যেন কালকেতু চরিত্রেও কিঞ্চিৎ আভাসিত হয়েছে।

মনে হয় যুগধর্ম ও প্রভাবকে মুকুন্দরাম অস্বীকার করতে পারেন নি। উপযুক্ত শাসকের অধীনে ও সুশাসনে যে রাজ্যের শোষণ ও শাসন বন্ধ হতে পারে—কাল-কেতু চরিত্রে তারই আশা রূপায়িত করার চেষ্টা আছে এ কথা মনে করলেও খুব অন্যায় হবে না মনে করি।

# ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রামপ্রসাদ ও অন্যান্য সমকালীন কবি

সমকালীন দুই কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ। একই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তর্গত বলে এই দুই কবির সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা না করে একই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

মুকুন্দরাম পর্যায়ে প্রথমেই বলে নেওয়া হয়েছে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের সময়ে যে জমিদারিব্যবস্থার উল্লেখ আছে তা হল মুর্শিদকুলি খাঁ প্রবর্তিত জমিদারি-ব্যবস্থা। এই সময় বাংলাদেশে সুষ্ঠু জমিদারিপ্রথার প্রবর্তন হয়।[১] অর্থাৎ তিনিই সর্বপ্রথম রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থার পত্তন করেন। পূর্বতন জমিদারশ্রেণীর উপর ইজারাদার নিযুক্ত হল রাজস্ব সংগ্রহের জন্য।

প্রাক্তন সুবাদার মীরজুমলার আমল থেকে বাংলাদেশের রাজস্ব সংগ্রহের যে ব্যবস্থা চলে আসছিল তা বেশ শৃঙ্খলাপূর্ণ বলা চলে। কিন্তু কিছুকাল পরেই তার মধ্যে নানা গলদ উপস্থিত হল। জায়গীরদার ও জমিদার শ্রেণী নবাবকে রাজস্ব বা সৈন্য সাহায্য দিতে গাফিলতি করতে লাগল। তাই মুর্শিদকুলি খাঁর প্রথম কাজই ছিল জায়গীরপ্রথার অবসান ঘটিয়ে জমিদারদের যাবতীয় জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে গ্রহণ করা। এবং তৎপরিবর্তে জমিদারদের অনুর্বর জমিসকল বিলি করা হল। ফলে রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি পেল। অন্যদিকে জমিদারি খাজনা আদায়ের জন্য ইজারাদার—বিশেষতঃ হিন্দু ইজারাদার নিযুক্ত হল। জমিদাররা—ইজারাদারদের অত্যাচারে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন—অনেকে জমিদারি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লেন। জমিদারশ্রেণীর উপর ইজারাদারের এই অত্যাচারের আভাস বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে কিছু দিয়েছেন সে কথা পরে আলোচ্য।

এর ফলে বহু প্রাচীন সামন্তবংশ লুপ্ত হয়ে গেল—এবং অর্থের ও প্রতিপত্তির জোরে ইজারাদারগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের কর্মচারীগণই তালুক-মুলুকের

(১) এই সম্পর্কে Dacca University, History of Bengal Vol. II-তে বলা হয়েছে—The land tenure System taken over by the English was in the main features the creations of Murshidquli Khan. Lord Cornwallis only continued the System in a more refined but more rigid form.

A. N. Saha's West Bengal Land Reform Act.

অধীশ্বর হয়ে জমিদারশ্রেণীভুক্ত হয়ে উঠলেন। অনেকের মতে জমিদার নামক যে শোষকশ্রেণীর চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা এই নবাগত জমিদারের দল। মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন, আলিবর্দ্দি এবং সিরাজদৌল্লা এই চারজন বাংলার সুবাদার তথা নবাব পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের মসনদ অধিকার করেন এবং তাঁদের আমলকেই নবাবী আমল আখ্যা দেওয়া হয়।

ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ এই দুই কবি একই নবাবী আমলের অধীন ছিলেন। কিন্তু জীবনইতিহাস এবং দৃষ্টিভঙ্গি পৃথকভাবে গড়ে ওঠার দরুন একই সামন্তপ্রভাব দুই কবির রচনায় ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথমে ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক। মুকুন্দরাম যে মানসিংহের কালের লোক ছিলেন—সেই রাজা মানসিংহের কৃপাপুষ্ট ভবানন্দের অধস্তন সপ্তমপুরুষ হলেন নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ভারতচন্দ্র তাঁরই রাজসভার কবি।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্যে সেই ভবানন্দ মজুমদারের 'রাজা' খেতাবলাভের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আছে। পূর্ববঙ্গের স্বাধীন জমিদারদের দমনের জন্যই মানসিংহ বাংলাদেশে প্রেরিত হন। যশোহরের প্রতাপাদিত্যকে দমন করার সময় মানসিংহ ও তাঁর সৈন্যদল অত্যন্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হলে তৎকালীন জমিদার ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে নানাভাবে সাহায্য দান করেন। মানসিংহ তাতে সন্তুষ্ট হয়ে দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট তাঁকে উপস্থিত করেন। বাদশাহ প্রথমে তাঁকে অবিশ্বাস করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে দেবী চণ্ডীর মহিমায় রাজ্যমধ্যে ভূতের উপদ্রব ও অত্যাচার শুরু হয়। জাহাঙ্গীর ভীত হয়ে শেষ পর্যন্ত ভবানন্দকে মুক্তিদান করেন এবং সসম্মানে তাঁকে 'রাজা' খেতাব দান করেন। সেই থেকে কৃষ্ণনগরের জমিদারবংশ 'রাজা' উপাধি ধারণ করে আসছেন।

উক্ত ঘটনার থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে—সে হল নবাব বাদশার সহায়তায় সামন্ত বা জমিদারগণের রাজা, মহারাজা ইত্যাদি পদাধিকার লাভ করা। এবং বংশপরম্পরায় সেই উপাধি তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন।

সে যুগের জমিদারদের মধ্যে যে কি প্রকার বিদ্বেষ ও শত্রুতা সম্পর্ক ছিল ভবানন্দ মজুমদারের আচরণে তারও আভাস পাওয়া যায়। কারণ মোগল রাজপুরুষের আনুকূল্য লাভ করবার জন্য দেশের মানুষের বিরোধিতা করা খুব গৌরবজনক নয়—তথাপি সে যুগে ক্ষমতা ও উচ্চপদ লাভের জন্য হামেশাই এ ব্যাপার ঘটত। রাজা খেতাব পাবার পর ভবানন্দের রাজ্যচালনার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন ভারতচন্দ্র। অন্নদামঙ্গলের সেই অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

"পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুমদার।
স্নানপূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার ॥
ঘড়িয়াল ঠন ঠন বাজাইছে ঘড়ি।
চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ি ॥
দেওয়ান আমীন বক্সী মুন্সী দপ্তরী।
খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি ॥
সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা।
মুহরির রাখিল হিসাব করি রফা ॥
ফরমানমত সব সনদ লিখিয়া।
মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া ॥
পরগনা পরগনা হইল আমল।
দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ॥
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার ॥
এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম।
ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম ॥"

রাজত্বের সকল নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী ঘড়িয়াল, চৌকিদার, দেওয়ান আমীন বক্সী মুন্সী খাজাঞ্চী মুহুরী এবং তাদের প্রতি বিভিন্ন রকম কার্যাবলীর দায়িত্ব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র তাঁর আশ্রয়দাতা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশগৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে দেশীয় জমিদার চরিত্রের স্বরূপই ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব কাহিনীও তিনি বর্ণনা করেছেন। মোগল বাদশাহের আনুগত্য অস্বীকার করে যেসব ভূস্বাম লব্ধকীর্তি হয়েছিলেন যশোরের প্রতিপাদিত্যের নাম তার পুরোভাগে। তবে কাব্যরচনার উদ্দেশ্য বজায় রেখে ভারতচন্দ্র ভবানন্দ মজুমদারেরই যশোগান রচনা করেছেন—কারণ যেহেতু তিনি চণ্ডীর প্রসাদেই রাজা হন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বর্ণনায় রাজকীয় ঠাঁট, নাগরিক বিলাস ছলাকলা এবং আদিরসাত্মক ঘটনার যে চিত্র ভারতচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা একান্তভাবে সামন্ত মনোভাবেরই প্রকাশ। অর্থাৎ রাজা-জমিদারের বিলাসের দিকই ভারতচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছে—রাজা-জমিদারের অত্যাচারক্লিষ্ট প্রজাসাধারণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি। পড়লেও তা যৎসামান্য। রাজার মনোরঞ্জন যার

লক্ষ্য—প্রজার কথা তাঁর লেখা সাজে না। তবু দেখি ভারতচন্দ্রের রচনায় সাধারণ দুঃখী মানুষ প্রার্থনা করেছে দেবীর কাছে—

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

অর্থাৎ যে দারিদ্র্য সাধারণ মানুষের নিত্যসঙ্গী দেবতার আশীর্বাদে তার থেকে মুক্তিলাভই যে সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা এ কথা ভারতচন্দ্র অস্বীকার করেন নি।

আমরা জানি মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং মুর্শিদাবাদের কোষাগারে রাজস্ববৃদ্ধি হলেও জনসাধারণের অবস্থার যে উন্নতি হয় নি—তার আভাস দিয়েছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিক। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে (তৃতীয় খণ্ড) উল্লিখিত "সলিমুল্লার তারিখই বাংলা"র কিছু অংশ এইপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি—

"মুর্শিদাবাদের কোষাগারে প্রতি বৎসর বাড়তি টাকা রাখিবার জন্য মুর্শিদকুলি নূতন নূতন লোহার সিন্দুক নির্মাণ করাইলেও অসহায় বুভুক্ষু জনসাধারণ গোমহিষাদির মত মারা পড়িত।...তখন ঐশ্বর্য বলিতে রাজকোষাগারে সঞ্চিত স্তূপীকৃত টাকাকড়ি সোনা রূপাকেই বুঝাইত। জনসাধারণের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না।"

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দু জমিদার, ভূস্বামী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করতেন।

এ প্রসঙ্গে লেককের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"কিন্তু সেই দুষ্কৃতি হইতে কোন মুসলমান শাসকই বা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন?"

বাস্তবিকই নবাব আলিবর্দ্দির সময়ও প্রজাসাধারণের দুরবস্থা এবং জমিদারশ্রেণীর উপর নবাবী পীড়ন যে পূর্ণমাত্রায় ছিল—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমেই দেখা যায় অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হিসাবে ভারতচন্দ্র যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন—তা হল বর্গীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আলিবর্দ্দি জমিদারদের কাছ থেকে মোটা নজর আদায়ের জন্য চাপ দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তা দিতে না পারায় তিনি মুর্শিদাবাদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন—এবং সেখানে কিভাবে দেবীর স্বপ্নাদেশ পান সে ঘটনা পরে বিবৃত হয়েছে।

নবাবী আমলে জমিদারশ্রেণীর উপর এই উৎপীড়ন চলার ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রজাশোষণের দ্বারা তা পূরণ করার চেষ্টা করা হত। নবাবের দৃষ্টি

জনসাধারণের প্রতি ছিল না—ছিল জমিদারশ্রেণীর প্রতি। জমিদারশ্রেণীও আপন স্বার্থরক্ষার তাগিদে জনস্বার্থ রক্ষার দিকে মন দিতেন না। উপরন্তু ছিল ভাড়াটিয়া ইজারাদারদের উৎপীড়ন।

ফলে নবাবী আমলে প্রজাদের কষ্টের সীমা ছিল না। তার ওপর নবাব আলিবর্দ্দির সময়ে (১৭৪০-১৭৫৬) বর্গীর দৌরাত্ম্য বাংলাদেশের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলল। বাংলাদেশ থেকে চৌথা আদায়ের জন্য বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হল। ফলে জনগণ দেশীয় শাসকগণের অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের আশায় বর্গীদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে লাগল। অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে ইংরেজ বণিক বা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন চক্রান্তের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর জনজীবন যে কত অসহায় হয়ে পড়েছিল—কবি রামপ্রসাদের শাক্তসঙ্গীতে তার স্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য। রামপ্রসাদের তুলনায় ভারতচন্দ্র অনেক কৃত্রিম। কারণ রাজসভার কৃত্রিমতার মধ্যে রাজার মনোরঞ্জনের জন্যই ভারতচন্দ্রের জীবন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অথচ স্বয়ং ছিলেন জমিদার পুত্র—স্বাধীনতা এবং বৈচিত্র্যের পিয়াসী ছিল তাঁর মন। তাঁর জীবনইতিহাস থেকে সে কথা স্পষ্টই বোঝা যায়। তবু নিজের ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে এমন পেশা তাঁর জুটেছিল যা হয়ত তাঁর মত স্বাধীনচেতা মানুষের উপযোগী ছিল না। রাজসভার কবি হয়ে তিনি একদিকে যেমন জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন অন্যদিকে দেখেছিলেন রাজসভার বিলাসবহুল ভোগাসক্তিময় নগর জীবন। ক্ষয়িষ্ণু নবাবী আমলের ভোগবিলাস ও নৈতিক অধঃপতনের প্রভাব বাংলাদেশের সামন্ত চরিত্রকেও প্রভাবিত করেছিল। অবৈধ প্রেম, সুরা, নারীঘটিত উচ্ছৃঙ্খলতা সামন্ত চরিত্রের ভূষণ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে সামন্তদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে রেষারেষি চলত যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে জাঁকজমক আড়ম্বরপ্রিয়তা সেই সঙ্গে দানধ্যান শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণা সব ক্ষেত্রেই পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিয়ে চলছিল—কার চেয়ে কে বড় বলে প্রতিপন্ন হবে। এই প্রতিযোগী মনোভাব জমিদারি উচ্ছেদের সীমান্তকাল পর্যন্ত যে একইভাবে চলে আসছিল পরবর্তীকালের সাহিত্যে তা চিহ্নিত হয়েছে সে প্রসঙ্গের আলোচনা পরে হবে।

ভারতচন্দ্র ছিলেন ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামী নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র। তাঁদের জমিদারি অর্জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন—"চতুরানন নামে এক ব্রাহ্মণ খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে ভুরসুট পরগনায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ

বংশরূপে পরিচালিত করেন।...তাঁহার জামাতার শাখাই ভুরসুটে প্রাধান্য লাভ করে।...উক্ত রাজবংশের দ্বিতীয় শাখা পেঁড়ো নিবাসী রাজা কৃষ্ণ রায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়।"

অতএব ভারতচন্দ্রের নিজের মধ্যেই ছিল জমিদারি নীল রক্ত। তাঁর জীবনও কেটেছিল রাজসভায়। তথাপি সামন্তদের রেষারেষির ফল যে কত ভয়ানক ব্যক্তিগত জীবনে ভারতচন্দ্র সে বিষয়ে ভুক্তভোগী ছিলেন। সাধারণ মানুষ মুকুন্দরাম ডিহিদারের অত্যাচারে দেশত্যাগী হন। ভারতচন্দ্র ব্যক্তিজীবনে বুঝেছিলেন ক্ষমতাশালী সামন্ত রাজাদের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের কিভাবে হৃতসর্বস্ব করে। বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণীর আক্রোশ ছিল রায় নরেন্দ্রনারায়ণের উপর। ভূমির সীমাসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বর্ধমানের সৈন্য আক্রমণের ফলে নরেন্দ্রনারায়ণ সর্বস্বান্ত হয়ে যান। সেই সময়ে ভারতচন্দ্রও দেশত্যাগ করেন—অবশ্য শুধু দারিদ্রের জ্বালায় নয়—আরবী ফা়র্সী সংস্কৃত শিক্ষার আশায়। মাতুলালয়ে এবং পরে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর গৃহে ভারতচন্দ্র বসবাস করেন। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের গৃহে বাসকালেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

কিন্তু বর্ধমানরাজের সঙ্গে ইতিপূর্বেও ভারতচন্দ্রের আরও সংঘর্ষ ঘটে গেছে। ভারতচন্দ্রের পিতা বর্ধমানের কাছ থেকে কিছু জমি ইজারা নেন এবং ভারতচন্দ্রের অগ্রজ ভ্রাতারা বংশের সুশিক্ষিত সুযোগ্য সন্তান হিসাবে বর্ধমানের রাজদরবারে রাজস্ব দেবার জন্য ভারতচন্দ্রকে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানে বর্ধমানরাজ কৌশলে কর অনাদায়ে বন্দী করে সমস্ত ইজারাভুক্ত ভূমি আত্মসাৎ করে নেন।

এই ঘটনায় রাজা-জমিদারের চরিত্রের সংঘাতের দিকটি স্পষ্ট হয়েছে কবির জীবনে।

পরবর্তী বর্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্রের রাজত্বকালে বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে রাজা ও রাজমাতা মূলাযোড়ের কাছে কাউগাছি গ্রামে বাস করতে থাকেন এবং মূলাযোড় গ্রামখানি পত্তনি নেবার বাসনা প্রকাশ করেন। ভারতচন্দ্র তখন মূলাযোড়ে ইজারা নিয়েছেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলেন। রাজা বর্ধমানেশ্বরের অনুরোধ রক্ষার্থে তাকে সানন্দে মূলাযোড় গ্রাম পত্তনি দিতে সম্মত হলে ভারতচন্দ্রের আত্মসম্মানে লাগে। অতএব ভারতচন্দ্রকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রচুর নিষ্কর জমি ব্রহ্মত্ররূপে দান করলেন। কিন্তু মূলাযোড়ের অধিবাসীদের অনুরোধে ভারতচন্দ্র সেখানেই বাস করতে বাধ্য হন।

সেই সময় রামদেব নাগ পত্তনিদার নিযুক্ত হয়ে ভারতচন্দ্র এবং অন্যান্যদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করতে থাকেন। জমিদার নিযুক্ত এই পত্তনিদারশ্রেণীর অত্যাচার সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বিসহ ছিল। ভারতচন্দ্র এই সম্পর্কে নাগাষ্টক কবিতা রচনা করেন। সেই কাব্যপাঠে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পত্তনিদারের অত্যাচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে তার দৌরাত্ম্য নিবারণ করেন। নিজের জীবনের মধ্যে যেমন ভারতচন্দ্র অনুভব করেছিলেন সামন্তপ্রথার কুফল তেমনি এই সকল খুঁটিনাটি ঘটনা থেকে সে যুগের সামন্তচরিত্র, তাদের সমস্যা এবং প্রজাশ্রেণীর দুরবস্থারও স্পষ্ট আভাস লক্ষ্য করা যায়। এইসব সামন্তরা যে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর ছিলেন তাও নয়—আবার ক্ষমতাও তাদের ছিল সীমিত। যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না পারার ফলে বহু রাজবংশ কালে যেমন বিলুপ্ত হয়েছে আবার অর্থনৈতিক কৌলীন্য লাভ করে বহু নূতন সামন্তশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও বহু কবি বা গাথাকারের রচনায় এ যুগের সামন্ত শাসনে উৎপীড়িত প্রজাকুলের বর্ণনাও যেমন ধরা দিয়েছে অন্য দিকে সামন্তশ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ফুটেছে সেই সঙ্গে। ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্য পেয়েছিলেন তাঁদেরও জমিদারি তথা মহারাজা খেতাব লাভের কাহিনী বৈচিত্র্যপূর্ণ। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় তাঁর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্ গ্রন্থে তার একটি ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ফাঁকদি গ্রামের কাশীনাথ রায় সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"কাশীনাথ রায় মহাশয়ের বসতি ছিল পরগনা ও তাঁহার জমিদারী কিছুকাল পরে রাজকরের কারণ ঢাকার সুবার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল। সেই বিবাদে পরাভব হইয়া বনিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশত্যাগ করিলেন।"

অতএব জমিদার রাজকর দিতে না পারায় জমিদারিচ্যুত হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন দেখা যাচ্ছে।

আবার কাশীরামেরই বংশধর ভবানন্দ মজুমদার কি করে পুনরায় জমিদারি অর্জন করলেন তারও বিস্তৃত কাহিনী আছে। মানসিংহকে তোষণ করে ভবানন্দ সমাদ্বার বাগুয়ান অঞ্চলের জমিদারি ও রায়মজুমদার উপাধি লাভ করেন। অন্নদামঙ্গলে সে কাহিনী বর্ণিত আছে। এর পরবর্তী ঘটনা হিসাবে রাজীবলোচনের গ্রন্থ থেকে ভবানন্দের বংশধর রাঘব রায়ের ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

"সম্রাটের রাজা বাসব রায়ের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন এ বড় মনুষ্য ইহাকে রাজা করি পরে অনেক ভূমির কর্তা করিয়া রাজপ্রসাদ দিয়া উপাধি রাখিলেন রাঘব মহারাজ। সেই অবধি খ্যাতি হইল মহারাজ। সামন্ত বা

জমিদাররাই যে কালক্রমে বহুল জমিদারী অর্জন ও সুশাসনের গুণে রাজা মহারাজা হতেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্-এ তারই সাক্ষ্য আছে।"

নরসিংহ বসু ও রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গল, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ণ, তা ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক ঐতিহাসিক ছড়া ও গাথায় এই চিত্র আছে।

এইপ্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক পল্লীগাথার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এই সকল ছড়া গাথা কিম্বা আখ্যানকাব্যে সামন্ততন্ত্রের দ্বিবিধ প্রতিফলন দেখা যায়। এক হল প্রজানিপীড়ন, দুই—সুবাদার বা শাসকশ্রেণী কর্তৃক সামন্তশ্রেণীর প্রতি উৎপীড়ন। সেকালের জমিদারিব্যবস্থায় এই দুটি বিষয়ই ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত মদন পালা-শীর্ষক ছড়া গানে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক জমিদারের উপর অকথ্য অত্যাচারের কথা আছে। মদন পালা বা মদনের গানের কবি নিজে যদিও মুসলমান তথাপি শায়েস্তা খাঁর হিন্দু জমিদার দলনের নির্মম ঘটনা বর্ণনায় তিনি কুণ্ঠিত হন নি।

এই অত্যাচার সাধারণতঃ খাজনা আদায়ের জন্যই করা হত। এই সম্পর্কে যে অত্যাচারের বিবরণ লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত করেছেন তা এখানে পুনরায় উদ্ধৃত করা হল—

> "কারে কারে ইটের উপরে করে রেখেছে খাড়া
> চাবুকের চোটে কার পোস্ত দিচ্ছে নাড়াচাড়া।
> কারু কারু ফেলে রেখেছে সিংহমাছের গড়ি
> পিষ্ঠ তুলে মারে জোড়া বেতের বাড়ি।
> তামাক থেকে গুল কারু ছাপ ধচ্ছে গায়
> লঙ্কা মরিচের ধোঁয়া কারু নাকে দেয়।"

অর্থাৎ জমিদার উৎপীড়নের এক বীভৎস চিত্র এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

জমিদারের প্রতি শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের আরও প্রমাণ আছে চৈতন্যমঙ্গলে যেখানে কবি বর্ণনা করেছেন চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ রাজা ভ্রমরের ভয়ে উড়িষ্যা ত্যাগ করে শ্রীহট্টে পালিয়ে যান। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঃ সাঃ ই (তৃতীয় খণ্ডে)-তে গোপীজন বল্লভ দাসের রসিকমঙ্গলের (১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) উল্লেখ করে বলা হয়েছে জমিদারদের প্রতি মেদিনীপুরের শাসক আহম্মদী বেগের অত্যাচারের বর্ণনা আছে।

উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে প্রাপ্ত রতিরাম দাসের 'জাগের গান' সম্পর্কে ডঃ সেন ও

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তার থেকে উল্লেখ করা যায় যে জাগের গানের বিষয় ছিল দেবীসিংহের[১] অত্যাচার। কবি স্বয়ং দেবী-সিংহের হাতে শাস্তিভোগ করেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইজারাদার দেবী-সিংহের অত্যাচার জমিদার ও প্রজা নির্বিশেষে তার সেই উৎপীড়নের কাহিনীই ছিল কবিতার বিষয়বস্তু। দেবীসিংহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জমিদার ও প্রজারা সমবেতভাবে চেষ্টা করে কিছু সফলতা লাভ করেন।

ইজারাদারের অত্যাচারে প্রজাদের যে অবস্থার বিবরণ তিনি দিয়েছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হল—

"রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হইয়া
হাত জুড়ি চক্ষু জলে বক্ষ ভাসাইয়া ॥
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরানে নাই বাস
চামে ঢাকা হাড় কয় খানা করি উপবাস ॥"

লক্ষণীয় যে জমিদারি তথা সামন্তশাসনে প্রজাদের দুরবস্থা ঠিক একই রয়েছে। অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও অনেকে এঁকেছেন। প্রজাশক্তি সংঘবদ্ধভাবে অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে—নয় আনার কবি কৃষ্ণহরি দাস তারই একটি ধারণা দিয়েছেন। গুডল্যাড্ সাহেবের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সকল প্রজা সমবেতভাবে নবনিযুক্ত দেওয়ান রামবল্লভকে কিভাবে পদচ্যুত করেছিলেন তার ঐতিহাসিক বিবরণ এখানে যেমন আছে সেই সঙ্গে গণজাগরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এর আলাদা গুরুত্ব আছে। পরবর্তীকালে এই গণজাগরণ ও বিক্ষোভই যে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাতে সাহায্য করেছিল সে ঘটনা পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রজাশক্তিকে যে শাসকগোষ্ঠী উপেক্ষা করতে পারেন না তার আভাস কয়েকটি ছত্রে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

"দেওয়ান বলে রায়ত সব করতে পারে
কাকেও স্বর্গে তোলে কাকে আছাড় মারে।
রায়ত লইয়া সবার ঠাকুরালী
যত সোনার বালা রায়তের কড়ি।

কথাটি মর্মান্তিক সত্য। প্রজার রক্ত শোষণ করেই রাজার ঐশ্বর্য গড়ে ওঠে। অতএব প্রজার সমর্থন না পেলে রাজার রাজত্ব যে স্থায়ী হতে পারে না এই সত্যের প্রতিশ্রুতি এখানে পাওয়া যায়।

(১) দেবীসিংহ—হেস্টিংসের আমলের ইজারাদার। তাঁর অত্যাচারের কথা ইতিহাস বিদিত। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানীতে দেবীসিংহের উল্লেখ আছে।

স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত বর্ধমানের রাজা কীর্তি-চন্দ্রের কীর্তি ও মৃত্যুসম্পর্কিত একটি গাথা ডঃ সেনের গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের রচনা হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্র এতে পাওয়া যায়। এই গাথাটির দু-একটি চরণমাত্র উল্লেখ করে বোঝানো যায় যে সেকালে জমিদাররা কত অত্যাচারী ছিল। জমিদার অর্থাৎ সামন্ত বা ভূস্বামী। কিন্তু মহারাজাধিরাজদের পরাক্রমের কাছে তাঁরা ভীত ত্রস্ত থাকতেন। বর্ধমানের মহা-রাজার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্পর্কে আমরা তার আভাস পূর্বেই পেয়েছি।

এখানে গাথাকার সেইজাতীয় অত্যাচারের উল্লেখ করেই হয়তো লিখেছেন

"জমিদারেরা ছিল দেশে বড়ই অত্যাচারী
তোমার নামে কাঁপত তারা সদাই থরথরি।"

এবং এই মহারাজ কীর্তিচন্দ্র কিভাবে প্রজাগণকে জমিদারের অত্যাচার এবং বর্গীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ পরে দেওয়া হয়েছে।

ডঃ সেনের গ্রন্থে দ্বিজ দ্বারকানাথের একটি হাপু গানের উদ্ধৃতি আছে—তার থেকেও কিছু সাহায্য নিয়ে বলা যায়—দেশে প্রচণ্ড আকাল বা অজন্মার দিনেও প্রজাদের একমাত্র ভাবনা—

রাজকর কিসে দিব
রাজকর কিসে দিব কি খাইব অন্তরে ভাবিয়া
স্থানান্তরে কেহ গেল দুঃখিত হইয়া।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কলিঙ্গ রাজ্যের প্রজা বুলান মণ্ডলের প্রথমেই ভাবনা দেখা দিয়েছিল প্লাবনে সব শস্য হেজে গেল এখন খাজনা কিসে দেওয়া হবে—না দিতে পারলে তো হাতকড়া পড়বে রাজার নির্দেশে। তাই তারা রাজ্য ছেড়ে গুজরাটে আশ্রয় নিয়েছিল। এখানেও তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

অর্থাৎ প্রজার সুখ-দুঃখের প্রতি যে রাজা-জমিদারের সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না এইসব রচনায় তারই বেদনা ভাষা পেয়েছে। চাষীপ্রজাদের ধরে ধরে রাস্তার কাজে বেগার খাটানোর বিভীষিকাও প্রজাদের পক্ষে ভীতিপ্রদ ছিল। সেই দুর্দশা বর্ণনা করা হয়েছে কোন কোন হাপু গানে—

ফেলাএ লাঙ্গল মাঠে ছুটে যত চাষীগণ
বেগার ধরিতে আইল কত শত জন।

এই ভূতের বেগার খাটার উল্লেখ পরে রামপ্রসাদেও পাওয়া যাবে।

অষ্টাদশ শতকের রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব-সংকীর্তন বা শিবায়ণকাব্যের মধ্যে কবির আত্মবিবরণীতে দেখা যায় কবি জমিদার হিমায়েৎ সিংহের অত্যাচারে স্বগ্রাম ছেড়ে কর্ণগড়ে আশ্রয় নেন এবং সেখানে রাজা রামসিংহের উৎসাহে তিনি শিবায়ণ রচনা করেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ণকাব্যে শিবের চাষবাসের কাহিনীতে চাষী জীবনের সুখ-দুঃখের চিত্র যেমন বর্ণিত হয়েছে—ভূমির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত যিনি অর্থাৎ ভূস্বামী তার কথাও প্রসঙ্গতঃ এসেছে।

চাষীর অনেক শ্রমের রক্তে চাষের জমি শস্যশ্যামলা হয়। সেই সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

"অনেক যতনে ক্ষেতে শস্য উপস্থিত
শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত।
গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা
বার কর্যা সকল আনয়ে লয় রাজা।"

অর্থাৎ অনেক কষ্টের সেই ফসলে রাজা প্রথমেই ভাগ বসায়। এখানেও সেই রাজস্ব আদায়ের নির্মমতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শিবের চাষবাসের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য ইন্দ্র তাঁকে জমির পত্তনি বা পাট্টা দেবার কথা বলেছেন। পত্তানিদাররাই হন পরে জোতদার। তাঁরা জমিতে বসে তার ফল ভোগ করে। এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"ভৃত্যে তুমি কেন মাগ ভূমি।"

ধর্মমঙ্গলকাব্যের অন্যতম রচয়িতা নরসিংহ বসুর বিবৃতি থেকে সে যুগে নবাব সরকারে যথাসময়ে খাজনার সব টাকা দাখিল না করতে পারলে জমিদারের জমিদারি কি রকম বিপন্ন হত তা জানা যায়।

ঝাড়িখণ্ডের রাজা আসফুল্লার খানের ঘটনায় তার প্রমাণ আছে। অপরদিকে রামকান্ত রায় সামন্তবর্গের প্রতি দেবতার করুণা প্রার্থনা করেছেন—

"সামন্তবর্গেতে দয়া কর বুড়া রায়
হীন রামকান্ত বলে কি হবে উপায়।"

বলাবাহুল্য রাজা বা জমিদারের অনুগ্রহে যেসকল কবি কাব্যরচনা করেন তাঁরা সামন্তশ্রেণীর প্রতি অনুকূল মনোভাবই প্রকাশ করেছেন।

এর পর সাধক কবি রামপ্রসাদের প্রসঙ্গে আসা যাক। কবি রামপ্রসাদ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই একটি সমস্যার সমাধান করে নেওয়া দরকার হয়ে পড়ে। বিষয়—দুইজন রামপ্রসাদ সম্পর্কে অর্থাৎ একজন রামপ্রসাদ সেন যিনি হালি-

শহরের কবি—অপরজন দ্বিজ রামপ্রসাদ যাঁকে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী মনে করা হয়। অনেকে আবার কলিকাতা অঞ্চলের রামপ্রসাদ চক্রবর্তীকেই দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মনে করেন। যাই হোক এই দুই কবির জীবন ও রচনা এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে কবি চণ্ডীদাসের মত রামপ্রসাদকেও আমরা অভিন্ন ভাবলে খুশী হই। সে যাই হোক সমস্যাটা হল—অনেকের মতে দ্বিজ রামপ্রসাদ পরবর্তীযুগের কবি এবং সম্ভবতঃ ইংরেজ রাজত্বকাল তখন শুরু হয়েছে—কারণ তাঁদের মতে রামপ্রসাদের রচনায় জমিদারি ও বিভিন্ন আইন-আদালতের ব্যাপারে যেসব ইংরেজী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় সে সব অষ্টাদশ শতাব্দীর কবির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে কোম্পানীর আমলে অর্থাৎ ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দের অথবা তারও আগেই বিভিন্ন প্রেসেডেন্সি টাউনে কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে 'মেয়র'স কোর্ট' বলা হত। অতএব ঐ সব আইনের কথাবার্তা যে লোক মুখে প্রচলিত হয় নি এমন কথা বলা যায় না। রামপ্রসাদের জন্ম তার সমকালীন যুগে ১৭২৩ সালে।

রামপ্রসাদ যে কয়জনই হোন বর্তমান আলোচনায় রামপ্রসাদ বিচারের প্রশ্নে না গিয়ে তাঁকে একক মনে করেই রামপ্রসাদের রচনা আলোচনা করা হবে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের যুগধর্ম তথা সামন্তপ্রভাব কতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে একই মহারাজার আনুকূল্য লাভ করা সত্ত্বেও, এবং ব্যক্তি-জীবনেও গোড়ার দিকে জমিদারের অনুগ্রহে জীবন শুরু হলেও রামপ্রসাদ জমিদার-শ্রেণীকে যে খুব ভাল চোখে দেখেন নি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের জীবনে জমিদারি অত্যাচার যে কত দুর্বহ ছিল তার প্রমাণ তাঁর সমগ্র শাক্তপদাবলী আভাসে, ইঙ্গিতে, রূপকে রূপকল্পে ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সোজাসুজিভাবে না বললেও সামন্ত বা জমিদারিব্যবস্থার সম্পর্কে তিনি কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েন নি। ভূমিজীবী মানুষের ওপর জমিদারি অত্যাচারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। প্রসাদ পদাবলীর প্রথম পদটিই শুরু হয়েছে কৃষিকার্যের অতি বাস্তব একটি চিত্রকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করে। কবি বলছেন—"মন রে কৃষি কাজ জান না"—অনাবাদী বা পতিত জমিকেও উপযুক্ত কৃষিকার্যের দ্বারা সুফলা করে তোলা যায়। কিন্তু জমি ও ফসলের সঙ্গেই আসে জমিদারের কর্মচারীদের তথা মহাজনদের ফসল তছরূপের প্রসঙ্গ অথবা খাজনার দায়ে বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্ন। মনের সঙ্গে যে কৃষিক্ষেত্রের তুলনা দিলেন এবং কৃষিকার্যের সঙ্গে অন্যান্য যেসব আনুষঙ্গিক উপসর্গের কথা বললেন—তা একান্তভাবেই ভূমিজীবী প্রজা বা চাষীদের চিরন্তন সমস্যা।

রামপ্রসাদ জমিদারের সেরেস্তায় কর্মচারীরূপেই প্রথম কাজ শুরু করেন।

অতএব জমিদারি কার্যপরিচালনা ও জমিদারি মনোভাবের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল বিশেষতঃ প্রজা-জমিদারসম্পর্ক সম্পর্কে তাঁর ওয়াকিবহাল থাকারই কথা।

তাই কবি নিজেকে শোষিত প্রজাসাধারণের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন—"মা গো তারা ও শঙ্করী কোন অবিচারে আমার উপর কল্লে দুঃখের ডিক্রিজারী" অর্থাৎ প্রজার সঙ্গে জমিদারের ব্যবহারে যে কোনও ন্যায়বিচারের প্রশ্ন ছিল না কোনও দিনই সে কথাই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে এখানে। রাজা-জমিদাররা যে কথায় কথায় প্রজার জমি নিলামে তুলতেন এবং খাজনা আদায়ের জন্য পেয়াদা পাঠিয়ে জোরজবরদস্তি করতেন সে কথা রামপ্রসাদের পদে স্পষ্ট অনুমান করা যায়। "প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলামজারি" কিন্তু বিচার পাওয়ার আশা প্রজার পক্ষে বাতুলতা। কারণ দরিদ্র প্রজার আইন-আদালত করার মত টাকা-পয়সা কোথায়? উকীল সেও জমিদারেরই হাতধরা তাই কথায় কথায় প্রজার আর্জি বাতিল হয়ে যায়।

মাতৃসাধক রামপ্রসাদ মহাকালীকে জমিদারের প্রতীকরূপে কল্পনা করে ভক্ত সন্তানের প্রতি তাঁর নির্মম ব্যবহারকে প্রজার প্রতি জমিদারের অত্যাচারী মনোভাবের তুলনা করেছেন।

সেরেস্তার কাজ করে জমিদারের হিসাবনিকাশ সম্পর্কে সুষ্ঠু চিত্র তিনি কথায় কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন। জমা, খরচ, তহবিল, তহবিলে বাকী থাকা যে ফাঁকির কাজ, সে সব নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই অর্জন করেছিলেন কবি।

জমিদারের খাসতালুকের প্রজারা যে সুখ-সুবিধা ভোগ করে অন্য মহালের প্রজারা তা পায় না। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে অন্য মহালের প্রজারা যখন নানা কষ্ট-ভোগ করে খাসতালুকের প্রজারা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। তাই কবি নিজেকে তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছিলেন—

> আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা
> ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা
> ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজা

কালেকটারি বা রাজস্ব আদায় কেন্দ্রগুলি যে মানুষের কাছে যমস্বরূপ ভীতির কারণ ছিল—নিলামে সম্পত্তি চড়া মানে যে গভীর পাপের ফল বা অদৃষ্টের লিখন বলে মনে করা হত।

> "তোর যম হয় কালেকটারি
> আমার পুণ্যের দফা সবে শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি।"

ইজারাদার বা পত্তনিদারদের সেকালে প্রচণ্ড প্রতাপ—তারা নবাব-বাদশার নির্বাচিত প্রতিনিধি—এরা খাজনা আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হলেও পরে এরাই জমিদারশ্রেণীতে পরিণত হয় এবং বহু প্রাচীন সামন্তবংশ খাজনার দায়ে লুপ্ত হয়ে যায়। এই ইজারাদারশ্রেণীর অত্যাচারের কথা বিভিন্ন কবি-লেখকের রচনার উপাদান হয়েছে। রামপ্রসাদ তারই উল্লেখ করে যমকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

> ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে
> ওরে রাজা থাকতে কোটালের দোহাই
> কোন দেশেতে কে দিয়াছে।

জমিদারের আদালতে বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রজায় প্রজায় মামলা-মকদ্দম অথবা বিরোধ প্রায়ই বেধে থাকত এবং সেই বিচারদৃশ্যেরও সুস্পস্ট বর্ণনা দিয়েছেন। ফরিয়াদী, বাদী, জমিনদারী, তজবিজ—সব আইন-আদালতের ভাষা ব্যবহারের দ্বারা বোঝা যায় কবি ভূসম্পত্তিঘটিত মামলা বিষয়ে কত অভিজ্ঞ ছিলেন। সেই সঙ্গে কৃষি জীবনের তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে সেই পদে—

> "এবার আমি করব কৃষি।
> আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে শস্য পাব রাশি রাশি।"

যদিও বাস্তবে রাশি রাশি শস্য পাওয়া সম্ভব নয় তবে মাতৃনামের মহিমা প্রসঙ্গেই এ কথা বলেছেন।

কিন্তু তারপরেই আবার শ্যামা মাকে জমিদার তথা আদালতের হুজুরের আসনে বসিয়ে কৃষিজীবী প্রজার সেই চিরন্তন অভিযোগের কথাই ব্যক্ত করেছেন। কবি মাতৃনামে পাগল হলেও সমকালীন যুগধর্ম ও বাস্তব সমস্যার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি—সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। অনেক পরিশ্রমে অনাবাদী জমিকে আবাদী করে রাশি রাশি ফসল ফলানোও তো প্রজার পক্ষে অপরাধ। তাই তো কবি কৈফিয়ত দেন (অবশ্য রূপকটিই গ্রহণীয় রূপকার্থ নয়)—

> আমি নয় পলাতক আসামী
> ওমা কি ভয়, আমায় দেখাও তুমি॥
>
> রাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি।
> আমি মহামন্ত্র মোহর করা কবচ রাখি সালতামামি
> আমি মায়ের খাসে আছি বসে, আসল কসে সারে জমি
> এবার তোমার নামের জোরে, থাকব ধরে, নিষ্কর করে লব ভূমি।
> প্রসাদ বলে খাজনা বাকি, নাইকো রাখি কড়া কমি।

জমির দলিলপত্র শীলমোহর করা। একপয়সা খাজনা বাকি নাই—এমন প্রজার দখলিস্বত্ব কেড়ে নেয় সে অধিকার কারো নেই যতই কেন ভয় দেখানো হোক।

খাসতালুক এবং নিষ্কর জমি প্রজাদের পক্ষে খুবই লোভনীয় ব্যাপার। কারণ এই জমির জরিপ জমাবন্দী হয় না অথবা কথার কথায় খাজনার দায়ে নিলামে চড়ে না। বোঝা যায় সে কালে হরদম এ সকল ঘটনা ঘটত বলেই কবি বার বারই কালীমায়ের খাসতালুকের প্রজা হতে চেয়েছেন—যেখানে হাজা শুখা কিম্বা নিলামজারি অথবা জরিপ জমাবন্দীর কোনও প্রশ্ন ছিল না।

প্রজাদের এই ভয় যে কত তীব্র ছিল সে ঘটনাও কবি রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। জমাওয়াশীল দাখিল করা প্রজাদের পক্ষে এক মহা সংকটের বিষয়। জমিদারের কর্মচারীর চিত্রগুপ্তের খাতায় বকেয়া বাকীর জের যত সব লেখা আছে। সেই জন্যই কবির ভাবনা—

"জমায় কমি খরচ বেশি, তরবো কিসে রাজার কাছে।"

বলাবাহুল্য এ ভাবনা কেবল কবির নয়—এর মধ্য দিয়ে প্রলিটারিয়েটশ্রেণীর চিরকালীন ভাবনাই প্রকাশিত। তবু কবির এক ভরসা আছে—যা প্রজাসাধারণের ভরসা একমাত্র ভরসা—সে হল খাসতালুকের প্রজা হয়ে কখনও বাকীর দায়ে না ঠেকা।

রামপ্রসাদকে অনুসরণ করে আরও বহু বিখ্যাত এবং অজ্ঞাত কবি জমিদার প্রজা, জমিদারি কাজকর্ম ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়ে সাধনতত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্য দিয়েও অনেক ক্ষেত্রে তদানীন্তন জমিদারিব্যবস্থার যে চেহারা ফুটেছে তা খুব মূল্যহীন নয়। জমিদারের জুয়াচোর কর্মচারীরা যে কি ভাবে জমিদারের অগোচরে লুটেপুটে খেয়ে জমিদারের তহবিল শূন্যগর্ত করে রাখে তারই বাস্তবচিত্র-সংক্রান্ত এখানে একটি পদ তুলে দেওয়া হল।

শুন রে মন জমিদার
ভাল এবার করলি রে তুই জমিদারি
যত সব জুয়াচোরে আমলা করে উসুল তহশীল দিলে ছাড়
তারা সব লুটে খেলে, তোমায় দিলে জমার ঘরে শূন্য ধরি।
দেওয়ান তোর নষ্টের গোড়া সৃষ্টিছাড়া, সাবেক জমি করলে চুরি
ঋণে ঋণে করছে ভারি, বন্ধক করি দেওয়ান বাবুর ছয় মুহুরি
ভুবন কহে তাহুত বাকি, আর ভাবছ কি, হয়ে গেছে
নুটিশ জারি,
সর্বস্ব নিলাম হবে, জেলে যাবে, ভাঙ্গতে হবে,
বাবুগিরি।

কবি অজ্ঞাত না তার নাম ভনিতা হিসাবে ভুবন ছিল জানা নেই কিন্তু জমিদারের দেওয়ান তথা নায়েব-গোমস্তার এমন অপূর্ব চিত্র সে যুগে বিরলদৃষ্ট।

# কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বর গুপ্তের জীবৎকাল ১৮১২ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই সাতচল্লিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থার অনেক কিছু রূপান্তর ঘটেছে এবং সরকার-জমিদার প্রজার মধ্যে সম্পর্ক জটিলতর হয়েছে এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পক্ষীয় বিপক্ষীয় সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাত্যহিক সংবাদ-প্রভাকর ঈশ্বর গুপ্তের মুখপাত্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন —"এই প্রভাকর ঈশ্বর গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি।" ঈশ্বর গুপ্তের প্রভায় প্রভা পেয়ে সংবাদ-প্রভাকর সে যুগের পক্ষে অনন্যকীর্তি হয়েছিল। সাংবাদিকতাকেও সাহিত্যের অঙ্গ বলা যায় যদি তা সাহিত্যিক মানসের প্রকাশ-মাধ্যম হয়। ঈশ্বর গুপ্তের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের অনেকখানি সম্পর্ক ছিল। স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্যরচনা করলেও তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সিংহ-ভাগ ব্যয়িত হয়েছিল সংবাদ-প্রভাকরের সম্পাদনায়। তিনি নিজে কেবল সাহিত্যিক ছিলেন না—ছিলেন বহু সাহিত্যিকের আবিষ্কর্তাও। সংবাদ-প্রভাকরের পাতায় দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রের মত বহু খ্যাতিমান লেখকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। বঙ্গদর্শনের পূর্বসূরী পত্রিকা ছিল সংবাদ-প্রভাকর এবং ঈশ্বর গুপ্তের মত দায়িত্বশীল নির্ভীক সম্পাদকের সম্পাদনায় সংবাদ-প্রভাকর যথেষ্ট গৌরব লাভ করে। সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে একাধারে তাঁর সমালোচক, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী, বলিষ্ঠ প্রকাশক্ষমতা এবং শ্লেষাত্মক বাচনভঙ্গিরও পরিচয় মেলে। সমকালীন প্রত্যক্ষ ও বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে রচিত—তাই এই রচনা আরও বেশী সত্যমূলক। তদানীন্তন ভূমিব্যবস্থার প্রতিটি সমস্যার উপর তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং বিশ্লেষণাত্মক রচনা পাঠকের কাছে মূল্যবান ঐতিহাসিক নজীর বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ব্রিটিশ সরকার ১৭৯০-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের ভূস্বামী করে দিয়ে এবং কৃষকদের তাঁদের অধীনস্থ প্রজা করে দিয়ে ইংরাজই প্রথম পরিপূর্ণভাবে ভূমিব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের পত্তন করে। জমিদারদের কি দিতে হবে রাজসরকারে তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হল। নবাবী আমলের চেয়ে নির্দিষ্ট রাজস্ব হল চতুর্গুণ। তাই ঐ সময় রাজস্ব আর অধিক না বাড়িয়ে তার

আদায়ের নিশ্চয়তা রক্ষা করাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। তাই আদায়কারী জমিদারদের প্রায় সব দাবী মেনে নিয়ে রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করা হল এবং যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভূস্বামীরা দেয় রাজস্ব জমা দিতে বাধ্য হয় তার জন্য 'সূর্যাস্ত আইন' ও নানারকম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের প্রজাশোষণের অবাধ সুযোগ করে দেওয়া হল। জমিদারদের দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট হল কিন্তু প্রজাদের খাজনা জমিদার ইচ্ছামত বাড়াবার অধিকার পেল। এ ছাড়াও প্রজা উচ্ছেদ, টাকার লোভে জমি ইচ্ছামত বিলি-বন্দোবস্ত করা। জমিদারেরা সেসব সুযোগও গ্রহণ করতে লাগল। কিন্তু প্রজার প্রতি কিম্বা জমির প্রতি তারা দায়িত্বপালনের জন্য বাধ্য রইল না আসল কথা আইন হল জমিদারের স্বার্থে। জমিদারদের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের জন্য সূর্যাস্ত আইনের মত কঠোর ব্যবস্থা ছিল—প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অনুরূপ ক্ষমতার জন্য দাবী জানান হল। ১৭৯৯ সালে সপ্তম রেগুলেশনে জমিদারদের প্রজার অস্থাবর ক্রোক করা এবং প্রজাদের কয়েদ করার অধিকার দেওয়া হল। সপ্তম রেগুলেশনই 'হপ্তম' নামে সুপরিচিত। এই আইনের ফলে প্রজার প্রতি অত্যাচার চরমে ওঠার ফলে তার সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮১৩ সালে পঞ্চম রেগুলেশনের মারফত কয়েদ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। এই দুই আইনকেই একত্রে 'হপ্ত পঞ্চম' বলা হয়। ১৮১৯ সালে পত্তনি রেগুলেশনের মাধ্যমে জমিদারি ইজারা দেওয়া আইনসম্মত হয়। এর ফলে অনেক মধ্যস্বত্বভোগী গড়ে ওঠে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সংবাদ-প্রভাকরে ভূমিব্যবস্থা, জমিদার-প্রজা সম্পর্ক, বঙ্গীয় কৃষকদের দুরবস্থা, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে প্রজাদের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা, জমিদার-নীলকর ও প্রজাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, মহাজনের অত্যাচার, সূর্যাস্ত আইন, হপ্ত পঞ্চম, দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল, জমিদারের প্রজাপীড়নের মূল কারণ, জমিদারদের সমস্যা, ভূমি জরিপের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানান বিষয়ের উপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করেছেন। এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছেন—বিশেষতঃ জমিদার-প্রজার সম্পর্কের বিষয়ে। জমিদারের প্রজা উৎপীড়ন এবং বঙ্গীয় কৃষকদের দুর্দশা বর্ণনায় তিনি অকুণ্ঠ এবং সমবেদনাশীল কিন্তু জমিদারদের উপর রাজস্ব আদায় ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের জুলুম এবং কঠোর নীতিকেও তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন—কারণ তাঁর মতে সূর্যাস্ত আইনের কঠোরতাই প্রজার উপর জমিদারের অত্যাচারের মূল কারণ। কারণ নির্দিষ্ট সূর্যাস্ত সময়ের মধ্যে রাজস্ব সরকারের তহবিলে জমা দিতে না

পারলে জমিদারকে শাস্তি ভোগ করতে হত—তার জমিদারি নিলামে উঠত—সেই কারণেই প্রজাপীড়ন করে তাঁকে খাজনা আদায় করতে হত। ঈশ্বর গুপ্তের মতে প্রজাদের দুরবস্থা এবং জমিদারের শোষণ কোনও দিনই বন্ধ হবে না যতদিন না সরকারের ভূমিরাজস্ব আদায়ের নিয়ম শিথিল হয়। ঈশ্বর গুপ্তের এই মতবাদকে অনেক ক্ষেত্রে জমিদারশ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতমূলক বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বিচারে ঈশ্বর গুপ্তের এই মতবাদ অবৈজ্ঞানিক নয়। কারণ ব্রিটিশ শাসনের কাঠামোর মধ্যেই ছিল শোষণের বীজ। জমিদারিপ্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে সেই শোষণের রূপ আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত জমিদার-শ্রেণীকে অত্যাচারী বলতে দ্বিধা করেন নি—কিন্তু অত্যাচারের মূল কারণ হিসাবে তিনি সরকারকেই অধিকতর দায়ী করেছেন। এবং সরকারী নীতি পরিবর্তিত না হলে এ অত্যাচার বন্ধ হবে না এ কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন। যেসকল দেশহিতৈষী এবং প্রজাহিতৈষী পত্রিকা জমিদারদের নিন্দা করেছেন এবং ব্রিটিশ শাসনের জয়গান গেয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর গুপ্ত তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধে।

বর্ণনা করেছেন—নীলকরসাহেবদের অত্যাচারে নিপীড়িত প্রজাদের দুর্দশা; জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদের বিদ্বেষ সম্পর্ক এবং এই দুইয়ের টানা পোড়েনে প্রজাদের প্রাণান্তকর পরিস্থিতি। নির্বিচারে তাদের আটক করে রাখা হয়। অথচ জমিদারের কাছে সাহায্য চেয়েও পাওয়া যায় না—কারণ তারা নিরুপায়। আবার ইংরেজ সরকারের আনুকূল্যে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতা অসীম এবং তাঁরা ছিলেন নীলকরসাহেবদের সুহৃৎ। সেই কারণে নীলকরসাহেবদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবদের কাছে আবেদন জানানো নিষ্ফল তো হতই উপরন্তু তারই নির্দেশে নীলকররা অবাধ্য প্রজার উপর অবাধে অত্যাচার চালাত। অতএব ক্ষমাভিক্ষা ছাড়া শেষ পর্যন্ত গত্যন্তর থাকত না। বঙ্গীয় কৃষকেরা এইভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে চিরকাল। ইংরেজ রাজত্বে ঈশ্বর গুপ্তের ইংরেজ-বিদ্বেষ তাঁর স্বাধীন ও নির্ভীক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। সংবাদ-প্রভাকরের পাতায় ডাহা বাঙ্গালী ঈশ্বর গুপ্ত সর্ব বিষয়েই ব্রিটিশ সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনকে সোচ্চারে দায়ী করেছেন।

সন তারিখ সম্বলিত বিভিন্ন সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা উদ্ধৃত করে উপরোক্ত বিষয়গুলি আরও প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

১১ই আষাঢ় ১২৫৮ (ইং ১৮৫১)-এ রচিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন—

"পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ২ জমীদার ও ইজারাদার ও বাড়ীদারদিগের অত্যাচারের ব্যাপার আমরা পুনঃ ২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া থাকি, ঐ সকল দৌরাত্ম্য কোনকালে নিবারণ হয় এমত বোধ করি না, দীন-দুঃখীদিগের দুঃখ বিবরণ বর্ণন করিতে আমারদিগের কাষ্ঠের লেখনী করুণারসে আর্দ্র হইতেছে। জমীদার ইজারাদার, যোৎদার প্রভৃতির দ্বারা হইতে মুক্ত হইলেও বাড়ীদারের বাড়ীর প্রহার হইতে রক্ষা পাওয়া কখনই সম্ভবে না।"

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক তাঁর জনৈক সহযোগী বন্ধুর প্রেরিত একটি পত্র উদ্ধৃত করেছেন। তাতে পল্লীগ্রামের কৃষকদের দুঃখকষ্ট মহাজনের উৎপীড়নের বিশদ বর্ণনা আছে। এই পত্রটি গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষের একটি প্রতীক চিত্র তুলে ধরেছে বলেই সম্পাদক তার উল্লেখ করেছেন। পত্রলেখক লিখেছেন—"পল্লী-গ্রাম মাত্রে কৃষক লোকেরা প্রায় সকলেই নির্ধন অন্নাচ্ছাদনের সামর্থ্য রহিত, সুতরাং তাহারদিগের অন্ন জন্য উপায় কি আছে কাযেই ধান্যের বাড়ীদাতা মহাজনগণের নিকট যাইতে হয়·· পণ্ডিত কর্তৃক কথিত আছে—যদি উদরের জ্বালা না থাকিত তবে পক্ষিকুল ফাঁদে পতিত হইত না। এবং ব্যাধেরাও ফাঁদ বিস্তীর্ণ করিত না। সে যাহা হউক ঐ ধান্যের মহাজন সকলের মধ্যে অধিকাংশ তালুকদার অপরলোক অত্যল্প কৃষকেরা কর্ষণের সময়ে অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যত পরিমাণে ধান্য লইয়া খত লিখিয়া দেয় পৌষ ও মাঘ মাসে তাহার দেড়া দিতে হয়। এরূপ নিয়মবদ্ধ আছে, অনন্তর যদি দৈববশতঃ ফসল না জন্মে তবেই সর্ব-নাশ ঘটিয়া উঠে। খতের লিখিত ধান্য উক্ত নিয়মে পরিশোধ করিতে না পারিলে ঐ দেড়া ধান্যের খত লেখাইয়া লয়, তাহাতে দেড়-বৎসরের ভিতর চারি-শলি ধান্য লইলে গুণশালি ঋণদাতাকে নয় শালি প্রদান করিতে হয়।"

পত্রটি উদ্ধৃত করে পরে সম্পাদক মহাশয় নিজস্ব মন্তব্য যুক্ত করেছেন—"ইহার (পত্রের) একটি কথাও মিথ্যা নহে, বরং জমীদার ও মহাজনেরা প্রজার উপর আরও অধিক দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন..... রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং অর্থাৎ রাজা সকল বিষয় কর্ণেই দেখেন। ফলতঃ রাজার বিদিত নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আমারদিগের লেখনীর মুখে ক্ষণমাত্র আলস্য নাই কি করিব। প্রজার অদৃষ্টক্রমে ভূপতি এককালীন বধির।......এজন্য অনুরোধ করি গভর্ণমেণ্ট যেমন অন্যান্য সমুদয় অত্যাচার বিনাশ করিয়াছেন..... সেইরূপ নিয়ম ধান্য বিষয়ে প্রচারিত হইলে প্রজার পক্ষে মঙ্গল দর্শে।"

২-৩-১২৫৫ ; ২৩-১১-১২৫৮ ; ১-১০-১২৬৫ ; ৬-১০-১২৬৬ ; ৩০-১১-১২৬৬ এবং ১৮-১২-১২৭০ তারিখে লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলিতে নীলকর

সাহেবদের অত্যাচারের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে চার-পাঁচশ কৃষকের লাঙল কাঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনাকে ঈশ্বর গুপ্ত, সানন্দে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

"নীলকরের দৌরাত্ম্যে রাইয়ৎ লোকের সর্বনাশ" হিন্দু পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ নামক পত্রিকায় উক্ত শিরোনামে পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে নদীয়া জেলায় নীলকুঠির গোমস্তার অত্যাচারের বিশদ বিবরণ, জমিদারের নিষ্ক্রিয়তা ও অসহায়তা এবং প্রজাদের যৌথভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, কারাবরণ, পরিশেষে সেলামী দিয়ে উদ্ধারলাভ এবং ক্ষমাপ্রার্থনা—নীলকরদের রক্ষার জন্য ইংরেজ সরকারের আনুকূল্য—এ সকলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত সকলের অবগতির জন্য হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন সম্পাদকীয় স্তম্ভে।

নীলকরসাহেবরা কিভাবে চাষীদের নীল চাষ করায় বাধ্য করে—কি সর্তে চাষীরা দাদন গ্রহণ করে, তাদের অজ্ঞতা এবং প্রলোভন সেই সঙ্গে ভীরুতার কারণেই যে তারা অত্যাচারিত হয় এই সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮-১২-১২৭০ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে। নীলের দাদন যে কত ভয়ানক এবং কিভাবে ছলনা ও প্রতারণার দ্বারা মুর্খ প্রজাদের দাদন গ্রহণে বাধ্য করা হত তার বিবরণ দিয়ে বলেছেন—"পরে চার্লস গ্রাণ্টের করুণায় প্রজারা জানতে পেরেছিল যে নিজ ক্ষেত্রে নীল চাষ করার দাদন গ্রহণ করতে তারা বাধ্য নয়। কিন্তু পরে "চুক্তিভঙ্গকারীদের প্রতি অভিযোগ ও বিখ্যাত দশ আইনের বিচারমতে ভূমির খাজনা বৃদ্ধি করণের যে ভয়ঙ্কর নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার বিধানানুসারে প্রজাপীড়নের বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াতে পুনর্বার দাদনের নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যে প্রজা নীলকরদিগের আদেশমতে নীলকুঠিতে উপস্থিত হইয়া যৎসামান্য অর্থ দাদনে সেই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দেয়—তাহার প্রধান চুক্তিভঙ্গ অথবা ভূমির জমা বৃদ্ধি বিষয়ক অভিযোগ উপস্থিত হয় না।"

এই রাজ্যের নীল চাষীদের অবস্থা-বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন "তাহারদিগের অবস্থা আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হইবেক।" জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদের সম্পর্ক অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ ছিল। প্রজাদের বেগার ধরে নীলবীজ বপন—বলপূর্বক জমিদারের ভূমিতে চাষ করে, লাঠির বলে সেসকল কেটে নেওয়া—ইত্যাদি কারণে নীলকরদের সঙ্গে জমিদারদের বিবাদ উপস্থিত হয়। নীলকরসাহেবরা প্রজাদের দুভাবে ঠকাতো। জমির মাপে এবং ফসলের মাপে। জমির সমস্ত ফসল নীলকরদের দিয়েও জমিদারের প্রাপ্য খাজনা শোধ

হত না। কারণ নীল চাষের দাদন নিলেই জমিদাররা জমির খাজনা বাড়িয়ে নিতেন। এইভাবে প্রজারা একই সঙ্গে জমিদার ও নীলকরদের দ্বারা অত্যাচারিত হত। অবশ্য নীল বিদ্রোহের সময় জমিদার ও প্রজা একই স্বার্থের সামিল হয়েছিলেন এবং যৌথভাবে আন্দোলন করেছিলেন।

একাধিক সম্পাদকীয় স্তম্ভে ঈশ্বর গুপ্ত জমিদারের প্রজাশোষণের মূল কারণ এবং বঙ্গীয় কৃষকগণের দুরবস্থা এবং তার সমাধান বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন এবং সকল ব্যাপারে ইংরেজের ভূমিরাজস্বনীতিকেই দায়ী করেছেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের উদ্যোগে পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনা হল। এতে স্থির হল জমিদারদের বংশানুক্রমিক মালিক হিসাবে মেনে নেওয়া হবে। জমিদারদের বাৎসরিক যে টাকা সরকারকে দিতে হবে তা আদায়ীকৃত রাজস্বের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। জমিদারদের পরিমাণ চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এর ফলে সুদূর অতীতকাল থেকে জমির উপর যৌথ ও ব্যক্তিগতভাবে যে অধিকার এতদিন কৃষকেরা ভোগ করে আসছিল তা সম্পূর্ণভাবে লোপ করে দেওয়া হল। "জমিদারদের ভূস্বামী করে দিয়ে এবং কৃষকদের তাঁদের অধীনস্থ প্রজা করে দিয়ে ইংরাজই প্রথম পরিপূর্ণভাবে ভূমিব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের পত্তন করে।" ( বিনয় চৌধুরী—বাংলার ভূমিব্যবস্থার রূপরেখা )

যে সময় ফরাসীদেশে সমাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে বাংলাদেশের কৃষকেরা তখন হারিয়েছে ভূমির উপর তাদের দীর্ঘদিনের অধিকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নির্দিষ্ট সময়ে যাতে জমিদাররা রাজস্ব জমা দিতে বাধ্য থাকে তার জন্য বিভিন্নরকম কঠোর আইনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল আইনের মধ্যে সূর্যাস্ত আইন প্রধানতম। ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ-প্রভাকরে সূর্যাস্ত আইনের কঠোর সমালোচনা করেছেন কারণ তাঁর মতে এই আইনের ফলেই প্রজাদের প্রতি জমিদারদের উৎপীড়ন তীব্রতর হয়েছে।

২৮-৫-১২৫৯ তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন—"এই বঙ্গদেশের ভূম্যাদি স্বভাবতঃ অতি উর্বরা। অল্প পরিশ্রম করিলেই তাহাতে প্রচুররূপে শস্য ও ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে—উপজীবিকা নির্বাহের এতাদৃশ সদুপায় সত্ত্বেও কৃষকাদিগের দুঃখ মোচন হয় না—তাহারা ছিন্ন বসন পরিধান ও পর্ণকুটিরে অবস্থান করে বহু ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত দিনান্তে উদরান্ন নির্বাহ করিতে পারে না। কৃষকমণ্ডলীর এই দুরবস্থার কারণ অবধারণে আমরা একপ্রকার অক্ষম হইয়াছি। কেহ ২ ভূম্যধিকারিগণের প্রতি সকল দোষ অর্পণ করেন, কিন্তু প্রকৃত

বিবেচনায়, তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না—কারণ জমিদারেরা ভূমির নির্ণীত জমাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহারা হালবকেয়া হিসাবে আদায় করেন। দুষ্ট প্রজা ব্যতীত নির্দোষ প্রজার বিরুদ্ধে কোন জমিদার হপ্তম্ বা পঞ্চম আইন জারী করেন না। গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত রাজস্ব সংগ্রহকারক কালেক্টর-সাহেবরা কিস্তির নির্দিষ্ট দিবসে সূর্যাস্ত সময়ের মধ্যে যে প্রকার কঠিন নিয়মে রাজস্বের টাকা আদায় করেন জমিদারেরা যদ্যপি সেই প্রকার ক্লেশকর নিয়মের অনুগামী হইয়া খাজানা আদায় করিতেন তবে প্রজাদিগের চালে খড়গাছাও থাকিত না। এই বিষয়োপলক্ষে আমারদিগের দৈনিক সহযোগী ইংলিশম্যান সম্পাদক মহাশয় অনেক উত্তম যুক্তি লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে—

"যদিও কোন কোন জমীদার খাজানার জন্য কোনও প্রজার প্রতি অন্যায় আচরণ করেন তথায় বিশিষ্টরূপ বিচারে সেই দোষ গভর্ণমেণ্ট প্রতিই অর্পিত হইতে পারে—কারণ রাজপুরুষেরা নীলাম করণের যে ভয়ানক নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে কোনমতেই জমীদারের রক্ষা নাই। ঐ নীলামের দিন যত নিকটস্থ হইতে থাকে ততই জমীদারেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অসীম চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন।

অতএব গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিষয়ক চলিত নিয়মকে বঙ্গদেশীয়, কৃষক ও জমীদারগণের দুরবস্থার কারণ বলিতে হইবেক।

আমারদিগের রাজপুরুষেরা এই রুচির নিয়ম একেবারে অবহেলন করিয়া বসিয়াছেন। প্রজারা কিরূপে অবস্থান করিতেছে তাহার প্রতি তাঁহারদিগের কিছুই দৃষ্টি নাই। কোন বৎসর শস্য হউক বা না হউক তাঁহারা নিয়মিত রাজস্বের একটি পয়সাও পরিত্যাগ করেন না—এতদ্ভিন্ন ইজারাদার পত্তনিদার, দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি বহু লোকে কৃষকের পরিশ্রমার্জিত বস্তুর অংশগ্রহণ পূর্বক আপনাপন উপার্জ্জনে তৎপর থাকাতে কৃষকের অবস্থা অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে যাঁহারদিগের অধীনস্থ প্রজামণ্ডলীর ঈদৃশ দুরবস্থা—তাঁহারদিগের সুসভ্য ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতে কি লজ্জা বোধ হয় না ?"

সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র সংকলনগ্রন্থের ভূমিকায় সামন্তশ্রেণী সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব বিশ্লেষণ করে সম্পাদক ও সংকলক শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় লিখেছেন—"সেকালের জমিদারীও নেই জমিদারও নেই। দুই-ই যে ব্রিটিশ আমলে লোপ পেয়েছে প্রভাকর তা জানত ও বুঝত। নতুন জমিদাররা টাকা দিয়ে যেমন কোম্পানির কাগজ বা অন্যান্য অর্থকরী সম্পত্তি কেনেন তেমনি জমি-দারীও কিনেছেন। সুতরাং টাকায় টাকাবৃদ্ধির চেষ্টা করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

টাকা ও মুনাফাটা হয়ে উঠেছে মুখ্য। জমি ফসল প্রজা ইত্যাদি গৌণ। তার ফলে জমির উপর নির্ভরশীল বিরাট একটা নিষ্ক্রিয় ও অপদার্থ মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে বাংলার গ্রাম্য সমাজে। তার সম্পূর্ণ বোঝাটা বহন করতে হচ্ছে সমাজের তলাকার কৃষকশ্রেণীকে। গ্রামে শোষকের সংখ্যা যত বাড়ছে শোষিত কৃষকদের দুঃখকষ্টও তত দুঃসহ হয়ে উঠেছে।" [ বিনয় ঘোষ—( সংবাদ-প্রভাকরের ভূমিকা ) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম খণ্ড ]

জমিদার-প্রজার মধ্যে শোষক শোষিত সম্পর্কের কারণ নির্ণয় করে ২০-৬-১২৬০ সালে তিনি যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন —"কোন্ দেশ হইতে গভর্ণর্মেণ্টের অধিক রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহার বিবেচনা করিতে হইলে এই বঙ্গ রাজ্যকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক, অতএব বিজ্ঞ লোকেরা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে, দশসালা বন্দোবস্তের দ্বারা গভর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হয় নাই। বরং তাঁহারদিগের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, কেবল কৃষকেরা কোন কোন বিষয়ে ক্লেশ পাইতেছে। ফলতঃ যুক্তিমতে আমারদিগের রাজপুরুষেরাই সেই ক্লেশের কারণ হইয়াছেন, তাঁহারা যদ্যপি রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত জমিদারের প্রতি কঠিন নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিতেন তবে জমিদারেরা প্রজার সর্বস্ব বিক্রয় করিতেন না, গভর্ণমেণ্টের এই নিয়মে পূর্বেকার অনেক জমিদার আপনাপন ভূমি সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া ক্লেশসাগরে অবগাহন করিয়াছেন এবং অনেক বহুমূল্যের জমিদারি সামান্য মূল্যে বিক্রয় হইয়া গভর্ণমেণ্টের খাস তোসিলভুক্ত হইয়াছে অধুনা জমিদারদিগের মধ্যে অদ্যাবধি এরূপ নিয়ম চলিত আছে যে তাঁহারা হালবকেয়া হিসাব অনুসারে প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সেই নিয়ম নাই। অতএব দশসালের বন্দোবস্ত প্রজার ক্লেশের কারণ হয় নাই।"

৯-৮-১২৬০ সালের প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন সামন্তশ্রেণীর স্থলে নবাগত জমিদারশ্রেণীর উদ্ভবের কার্যকারণ নির্ণয় করেছেন। সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন— "গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত ক্রমে কঠিন নিয়মসকল নির্ধারণ করাতে এবং প্রজাসকল দুরবস্থায় পতিত হওয়ায় সেই সুখ ও আয়েরও অন্যথা হয় একারণ অনেক জমিদারী কালেক্টরসাহেবের নিলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে। পূর্বে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত জমিদার বলিয়া রাজদ্বারে ও সাধারণ সমাজে মান্য ও প্রতিপন্ন ছিলেন অধুনা তাহারদিগের পরিবারগণ অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন।"

প্রাচীন জমিদারদের স্থলে কোম্পানির আমলে এই নবোদিত জমিদারশ্রেণীই পরবর্তীকাল পর্যন্ত জমিদার নামে পরিচিত হয়েছেন এবং ইংরেজ আমল

থেকে রাজস্ব সংগ্রহের নামে প্রজা উৎপীড়নের যে প্রবণতা তাঁদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে। মাত্র সাতচল্লিশ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে সুদূর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেওয়া গুপ্ত কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তথাপি সমকালীন কতকগুলি ঘটনা থেকে তিনি সাম্প্রতিক জমিদারশ্রেণীর স্বার্থপরতার স্পষ্ট আভাস দিয়েছেন। ১৭-৮-১২৬০ সালের সম্পাদকীয় স্তম্ভে "বাংলাদেশের জমিদার" শিরোনামে তিনি লিখেছেন—"এই বঙ্গদেশের জমীদারগণের পরস্পর বিবাদ কি নিবারণ হইবেক না ?"

তিনি আরও লিখেছেন......"নীলকর ব্যতীত জমীদারের সহিত জমীদারের ও তালুকদারের সহিত ইজারাদারের অনেক বিবাদ হইতেছে – তাহাতে লাঠালাঠি ও প্রাণিহত্যা পর্যন্ত হইতেছে। মনোহরপুরের বিখ্যাত দাঙ্গা অনেকের স্মরণ আছে – তাহাকে একপ্রকার ক্ষুদ্র যুদ্ধ বলিলেই ভাল হয়।" এবং এ ক্ষেত্রেও তিনি ব্রিটিশ সরকারকেই দায়ী করেছেন। "ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিয়মের দোষেই এই বঙ্গদেশ মধ্যে ভূম্যাদি সম্বন্ধে বিবিধপ্রকার বিবাদ হইতেছে।"

সংবাদ-প্রভাকরের বেশ কয়েক সংখ্যাক পত্রে কৃষক ও প্রজার দুরবস্থা নিয়ে সম্পাদক আলোচনা করেছেন এবং দুরবস্থার মূল কারণ সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তার সমাধানেরও উপায় দেখিয়েছেন। এবং এই প্রত্যেকটি রচনাই তাঁর সহানুভূতিশীল দরদী মন এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিজ্ঞানের প্রমাণস্বরূপ।

৫-৫-১২৬৪ সালের বাংলার কৃষকদের সম্পর্কে লিখিত সম্পাদকীয় স্তম্ভে ঈশ্বর গুপ্ত মেং রবিনসন নামক ইংরেজ লেখকের বঙ্গদেশের কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কিত পুস্তিকার সমালোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন এবং পরে নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন— "রবিনসনসাহেব বঙ্গদেশীয় কৃষকদের দুরবস্থা এতরূপে করিয়া পরিশেষে জমিদারদিগের প্রতিই সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন জমিদারেরাই এই সকল দুঃখের মূল হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট জমিদারি বিশেষের যেরূপ রাজস্ব নিরূপণ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে গভর্ণমেণ্ট ভূমির উৎপন্নের অর্দ্ধাংশও গ্রহণ করেন না।......অপরার্দ্ধ সত্ত্বে কৃষককুল কি কারণে এই কষ্ট সহ্য করে। তাহা কোথায় যায় কে বণ্টন করিয়া লয় ?"—তদুত্তরে ঈশ্বর গুপ্ত জানিয়েছেন—"গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব সম্বন্ধীয় অপরিচ্ছিন্ন নিয়মই কৃষকের সকল দুঃখের মূল হইয়াছে, কারণ আমারদিগের রাজপুরুষেরা এ দেশে রাজকার্যের ভার গ্রহণ করিয়া ৩০ বৎসর পর্যন্ত ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত বিবিধপ্রকার নিয়ম নিবন্ধন করিয়াছিলেন ফলতঃ কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই......

পরিশেষে রাজনীতি নিপুণ মহাত্মা লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এ দেশে আগমন করিয়া ইংরাজী ১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশের ভূমির রাজস্ব বিষয়ে দশসালা বন্দবস্ত নামে যে সুবিখ্যাত নিয়মপত্র নির্দিষ্ট করিয়াছেন বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স সাহেবদিগের অভিমতক্রমে তাহাই চিরস্থায়ী হইয়াছে—গভর্ণমেণ্ট একপ্রকার শপথ পূর্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কোনকালে ঐ নিয়মের রূপান্তর করিবেন না। এই নিয়মবলেই গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের ন্যূনাতিরেক বিবেচনায় জমিদারি সকলের মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মূল্য দিয়া তাহা প্রায় সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন অর্থাৎ যেমন কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য ভূমি সম্পত্তি সেইরূপ জমিদারী মনুষ্য অর্থ দিয়া যে কোনও ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

অতএব বহু ধন দ্বারা অর্জিত জমিদারী হইতে ভূম্যধিকারিরা লভ্য প্রত্যাশা করিবেন—ইহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না। বিশেষতঃ জমিদারী সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই তাহারদিগের রাজনিয়মের অধীন হইতে হয়।"

পরিশেষে লেখক কৃষকের দুর্দশার মূল অনুসন্ধান করে বলেছেন—"আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে গভর্ণমেণ্টের নিয়মের বিশৃঙ্খলার ও কৃষকদিগের মূর্খতা দোষই তাহারদিগের সমূহ ক্লেশের কারণ হইয়াছে। জমিদার, পত্তনিদার, তালুকদার, দরপত্তনিদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগীর সংখ্যা রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে। তাহারা স্বহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্য কিছুই করে না অথচ কৃষকের উপর কর্তৃত্ব করে।"

লেখকের মতে—"গভর্ণমেণ্ট যদ্যপি কৃষকের দুর্দ্দশা সমস্ত সন্দর্শনপূর্বক যদ্যপি রাজনিয়মাদির সংশোধন করেন তবে কৃষকের দুঃখ অনেক অনেক মোচন হইতে পারে।"

কৃষকদের দুর্দশার অপর কারণস্বরূপ তিনি মধ্যস্বত্বভোগী তথা মহাজনদের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। ৮-৮-১২৭০ সালের সম্পাদকীয়তে নদীয়া জেলার এক রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি বিষয়টির আলোচনা করেছেন। মহাজনের কাছে কৃষক ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়—অসময়ে মহাজনেরা তাদের বীজধান প্রদান করে, অভাবের সময় শস্যাদি এবং অর্থ কর্জ দেয় এ কথা ঠিক—কিন্তু পরে সুদে-আসলে তারা যা আদায় করে তাতেই কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। মহাজনের সুদ ও জমিদারের খাজনা মেটাবার পর কৃষকের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর গুপ্ত

বলেছেন—"অতএব কৃষকগণ যাহাতে গ্রাম্য মহাজনদিগের নিকট ঋণজালে বদ্ধ না হয় তাহারা প্রয়োজনমতে গভর্ণমেণ্ট অথবা জমিদারদিগের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত হইতে পারে—তাহারদিগের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে সুদ গৃহীত না হয়—এমন উপায় করা আমারদিগের ব্যবস্থাপক মহাশয়দিগের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়াছে।"

লক্ষণীয়, পূর্ণ ইংরেজ রাজত্বকালে বাস করেও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গুপ্তকবি যেভাবে ভূমিব্যবস্থার মধ্যে সরকারী নীতির অসঙ্গতি এবং অবিচার লক্ষ করে সোচ্চারে তার সমালোচনা করেছেন – আবার তার সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন – সেই জোরালো, নির্ভীক ভঙ্গি ও মানসিকতা – বঙ্কিমের মধ্যে এমন কি তার পরবর্তীকালের আরও বহু সাহিত্যিক ·সমালোচকের মধ্যে আমরা কোথাও খুঁজে পাই নি।

জমিদার ও সূর্যাস্ত আইন নামক সম্পাদকীয়তে (২৫·৬-১২৫৯), সূর্যাস্ত আইনের সমর্থক ফ্রেণ্ড সম্পাদকের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন —"ঐ নিয়মে জমীদারদিগের যে পর্যন্ত ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে অন্য উপায় দ্বারাও তাহা আমরা বিলক্ষণ দৃষ্ট করিতেছি।

রাজস্ব নিমিত্ত অনেক জমিদারি বন্ধক পড়িয়াছে তাহার মধ্যে কতক বা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—কতক জমীদারগণের হস্তে আছে বটে কিন্তু তাহার সুদ গুণিতেই মহাক্লেশে পড়িয়াছেন—নীলামের ক্লেশকর নিয়ম হইবার পূর্বে জমিদারদিগের এপ্রকার দুরবস্থা কিছুই ছিল না।"

তাঁর মতে—"রাজস্ব গ্রহণ জন্য কঠিন নিয়ম নির্দ্ধারণ করাতেই জমীদারেও প্রজার ঘর দ্বার পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া খাজানার টাকা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছে।"

গভর্ণমেণ্টের ভূমি জরিপব্যবস্থা সম্পর্কেও ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদকীয় মন্তব্য অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তিনি লিখেছেন—"কোন্ ভূমি কার তাহার নিশ্চয় করা অতি আবশ্যক হইয়াছে। জরিপের সময় একের ভূমি যদ্যপি অন্যের নামে লেখা হয় তবে ভবিষ্যতে তজ্জন্য অবশ্য গোলযোগ হইতে পারে। অতএব যে কার্যের দ্বারা একের স্বত্বের অপহ্নব হইতে পারে তাহা কোনমতেই উপকারজনক নহে।"

মেকির চিরশত্রু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে উগ্র ·স্বাজাত্য বোধ এবং তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষ থাকার দরুন তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ·শানিত। তাই তাঁর সামন্তচিন্তার সঙ্গে পরবর্তী সাহিত্যিকদের চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়।

# বিদ্যাসাগর

সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ও বিবর্তনের আলোচনায় বিদ্যাসাগরের মতামত বিস্তৃত না হলেও গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। সেই কারণে সামন্ততন্ত্রের একাল পর্যায় বিশ্লেষণের ভূমিকারূপে প্রথমেই বিদ্যাসাগর রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করতে হচ্ছে। সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী অধ্যায়, তার সুফল কুফল নিয়ে ভাবিত ছিলেন—তার প্রমাণ আছে তাঁর বাঙ্গালীর ইতিহাস নামক নিবন্ধটিতে। বাঙলার ইতিহাস-বিষয়ক নিবন্ধটি থেকে অংশবিশেষ (পঞ্চম অধ্যায়) তুলে দেখানো যেতে পারে—সমকালীন মানুষের দৃষ্টিতে প্রায় সমকালীন ইতিহাস সমীক্ষার গুরুত্ব কতখানি যদিও এ গ্রন্থটিকে মৌলিক রচনা বলা যায় না। আবার সম্পূর্ণ অনুবাদও নয়। বিদ্যাসাগরের মতানুসারে "এই পুস্তকে..... নবাব সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ অবধি......বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের অধিকার সমাপ্তি পর্যন্ত .....এ কোন অশীতি বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে" ১৭৫৬ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত। ইংরেজ শাসনের সূচনায় অর্থাৎ কোম্পানির আমলে জমিদারদের অবস্থা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখছেন—

"জমিদার ও প্রজাবর্গ কাহাকে প্রভু বলিয়া মান্য করিবেন—তাঁহারা কিছুই জানিতেন না—সমস্ত রাজকার্যের নির্বাহের ভার নবাব ও তদীয় অমাত্যবর্গের হস্তে ছিল কিন্তু ইংরেজরা এ দেশের সর্বত্র এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিলেও রাজপুরুষেরা তাঁহাদের শাসন করিতে পারিতেন না .....ফলতঃই ইংরাজদিগের দেওয়ানী প্রাপ্তির পর সাত বৎসর সমস্ত দেশে যারপর নাই বিশৃঙ্খলা ও অতি ভয়ানক অত্যাচার বাধিয়াছিল। জমিদারদের কার্যবিধি সম্পর্কে বলেছেন তৎকালে জমীদারেরা কেবল প্রধান করসংগ্রাহক ছিলেন।"

হেষ্টিংস-এর সময় জমিদারিব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা নিয়ে লিখেছেন— "১৪ই মে কৌন্সিলের সম্মতিক্রমে এই ঘোষণা প্রচারিত হইল যে ইংরাজেরা স্বয়ং রাজস্বের কার্যনির্বাহ করিবেন। যেসকল য়ুরোপীয় কর্মচারী রাজস্বের কর্ম করিবেন তাহাদের নাম কালেক্টার হইবেক। কিছুকালের নিমিত্ত সমুদয় জমী ইজারা দেওয়া যাইবেক। আর কৌন্সিলের চারিজন মেম্বর, প্রত্যেক

প্রদেশে গিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। ইঁহারা প্রথমে কৃষ্ণনগরে গিয়া কার্যারম্ভ করিলেন। পূর্বাধিকারীরা অত্যন্ত কম নিরিখে, মালগুজারী[১] দিতে চাহিবাতে। তাহারা সমুদয় জমী নীলাম করাইতে লাগিলেন। যে জমিদার অথবা তালুকদার মালগুজারী দিতে সম্মত হইলেন তিনি আপন বিষয় পূর্ববৎ—অধিকার করিতে লাগিলেন। আর যিনি অত্যন্ত কম দিতে চাহিলেন, তাহাকে পেনশান দিয়া অধিকারচ্যুত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়াইলেন।

..... মহাজন দিগের স্বেচ্ছাক্রমে খাতককে বুদ্ধ করিয়া টাকা আদায় করিবার যে ক্ষমতা ছিল, তাহাও নির্ধারিত হইল। আর দশ টাকার অনধিক দেওয়ানী মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তির ভার পরগনার প্রধান ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পিত হইল।

ইজারাদার রেজাখাঁর অত্যাচার সম্পর্কে বলা হয়েছে—সকলে সন্দেহ করত তিনি অনেক রাজস্ব ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগেরও অধিক নিপীড়ন করিয়াছিলেন।

বাংলার ইতিহাস মার্শম্যানের অনুসরণে রচিত হলেও সামন্ততন্ত্রের সম্পর্কে যে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করতেন না তা নয়। কারণ বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য জীবনের মত সামন্তপ্রথাও বাংলাদেশের সমাজজীবনে একটি অভিশাপ ছিল। বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহের (দ্বিতীয় খণ্ডের) ভূমিকায় শ্রীগোপাল হালদারের বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ এখানে প্রয়োজন বিশেষে উদ্ধৃত করা হল "বাংলাদেশে..... একটা বিশেষ দাবি ছিল যে জমিদারতন্ত্রে কর্ণওয়ালিশ বাংলা-দেশকে আধা মধ্যযুগের ব্যবস্থায় অভিশাপগ্রস্ত করেন, সেই জমিদারিতন্ত্রের অভিশাপমোচন। এটাই ছিল বাঙ্গালী জীবনে মূল সমস্যা···এই প্রজাসাধারণের অধিকার লাভের সমস্যা ও জাতীয় মুক্তির সমস্যা এই যুগদাবি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর নিস্পৃহ ছিলেন বলব না কিন্তু মনে হয় অত্যন্ত ভেবেচিন্তেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন।

এই সম্পর্কে যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে গোপাল হালদার যা বলেছেন তার সারমর্ম হল এই যে বিদ্যাসাগরমহাশয় শিক্ষাকেই উন্নতির প্রাথমিক সোপান বলে জানতেন এবং সেই শিক্ষাবিস্তারের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হতে পারেন বিত্তবান ও উচ্চমধ্যবিত্ত। এই ভরসাতেই বিদ্যাসাগর স্বেচ্ছায় নিজেকে প্রজা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত করেন নি। কিন্তু পরে তাঁর সে বিশ্বাস হারায়। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক পত্রে তিনি যে কথা জানিয়ে বলেছিলেন যে—ধণিকশ্রেণী সমাজসংস্কার চায় না তারা ইংরেজের অনুগ্রহ লাভের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা করে নিতে চায়।

১। মালগুজারী—দশসালা বন্দোবস্ত

সেই কারণেই বিদ্যাসাগর পরে বিশেষ করে কর্মাটাড়ে সাঁওতাল প্রভৃতি সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে ওঠেন। বস্তুতঃ দীন দুঃখী ও আর্তজনের জন্যই তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীকে নাকি তিনি বলেছিলেন ভারতের যে কোনো রাজামহারাজার নাকের উপর তিনি এই চটিশুদ্ধ পায়ের লাথি মারতে পারেন। কিন্তু প্রজাকল্যাণের জন্যই হয়তো তিনি বণিকশ্রেণীর প্রতি ঘৃণাভাব দেখান নি। কারণ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত স্বার্থ জমিদারীপ্রথার সঙ্গেও তখন পর্যন্ত জড়িত ছিল। এই সম্পর্কে শ্রী হালদারের ভূমিকার একটি বৃহৎ অংশ বিদ্যাসাগরের সমাজদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা এই পর্যায় থেকে উদ্ধৃতি তুললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"১৭৯৩-এর ব্যবস্থায় অধিকারহীন প্রজাদের যে কী দুর্দ্দশা, তা বীরসিংহের ঠাকুরদাসের পুত্রের পক্ষে না জানার কথা নয়। বিদ্যাসাগর নিজে ভূসম্পত্তির অধিকার চান নি। বর্ধমানের মহারাজা বীরসিংহের পত্তন তাঁকে দিতে চাইলেও প্রতিবেশীদের হিতে খাজনা আদায় করে মুনাফা তোলা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।"

১৮৩৩-এর সনদ বদলের সময় থেকে বাংলাদেশে প্রজাস্বত্বের প্রশ্ন ও প্রজার দুর্দ্দশার প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে।

১৮৫৪-র সনদ বদলের পূর্বে কতকটা মিশনারিদের প্রচারে প্রজাস্বত্বের প্রশ্ন গুরুতর হয়ে উঠে। তখন জমিদারসভাও তাতে মন দেন। আর প্রজার নামমাত্র অধিকার স্বীকার করে একটা আইনও তখন পাস হয় কিন্তু তাতে সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান হয় নি—জমিদার ও মধ্যস্বত্ববানদের শোষণ একচুলও কমে না—ফলে প্রজার অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রজার স্বপক্ষে যে প্রবন্ধ রচনা করেন শ্রীহালদারের মতে তা নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের সমর্থনেই প্রকাশিত হয়। কারণ অক্ষয়কুমার প্রবন্ধের ভাষা সংশোধনের জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে বিশেষ ঋণী ছিলেন সাহিত্যের ইতিহাসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র ইংরাজীতে জমিদারীপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেন। কিশোরীচাঁদ তো বিদ্যাসাগরের দলভুক্ত ছিলেন। এতএব শ্রী হালদারের মতে এখানেও বিদ্যাসাগরের পরোক্ষ সমর্থন অবশ্যই ছিল।

১৮৫৯-৬০ সালে নীলবিদ্রোহ হয়। দীনবন্ধুর নীলদর্পণে অবশ্য জমিদারী-প্রথার সমালোচনা নেই কারণ সেখানে নীলকরসাহেবদের অত্যাচারে জমিদার গোলোক বসু এবং রায়ত সাধুখাঁ তোরাশ রাইচরণ সকলেই সমানভাবে নিপীড়িত

হয়েছে। বরং গোলোক বসু ও নবীন মাধবকে প্রজাবৎসল জমিদাররূপেই চিত্রিত করা হয়েছে।

অবশ্য এ বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্র কতখানি কল্পনার ব্যবহার করেছিলেন জানা যায় না। শ্রী হালদার আরও লিখেছেন—

"তার পরে ( নীল বিদ্রোহের পরে ) বাংলার বহু জেলায় চলে প্রজা অসন্তোষ ( ১৮৭২ সালের পাবনার প্রজা বিদ্রোহ তার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র )।

১৮৮৪ সালে নতুন প্রজাস্বত্বের আইন পাস হলেও সে পর্যন্ত বাংলা সমাজের প্রধান সমস্যা তো এই সমস্যা—সামন্ততন্ত্রকে উৎখাতের সমস্যা।"

শ্রী হালদার সামন্ততন্ত্রের উৎখাতের সমস্যাকে সেযুগের বাঙ্গালী জীবনের প্রধান সমস্যা বলে বর্ণনা করে পরে বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম কেন সক্রিয়ভাবে সেই আন্দোলনে যোগ দেন নি সে কথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন—বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে এর কারণ হল সমাজদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও শিক্ষাবিস্তারের সমস্যা ছাড়িয়ে তা বৃহত্তর প্রজা আন্দোলনে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি—আর বঙ্কিমের বেলায় তা হল সাহস ও পৌরুষের অভাব। বঙ্কিম সম্পর্কে শ্রী হালদারের মত কতখানি গ্রহণ করা যায় পরবর্তী অধ্যায়ে বঙ্কিম-পর্যায়ে তা আলোচিত হবে। তবে বিদ্যাসাগরের সমাজদৃষ্টির সীমাবদ্ধতার জন্য তিনি সক্রিয় অংশ না নিলেও নিষ্ক্রিয়ভাবেও যে প্রজা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন এ কথা অবশ্যই শ্রী হালদার সমর্থন করেছেন।

সেদিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় কবি বা সাহিত্যিক মাত্রেই তরবারি অপেক্ষা লেখনীকেই আশ্রয় করেন বেশী। বিদ্যাসাগরের জীবন কেবল সংস্কারকর্মে নয়—সাহিত্যকর্মেও নিয়োজিত ছিল। তাঁর সেই বহুল কর্মময় জীবনে এবং সমাজ ও সাহিত্য এই দ্বৈত বিষয়ের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার মধ্যে—প্রজাস্বার্থে যদি দু-চার কথাও ভেবে থাকেন বা লিখে থাকেন তার গুরুত্ব এবং মূল্যও অনেকখানি—কারণ প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে যে তিনি প্রজা আন্দোলনের শরিক ছিলেন এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরী মিত্রের বহু রচনা তত্ত্ববোধিনী ও অন্যান্য পত্রিকায় ইংরেজী ভাষার লিখিত হয়েছিল। এই রচনাগুলিতে জমিদারি-প্রথার সমালোচনা করা হয়। জমিদারিপ্রথার বিবর্তনের ইতিহাসে ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই—তবে বর্তমান আলোচনায় সেগুলিকে বাহুল্য মনে করে অনালোচিত রাখা হল।

# প্যারীচাঁদ মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন সমকালীন লেখক

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের রচনাতেও সেকালের সমাজচিত্র এবং সেই সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সমালোচনাও ধরা দিয়েছে। টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'কেই আমরা এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করব।

আলালের ঘরের দুলালের ২৪ সংখ্যক অধ্যায়ে তদানীন্তন জমিদারি ব্যবস্থায় জমিদার-প্রজা সম্পর্কের যেমন বিশদ বর্ণনা আছে—তেমনি সমগ্র আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থটিকেই ধনী জমিদারের এবং উচ্ছৃংখল পুত্র মতিলালের জীবনকাহিনী বলা যেতে পারে।

মতিলালের পিতা বৈদ্যবাটির বাবুরাম অবশ্যই বনেদী জমিদার নন। বিভিন্ন কাজকর্ম করে এবং উৎকোচ প্রভৃতি গ্রহণাদির দ্বারা প্রচুর অর্থসংগ্রহ করে তিনি বহু জমিদারি, অট্টালিকা, বাগ-বাগিচা, তালুক ইত্যাদি করেন এবং কালে জমিদার নামেই পরিচিত হন। এই উঠতি জমিদারদের কথা পরবর্তীকালে আরও বহু লেখক বর্ণনা করেছেন। বাবুরামের পাশে অপর একজন বনেদী জমিদারের চরিত্রও আঁকা হয়েছে—তিনি হলেন বেচারামবাবু।

বাবুরাম ও বেচারামের চরিত্রগত পার্থক্য থেকেই হঠাৎ জমিদার ও বনেদী জমিদারের প্রভেদ বোঝা যাবে। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে কষ্টার্জিত পয়সা বলে এবং ছাপোষা মানুষ হিসাবে বাবুরাম যতই ধনী হোন না কেন তাঁর মধ্যে অপব্যয়ীতা এবং চরিত্রদোষ (একমাত্র দ্বিতীয় বিবাহ ছাড়া) বিশেষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মতিলাল ধনীর পিতার আদরের দুলাল হিসাবে বাল্যকাল থেকে মদ্যপান, কুসঙ্গ এবং নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ে। লেখাপড়া কিছুই হয় না দিনে দিনে মাতালে পরিণত হয়। লেখক টেকচাঁদ সম্পর্কে বলা হয় তিনি নব্যবঙ্গ তথা ইয়ংবেঙ্গলের চরিত্র গ্রহণ করেছেন উক্ত গ্রন্থে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও অনায়াসে বলা যায়—জমিদারপুত্র শহরবাসী হলে কিভাবে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে ক্রমশঃ উচ্ছন্নের পথে যায় তারও চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়েছে মতিলাল। ঠিক এই কথাই প্রমথ বিশী তাঁর জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবারের এক জায়গায় আলোচনা করেছেন। সে বিষয় পরে আলোচিত হবে।

মতিলালের পিতা বাবুরামের জমিদারী অর্জন সম্পর্কে লেখক লিখেছেন "এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিত্রের তাদৃশ গৌরব হয় না।" বাবুরাম প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে—"বৈদ্যবাটির বাবুরামবাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন।" বাবু অর্থে তখনকার দিনে ইংরেজ নবীশদের যদিও বোঝাত এখানে লেখক জমিদার অর্থেই সম্ভবতঃ কথাটি ব্যবহার করেছেন। বাবু অর্থাৎ বড় মানুষ। জমিদার হয়ে যখন বাবুরামবাবু কার্য পরিচালনা করেন—তখন তাঁর দয়া মায়া বলে কিছু থাকেনা—নিজ স্বার্থ রক্ষাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে টেকচাঁদ লিখেছেন—"এক পাশে মুহুরী বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে—অনেকের দেনাপাওনা ডিক্রি ডিসমিস হইতেছে। বাঙ্গালী বড়মানুষ বাবুরা দেশসুদ্ধ লোকের জিনিস ধারে লন—টাকা দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে—বাক্সের ভিতর টাকা থাকে কিন্তু টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগম ও জমজমা হয়না। গরীব দুঃখী মহাজন বাঁচিল কি মরিল তাহাতে কিছু এসে যায় না কিন্তু এরূপ বড়মানুষী করিলে বাপপিতামহের নাম বজায় থাকে। অন্য কতকগুলাতো বড় মানুষ তাহাদের উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খ্যাঁড়।"

এরপর ২৫ সংখ্যক অধ্যায়ের আলোচনায় আসা যাক। বাবুরাম বাবুর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা—অর্থাৎ মতিলালই তখন জমিদারীর প্রকৃত মালিক। উচ্ছৃংখল প্রকৃতি ও ইংরেজ নবীশ মতিলালের শহুরে সাহেবীয়ানা বজায় রাখার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন—সেই উপলক্ষেই তার জমিদারীর তদারকী করতে আসা। এই ঘটনাটি অত্যন্ত বাস্তব এবং চিরকালীন সত্য—যে শহরমুখী জমিদাররা গ্রামের জমিদারীকে একমাত্র শোষণের বস্তু বলেই জানত। অথচ প্রজার সংগে তথা গ্রামের সংগে যেমন তাদের কোনও আত্মিক বন্ধন ছিলনা—তেমনি জমিদারীর কাজ-কর্মও তারা কিছু বুঝত না—সুতরাং সম্পূর্ণ ভাবে নায়েব গোমস্তার ওপরই তারা নির্ভর করত। তাঁদের এই ধরণের স্বার্থপরতা এবং ঔদাসীন্যের ফলেই যে ক্রমশঃ জমিদারশ্রেণী অত্যাচারী শোষক হিসাবে প্রজা সাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন সে কথা সহজেই অনুমেয় এবং যার অপরিহার্য পরিণাম জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন।

মতিলালের জমিদারী পরিচালনার দৃশ্য বর্ণনায়—শতাব্দীর অধিককাল পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা এক চিরকালীন বাস্তব সত্যেরই ইঙ্গিত দেয়—যার সঙ্গে পরবর্তী কালের সামন্ত শ্রেণী সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবাদ ও ধারণার কোনও বিরোধ দেখা যায়না। পক্ষান্তরে বলা যায় শ্রেষ্ঠ

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রও যে চিত্র অঙ্কন করতে উদ্যোগী হননি—নকসা রচনার মাধ্যমে প্যারীচাঁদ তার আগেই তার অর্থাৎ সামন্তশ্রেণীর শোষক রূপের বলিষ্ঠ রূপায়ণ করতে সাহসী হয়েছেন। এই দিক থেকে বলা যায়—প্যারীচাঁদ মিত্র অবশ্যই কালজয়ী সাহিত্যিক—কারণ নব্যবঙ্গের সমাজ বহুকাল পূর্বে শেষ হয়ে গেলেও সামন্ততন্ত্রের যে চেহারা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা আমাদের কাছে আজও সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়েনি। কারণ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরও ভূমিজীবী মানুষদের শোষণের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি। সাঙ্গপাঙ্গসহ মতিলালের যশোহর গমন প্রসঙ্গে লেখক টেকচাঁদ জমিদারী অর্জনের ইতিহাস বর্ণনা এবং সেই সংগে জমিদার প্রজার সম্পর্কের বিশদ চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই অংশটি কিছু কিছু প্রয়োজন বিশেষে উদ্ধৃত হল—

"বাবুরাম বাবুর সকল বিষয় অপেক্ষা যশোহরের তালুকখানি লাভের বিষয় ছিল।" কেন লাভের বিষয় ছিল এ সম্পর্কে লেখক যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা অবশ্যই ঐতিহাসিক সত্য। তিনি লিখেছেন—"দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে ঐ তালুকে অনেক পতিত জমি থাকে—তাহার জমা ডৌলে মুসমা[১] ছিল পরে ঐ সকল জমি হাঁসিল[২] হইয়া মাঠ হারে বিলি হয় ও ক্রমেই জমির এত গুমর হইয়াছিল যে প্রায় এক কাঠাও থাকার বা পতিত ছিল না, প্রজালোকও কিছু দিন চাষাবাদ করিয়া হরবিরু ফসলের দ্বারা বিলক্ষণ ক্ষেত্র করিয়াছিল কিন্তু অনেকের উপর পীড়ন হওয়াতে প্রজারা সিকস্ত হইয়া পড়িল—অনেক লাখেরাজদের জমি বাজেয়াপ্ত হওয়াতে ও তাঁহাদিগের সনদ না থাকাতে তাহারা কেবল আনাগোনা করিয়া ও নজর সেলামি দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিল ও অনেক গাঁতিদারও জাল ও জুলুমে ভাজাভাজা হইয়া বিনিমূল্যে আপন আপন জমির স্বত্বত্যাগ করত অন্য অন্য অধিকারে পলায়ন করিল। অল্পদিনের মধ্যেই অনেক প্রজা ভয়াক্রম হেলে-গোরু ও বীজধান লইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদিগের জমিবিলি করা ভার হইল, সকলেরই মনে এই ভয় হইতে লাগিল আমরা প্রাণপণ পরিশ্রমে চাষবাস করিব দুটাকা দুসিকা লাভ করিয়া যে একটু শাঁসাল হইবে—তাহাকেই জমিদার বল বা ছলক্রমে গ্রাস করিবেন তবে আমাদিগের এ অধিকারে থাকার কি প্রয়োজন? তালুকের নায়েব বাপু বাছা বলিয়াও প্রজালোককে থামাইতে পারিল না। অনেক জমি থাকিল—ঠিকে হারে বিলি হওয়া দূরে থাকুক কম দস্তুরেও কেহ লইতে চাহে না ও নিজ আবাদে খরচা বাদে খাজনা উঠান ভার হইল। নায়েব সর্বদাই

১। মুসমা—ছাড়
২। হাঁসিল—চাষ যোগ্য হওয়া—আবাদী

জমিদারকে এত্তেলা দিতেন, জমিদার সুদামত পাঠ লিখিতেন—গোমস্তা সুরত খাজনা আদায় না হইলে তোমার বুটি যাইবে—তোমার কোন ওজর শুনা যাইবেনা। সময় বিশেষ বিষয় বুঝিয়া ধমক দিলে কর্মে লাগে। যে স্থলে উৎপাত ধমকের অধীন নহে সে স্থলে ধমক কি কর্মে আসিতে পারে? নায়েব ফাপরে পড়িয়া গয়ং গচ্ছুরূপে আমতা আমতা করিয়া চলিতে লাগিল—এদিকে মহল দুই তিন বৎসর বাকি পড়াতে লাটবন্দি হইল সুতরাং বিষয় রক্ষার্থে গিরিবি লিখিয়া দিয়া বাবুরাম বাবু দেনা করিয়া সরকারের মালগুজারি দাখিল করিতেন।"

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে যে দশশালা বন্দোবস্তের কথা আছে সে সম্পর্কে বলা যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে প্রথমতঃ ৫ বৎসর ও পরে ১০ বৎসর মেয়াদে অস্থায়ী ভাবে ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন এবং ঐ দশশালা বন্দোবস্তের মেয়াদ অতিবাহিত না হতে ১৭৯৩ সালের ১নং রেগুলেশন দ্বারা ঐ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়।

এ বন্দোবস্তে প্রাপ্ত জমি পরে চাষযোগ্য হয়ে উঠলে বহু জমিদার তা থেকে প্রচুর লাভবান হতেন। বাবুরামের যশোহরে তালুক এই ভাবেই লাভজনক হয়ে উঠেছিল।

শহরমুখী জমিদাররা যে কেবলমাত্র উচ্ছৃংখল প্রকৃতি ছিলেন এবং গ্রামের সংগে সম্পর্কচ্যুত থাকার দরুন গ্রামের মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশূন্য ছিলেন তাই নয়—তাঁরা জমিদারী পরিচালনার কিছুই বোঝেন না—অথচ গ্রামের মানুষদের নানারকম নিপীড়ণ করে তাদের শোষণ করে নিজেদের আয়বৃদ্ধি করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এঁদের অত্যাচারই হয় বেশী তীব্র।

এই সম্পর্কে টেকচাঁদ লিখেছেন বাবু—[মতিলাল] জমিদারী কাগজ কখন দৃষ্টি করেন নাই, কাহাকে বলে চিঠা, কাহাকে বলে গোসোয়ারা, কাহাকে বলে জমাওয়াসিল বাকি কিছুই বোধ নাই। জমিদারী শরদ্ গাঁতি বা খোদকস্তা প্রজা, পাইকস্তা প্রজা এ সবের তিনি কিছুই বোঝেন না। কিন্তু প্রজারা জমিদারকে নিজেদের মধ্যে পেলে যে নিজেদের কত ভাগ্যবান মনে করে তার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—"বড়বাবু তিহির কাছারিতে আসিয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া যাবতীয় প্রজা একেবারে ধেয়ে আইল ও মনে করিল বদ্‌জাত নেড়ে বেটা গিয়াছে বুঝি এতদিনের পর আমাদিগের কপাল ফিরিল এই কারণে আহ্লাদিত চিত্তে ও সহাস্যবদনে বুক্ষচুলো শুখনোপেটা ও তলাখাঁক্তি প্রজারা নিকটে আসিয়া সেলামী দিয়া রবধান ও স্যালাম করিতে লাগিল। এবং বাবুকে খুশী দেখে প্রজারা তাদের যত রকম নালিশ আছে একে একে পেশ করে জমিদারের

কৃপাভিক্ষা করিতে লাগল। তাদের বিভিন্ন আবেদন সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—অমুকের হাঁস ধান খাইয়াছে—কেহ বলে, আমি আজ তিন বৎসর কবজ পাইনা—কেহ বলে আমি খতের টাকা আদায় করিয়াছি, আমার খত ফেরত দেও—কেহ বলে, আমি বাবলা গাছটি কেটে বিক্রি করিয়া ঘরখানি—আমাকে চোট মাফ করিতে হুকুম হউক—কেহ বলে আমার জমির খারিজ দাখিল হয় নাই আমি তার সেলামী দিতে পারিব না—কেহ বলে আমার জোতের জমি হাল জরিপে কম হইয়াছে—আমায় খাজনা মুসমা দেও, তা না হয় তো পরতাল করে দেখ—কিন্তু দুঃখের বিষয় জমিদারীতে অনভিজ্ঞ মতিলাল—এ সকল কথার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে না পেরে ঠাট্টা শুরু করে। ফলে, নায়েব এবং প্রজার অবস্থা কেমন বিভ্রান্ত হয়—সে সম্পর্কেও লেখক মন্তব্য করেছেন—নায়েব একেবারে কাষ্ঠ, প্রজারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। অবশ্য একথাও অত্যন্ত বাস্তব যে জমিদারের অযোগ্যতা এবং ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়েই গ্রামাঞ্চলে নায়েব সম্প্রদায় দুর্ধর্ষ অত্যাচারী হয়ে ওঠে—এবং তাদের অত্যাচারের কলঙ্কে জমিদারশ্রেণী চতুর্গুণ কলঙ্কিত হন। অথচ সে সংবাদও তাঁরা রাখেন না। এদিকে প্রজারাও ক্রমশঃ জমিদারের ন্যায় বিচার সম্পর্কে হতাশ হয়ে অবশেষে নিজেদের অদৃষ্টের হাতে সঁপে দেন। এই সম্পর্কে চমৎকার বাস্তবধর্মী চিত্র এঁকেছেন টেকচাঁদ তাঁর আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থে। নায়েব, জমিদার, প্রজা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণে লেখক যে সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা কেবল সমকালীন যুগের বিচারেই নয় চিরকালীন সত্যের মাপকাঠিতেও রসোত্তীর্ণ হয়েছে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞ মন্তব্যটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"যেখানে মনিব চৌকস সেখানে চাকরের কারিকুরি বড় চলে না। নায়েব মতিলালকে গোমূর্খ দেখিয়া নিজমূর্তি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে লাগিল অনেক মামলা উপস্থিত হইল, বাবু তাহার ভিতর কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিলেন না, নায়েব তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া আপন ইস্ট সিদ্ধ করিতে লাগিল আর প্রজারাও জানিল যে বাবুর সহিত দেখা করা কেবল অরণ্যে রোদন করা নায়েবই সর্বময় কর্তা।" বলা বাহুল্য নায়েব চরিত্র সম্পর্কে টেকচাঁদ যা লিখেছেন প্রায় শতাব্দীকাল পরে শরৎচন্দ্রের অভাগীর স্বর্গ গল্পেও অনুরূপ প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'হায়রে অনভিজ্ঞ! বাংলাদেশের জমিদার ও কর্মচারীকে সে চিনিত না।'

বাংলাদেশে নীলকর অত্যাচার সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মতবাদ আছে। এ সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন' গ্রন্থে প্রিন্স দ্বারকানাথের মতামতের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে নীলকর অত্যাচারকে

প্ররোচিত করার জন্য বাংলা দেশের জমিদাররা বহুলাংশে দায়ী ছিলেন, কারণ প্রজারা মজুরীর বিনিময়ে নীল চাষ করুক এ তাঁদের ইচ্ছা ছিল না—কারণ তাতে প্রজারা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে বাধ্য—ফলে জমিদারদের স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করে তোলেন—যাতে তারা দাদন নিয়ে নীল চাষ না করে। কিন্তু টেঁকচাঁদের মতানুসারে বলা যায়—"ধানের ক্ষেতে নীলের চাষ করার ফলে দেশীয় প্রজারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হত। কারণ তাতে ইংরেজদের লাভ ছিল। প্রজাদের ওপর তাদের জুলুমও ছিল অসহনীয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করে দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বছর বছর বৃদ্ধি হয় ও কুঠিয়ালের গোমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পূরে না।" এই জন্য যে প্রজা একবার নীলকরের দাদন নিত তার প্রাণান্ত হত অথচ নীলকরদের দাবী মেটানো সহজসাধ্য ছিল না। দ্বারকানাথ এ বিষয়ে যে মত পোষণ করেছেন—ঠিক তার বিপরীত ভাবে টেকচাঁদ বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—প্রজারা নায়েবের কাছে নীলকরদের বিভিন্ন অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে পেশ করলে জমিদারের লোকের সংগে কুঠিয়ালের লোকের মারামারি শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বলা বাহুল্য ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট ইংরেজ নীলকরের পক্ষই অবলম্বন করে। মামলা ডিসমিসের হুকুম হয়। তখনকার নায়েবদের মনোগত ভাব সম্পর্কে লেখক বলেছেন—'নায়েব বলিতে বলিতে চলিলেন—বাঙালীদের জমিদারী রাখা ভার হইল—নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল—প্রজারা ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে।' লেখকের মত এই যে "লোকে বলে জমিদারের দৌরাত্ম্যে প্রজার প্রাণ গেল—এটি বড় ভুল। জমিদারেরা জুলুম করে বটে কিন্তু প্রজাকে ওজনে বজায় রেখে করে। প্রজা জমিদারের বেগুণ ক্ষেত, নীলকর সে রকমে চলেনা—প্রজা মরুক বা বাঁচুক তাহাতে তাহার বড় এসে যায় না—নীলের চাষ বেড়ে গেলেই সব হইল—প্রজা নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত।"

অতএব নীলকর আর জমিদারের টানাপোড়েনে সে যুগের প্রজাসাধারণের জীবন যথার্থই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল এবং তারই চমৎকার বাস্তবধর্মী বর্ণনা দিয়েছেন প্যারীচাঁদ। প্রসঙ্গত ভারতের মুক্তি সন্ধানে গ্রন্থের লেখক শ্রীযোগেশ চন্দ্রর বাগলের একটি সুচিন্তিত মতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে—যেটি দ্বারকানাথ ও রামমোহনের মতবাদ থেকে পরবর্তীকালের লেখকদের মতামতের বিভিন্নতার মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল লিখেছেন—"নীল চাষ সম্বন্ধে, ১৮২৯ সালে রামমোহন

রায় বলেছিলেন যে এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু এরপর কুড়ি বছরের মধ্যেই নীলচাষীদের দুঃখ চরমে ওঠে। নীল চাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রুশিয়ার সার্ফ ও আমেরিকার নিগ্রো দাসদের সামিল হয়ে পড়েছিল। নীলকর কর্তৃক টাকা দাদন দিয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে চাষীকে প্ররোচনা—আশানুরূপ ফসল না হলে পর বছর নীল উৎপাদনে তাকে বাধ্য করান, নীল চাষের জন্য দশ বছরের চুক্তি পুরুষানুক্রমে নীলকরের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণতি, নীলকরদের জমিদারী তালুকদারী ক্রয়, প্রজাবৃন্দের দ্বারা বেগার খাটান, চুক্তিভঙ্গকারী চাষীদের নীলকুঠিতে কয়েদ রাখা প্রভৃতি যত রকম—অত্যাচার উৎপীড়ণ হতে পারে নীলকররা নির্বিঘ্নে নীল চাষীদের উপর তা সবই করতে লাগল।

এই নীলচাষীদের পরমবন্ধু, ও প্রত্যক্ষদর্শী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর মতটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ঃ—

"আমি নীলহাঙ্গামার বিষয় বিশেষ যত্নসহকারে পর্যালোচনা করিয়াছি। ইহার ফলে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বর্তমান নীলচাষ রায়তদের পক্ষে সর্বপ্রকারেই অহিতকারী।" শুধু নীলকর অত্যাচার নয় প্রজাদের জীবনে সুখ কখনও নেই। রাজার প্রজাদের অবস্থার বিবরণ দিয়ে তিনি (প্যারীচাঁদ) লিখেছেন "মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমিতে ধানকাটা চলেছে। কিন্তু প্রজার নিস্তার নাই। এদিকে মহাজন ওদিকে জমিদারের পাইক। যদি বিক্রি ভালো হয় তবে তাহাদিগের দুই বেলা দুই দুই মুঠা আহার চলিতে পারে নতুবা মাছটা শাকটা ও জনখাটা ভরসা। বঙ্গদেশে ধান্য অনায়াসে উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু হাজা শুকা পোকা, কাঁকড়া ও কার্তিকে ঝড়ে ফসলের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়।"

বিভিন্ন ধরনের শাসনের ও শোষণের ফলে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলা দেশের প্রজারা যে চিরকাল দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে আসছে তা কেবল প্যারীচাঁদ নন তারও বহু আগে মুকুন্দরামও তার বিবরণ দিয়ে গেছেন চণ্ডীমঙ্গলে। হাজা, শুকা বান যাই হোক না কেন সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ঠিকই থাকে, তাই তো মুকুন্দরাম দেখিয়েছেন কলিঙ্গরাজ্য প্লাবনে ভেসে গেল প্রজাদের প্রথমেই ভাবনা হয়েছে—রাজার খাজনা কিসে পরিশোধ হবে। গুজরাট নগর পরিকল্পনায় কবি তাই এক শোষণমুক্ত শাসন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন সে প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম পর্বে আলোচিত হয়েছে।

আধুনিক কালের লেখকরা দেখিয়েছেন একদিকে সামন্ততন্ত্র আর একদিকে বণিকতন্ত্রের চাপে প্রজাদের কি দুঃসহ অবস্থা। এখানে প্যারীচাঁদ মিত্র—তদানীন্তন জমিদার ও নীলকবের যৌথ অত্যাচারে প্রজাদের অসহনীয় অবস্থার

চিত্র এঁকেছেন। এই নীলকরদের অত্যাচারকে তথাকথিত ব্যবসায়ী তথা বণিক-তন্ত্রের পূর্বসূচনা বলা যেতে পারে।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নীলদর্পণে যে নীলকর অত্যাচারের চিত্র এঁকেছেন তা নিতান্তই এক পাক্ষিক—জমিদার ও প্রজা সেখানে সমান অংশীদার—পরস্পর পরস্পরের দুঃখের শরিক। কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রজাকে কেন্দ্র করে নীলকর ও জমিদারের মধ্যে যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল—তার রসোজ্জ্বল এবং স্পষ্ট বাস্তবচিত্র রচনা করেছেন। এদিক থেকে প্যারীচাঁদের বাস্তববুদ্ধি অবশ্যই প্রশংসার্হ। এছাড়াও কৃষাণদের দিয়ে বেগার খাটানো ইত্যাদির উল্লেখও এতে আছে—যা সামন্ত শাসনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল এবং জমিদার ও নীলকরদের জব্দ করার জন্য প্রজাদের জল্পনা ও কল্পনাও সামন্তবিরোধী মনোভাবকেই সূচিত করে।

এই শতকের অপরাপর লেখকগণের মধ্যে বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁর স্রষ্টা মধুসূদনের নামোল্লেখ করা যায়। মধুসূদন লম্পট নারীমাংসলোলুপ অধর্মচারী হিন্দু জমিদার বৃদ্ধ, ভক্ত দাসকে যেভাবে গঠন করেছেন পরবর্ত্তীকালের মীর-মশারফের জমিদার দর্পণ নাটকে অনুরূপ প্রকৃতির মুসলমান জমিদার চরিত্র আমরা দেখতে পাই। এদিক থেকে অত্যাচারী জমিদার হিসাবে হিন্দু মুসলমান সকলের চরিত্রই যে এক সে বিষয়ে ভুল হয় না। ভক্ত দাসও মোসাহেব পরিবৃত থাকেন। তারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য গ্রাম্য কুট্নী পুঁটি মুসলমান প্রজার বিবি ফতেমাকে ভুলিয়ে আনতে নিযুক্ত হয়। সেদিক থেকেও বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁর সঙ্গে—বিষয়গত মিল পাওয়া যাবে মীরমশারফের জমিদার দর্পণের। বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই তা স্পষ্ট অনুমিত হবে। ভক্ত—"আহা। এমন খোস চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরানী হলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়…"

…পুঁটি ও ফতেমার কথোপকথন অংশ—"ফতেমা—পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।"

পুঁটি—আ মর ..বাবু এত করে বলচে তবু কি তোর আর মন ওঠেনা। কর্ত্তা-বাবুকে পেলে কত বামুন কায়েতে বত্তে যায়, তা তুই নেড়ে বৈত নস্ বরং ভাগ্যি করে মান যে বাবুর চোখে পড়েছিস্।

জমিদারের নেক নজরে পড়লে যেমন প্রজার ভাগ্য হাসে আবার বিরূপ হলে তাকে উচ্ছেদ করে ছাড়েন তিনি। অবশ্য এই প্রহসনে শেষ পর্যন্ত মুসলমান প্রজা হানিফের বুদ্ধি কৌশলে জাত ধর্ম রক্ষার ভয়ে জমিদার নিজেকে সংশোধন করে-ছিলেন দেখানো হয়েছে। খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারের পীড়ণের চেহারা

বর্ণিত হয়েছে—হানিফ ও ভক্ত দাসের কথাবার্তায়। "ভক্ত বলে—তোদের ফসল হোক্ আর না হোক তাতে আমার কি বয়ে গেল।

তার উত্তরে—হানিফ বলে—আগ্যে আপনি হচ্ছেন কর্ত্তা।

ভক্ত—মর্ বেটা কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল খাজনা দিবি কিনা।" বলা বাহুল্য কোম্পানীর আমলের জমিদারের অবস্থারও ইঙ্গিত আছে এতে এবং এই খাজনা আদায়ের ছলেই হানিফের সুন্দরী বিবি ফতেমার প্রতি জমিদারের দৃষ্টি পড়ে। তার ফলাফল—মধুসুদন কিভাবে প্রহসন আকারে দেখিয়েছেন সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ রচনারও পূর্বে'কার একটি রচনার উল্লেখ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে। গ্রন্থটির নাম "বাপরে বাপ। নীলকরের কি অত্যাচার।' এই অখ্যাতনামা গ্রন্থটি সম্পর্কে ডঃ সেন বলেছেন এটি লণ্ডন কমনওয়েলথ্ লাইব্রেরীতে আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ষোলপৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে পাবনা জেলার গোলোকপুর গ্রামের জমিদার সম্পর্কে বলা হয়েছে—''শিবতুল্য মনুষ্য, প্রজার প্রতি কোন অত্যাচার নাই। তিনি কলিকাতাবাসী সরল লোক কাহার ভালোতেও নাই মন্দতেও নাই।" অর্থাৎ ভালো জমিদার চরিত্রের মাপকাঠি ছিল এই। নীলকররা একদিকে প্রজাদের উপর অত্যাচার করে আর একদিকে জমিদারশ্রেণীর সংগে ভাব করে কি ভাবে কায়েমী বন্দোবস্ত অর্থাৎ নীলকরের সুবিধা করে নিয়েছে—সে কথার উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে। বঙ্গদেশের দীনহীন প্রজাপুঞ্জের জন্য লেখকের পাঠকবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা যেমন আছে সেই সঙ্গে ব্ল্যাক এ্যাকট জারী হওয়ার কথা আছে। এই ব্ল্যাক এ্যাকটকে ( ১৮৪৯ ) কেন্দ্র করে সে যুগের বাঙালিরা অনেকেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কারণ উক্ত আইনে য়ূরোপীয় প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। ভারতীয় প্রজারা এতে উপকৃত হয়নি। কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকসাতেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার সৃষ্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ আছে। হুতোম প্যাঁচার নকসা থেকে এই প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃত করা যাক।

"নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালে মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো, বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছিন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবোমুনসী, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি রাজা হল। "সেপাই পাহারা আটা সোটা" ও 'রাজা খেতাপ" ইণ্ডিয়া রবারের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ানির মত রাস্তায় পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন

"যেতে লাগলো .....টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন।" অর্থাৎ প্রাচীন বনেদী জমিদার বংশের পরিবর্ত্তে যে নতুন বেনিয়া জমিদার শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে—এতে তার প্রতিই কটাক্ষ করা হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ ছাড়াও বিয়েপাগলা বুড়োতে গ্রাম্য জমিদারের বিলাস বাহুল্য এবং চারিত্রিক দৌর্বল্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক প্রফুল্লর ভজহরি চরিত্রটিতে জমিদারী অত্যাচারের শোচনীয় ট্র্যাজিডি দেখানো হয়েছে। জমিদারের অত্যাচারেই ভজহরির পিতা প্রাণ হারাল। ভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভজহরির মা পথে পড়ে মারা যায়, সেই থেকে ভজহরি পরাশ্রিত। জমিদারের চরিত্রাভিনয় তাই সে যত সহজে বাস্তবানুগ করে তুলতে পারে এমন আর কেউ নয়। কারণ এ ছিল তার জীবন লব্ধ অভিজ্ঞতা। রসরাজ অমৃতলাল তাঁর রাজাবাহাদুর নামক ক্ষুদ্রাকৃতি নাটকে রাজউপাধি লোলুপ জমিদারের চরিত্রটি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।

# বঙ্কিমচন্দ্র

বিদ্যাসাগর পর্যায়ে—গোপাল হালদারের একটি মন্তব্য যে বঙ্কিম জমিদারী প্রথা বা প্রজা-আন্দোলন নিয়ে মাথা ঘামান নি——তার কারণ তাঁর সাহস ও পৌরুষের অভাব—একথার সঙ্গে আমরা ঠিক একমত হতে পারিনা।

পারিনা এই কারণে—জমিদারী প্রথা ও জমিদার চরিত্র বঙ্কিম সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক জায়গাতেই আমরা বলেছি যে জমিদারীপ্রথা নানাভাবে সাহিত্যিক মানসে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কোথাও জমিদার প্রজা সংঘর্ষ কোথাও শুধুই প্রজার দুঃখ বেদনা আবার কোথাও জমিদার বংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তার উত্থান পতন।

বঙ্কিম ধনী জমিদার, রাজা মহারাজাকে তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন—সাধারণ মানুষের কথা লেখেননি—ঔপন্যাসিক হিসাবে এ বিষয়টি বঙ্কিমের ত্রুটি বলে মনে করলেও সামন্ততন্ত্রের সেকাল একালের বিচারে এই জমিদার প্রাধান্যের আলাদা গুরুত্ব আছে। আমরা সেই আলোকেই বঙ্কিমকে বিচার করব।

বঙ্কিম সাহিত্যে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব দ্বৈতভাবে কার্যকরী হয়েছে –

১। প্রত্যক্ষভাবে জমিদারী প্রথা ও জমিদার চরিত্রের সমালোচনা

২। উপন্যাসে জমিদার চরিত্র সৃষ্টি।

মনে রাখতে হবে ইংরেজদের ভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন বঙ্কিমের আমলেই তৈরী হয়ে গেছে। অতএব বঙ্কিম তাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল সম্পর্কে তিনি যেমন বহু আলোচনা করেছেন অন্যদিকে জমিদারের আয়ু ও শক্তিবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রজা সাধারণের যে দুরবস্থা দেখা দিয়েছে তারও নজির তুলে ধরেছেন এবং সেই সংগে নিজেও বিরুদ্ধ সমালোচনার শিকার হয়েছেন।

এই ভাবে পক্ষীয় বিপক্ষীয় মতামতের দ্বারা সমকালীন বাংলাদেশের জমিদারী প্রথার একটি চিত্ররূপ সে যুগের বিভিন্ন লেখকের রচনা-মাধ্যমে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

মোগল আমল ও তারও আগে বাংলাদেশে জমিদারদের অবস্থা ও গুরুত্ব কতখানি কি ছিল ইংরেজ আমলের সঙ্গে তার তুলনাও সে আলোচনায় বাদ যায়নি।

বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত কতকগুলি প্রবন্ধ নিবন্ধে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। তবে সেই আলোচনার আগে জমিদারী প্রথার বিবর্তন সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল হতে হয়।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নতুন করে জমিদারশ্রেণী তৈরী করা হল এবং তাদেরই চাষের মালিক করা হল। উদ্দেশ্য চাষের মালিক স্বয়ং জমিদার হলে জমির উন্নতির প্রতি তিনি মনোযোগী হবেন। ইতিপূর্বে জমিদার বলতে যাঁদের বোঝাত তাঁদের সঙ্গে জমির যোগ নাকি খুব কমই ছিল। ফলে প্রকৃত মালিক খুঁজতে গিয়ে নতুনতর সমস্যার সৃষ্টি হল। যাঁদের জমিদার করা হল তাঁদের অনেকেই প্রকৃত জমিদার নন—তাঁদের কর্মচারী মাত্র ফলে ফিউডাল তথা সামন্তদের স্থান দখল করল আমলাতন্ত্র এবং এরাও পরে কুক্ষিগত হয়ে পড়ল বণিকতন্ত্র বা পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে।

যাই হোক মোট কথা ইংরেজ আমলে প্রাচীন জমিদারের জায়গায় যে উদীয়মান জমিদার শ্রেণী দেখা দিল—বঙ্কিমের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল তারাই।

বঙ্কিম যদিও স্বীকার করেছেন যে সকল জমিদারই অত্যাচারী ছিলেন না বরং মহাত্মা ছিলেন—তথাপি এক বিশেষ অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর শোষণের রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বঙ্গদেশের কৃষক এবং বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবন্ধ নিবন্ধে। ১৮৭২—১৮৯২ বিবিধ প্রবন্ধের অধিকাংশ রচনার কাল। ১৭৯৩ এর পর ১৮৮৫ সালে টেনেন্সি বিল পাশ হয় এবং সেই বছরটি বিবিধ প্রবন্ধের রচনাকালের মধ্যেই পড়ে।

একদিকে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণের সমাজসংস্কার চেষ্টা যেমন বঙ্কিম সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে অন্যদিকে ভূমিসংক্রান্ত নানাবিধ আইন ও সংস্কার বঙ্কিমসাহিত্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং টেনেন্সি বিল সম্পর্কে ইতিপূর্বে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিগণও নানান সমালোচনা মূলক রচনা প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের "বঙ্গদেশের কৃষক"-কে জমিদারী ব্যবস্থার বিশদ সমালোচনা বলা যায়। এই প্রবন্ধটি পঁচিশবছর পর পুনর্মুদ্রিত হয়- সেই সময়কার ভূমিকায় বঙ্কিম লিখেছেন—জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে প্রজাই অত্যাচারী জমিদার দুর্বল।" চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির আয়বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু প্রজাদের উন্নতি নাই এই কথাই বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বঙ্কিম বার বার উল্লেখ করেছেন, অথচ জমিতে প্রজাদের অধিকার ছিল না যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিতে প্রজার অধিকার

আইনতঃ স্বীকৃত হয়েছে। টেনেন্সি এ্যাক্টেও সেই অধিকারের ফাঁকা আওয়াজ অথচ কার্যতঃ প্রজাদের অবস্থা যেই তিমিরে সেই তিমিরে। জমিদারীর মুনাফা জমিদার তো ভোগ করেই কিন্তু সেই সংগে জমিদারের নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরী, পাইক সকলেই লভ্যাংশের অংশভাগী। অবশ্য জমিদারের প্রশ্রয় আছে বলেই এত ক্ষমতা। অনেক সময় খোদ জমিদার অপেক্ষা গোমস্তার ক্ষমতা ও অত্যাচার আরও ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রজার বকেয়া খাজনাকে সে চতুর্গুণ বাড়িয়ে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে অথচ নিরুপায় প্রজা জমিদারের আদালতে সুবিচার পায় না। কারণ জমিদারের দোষেই এদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। এদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা এরা এই ভাবেই পূরণ করে এবং তার জন্য দায়ী আসলে জমিদার কারণ তিনি তাদের উপযুক্ত বেতন দেন না। বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বর্ণিত পরাণমণ্ডল শোষিত প্রজার প্রতীক। আর গোমস্তা নায়েব, জমিদারের অধঃস্তন শোষকশ্রেণী। ১৭৯৯এ হফ্‌তম্ এবং ১৮১৩ সালের পঞ্চম এই হফ্‌তপঞ্চম রেগুলেশনে প্রজার ফসল ও অস্থাবর ক্রোক করার ক্ষমতা জমিদারের হয়।

প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ জমিদারী ব্যবস্থাটাকেই সমালোচনা করেছেন কিন্তু কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নহে বরং একথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে সকল জমিদারই মন্দ নয়। অনেক সহৃদয় জমিদারও আছেন। তবে, মহাজন, গোমস্তারাই বেশী অত্যাচারী এবং তাদের কলঙ্কই জমিদার শ্রেণীকে অধিক কলঙ্কিত করেছে।

তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে বাংলাদেশে যে তখন সম্পূর্ণ ভূমিতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল এবং জমিদারই ছিলেন সমাজের চূড়া স্বরূপ। অতএব তাঁদের ভাল-মন্দের উপর প্রজাদের অবস্থা বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। বঙ্কিম সেই আলোকেই জমিদারী প্রথার আলোচনা করেছেন।

অপর দিকে উপন্যাসগুলিতেও একদিকে যেমন বিভিন্ন জমিদার চরিত্র তার শোষণের রূপে ধরা দিয়েছে—আবার বহু সহৃদয় জমিদার—চরিত্রকে তিনি নায়ক করেছেন তাঁর উপন্যাসের।

তবে একথা নিশ্চয়ই ঠিক সামন্ততন্ত্রের কাঠামো এবং সেই সঙ্গে ইংরেজের ভূমিসংক্রান্ত আইন ও সরকারের তাঁবেতে জমিদারী মনোভাবের প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা সম্ভবতঃ বঙ্কিমই সর্বপ্রথম করেছেন। অথচ তাঁর বহু পরে শরৎচন্দ্র তারাশঙ্করের মত গণদরদী মানুষের রচনাতেও জমিদারী প্রথার মূল কাঠামোর সমালোচনা হয়নি। তাঁরা জমিদারের প্রজাশোষণের ব্যাপারকে তীব্র নিন্দা

করেছেন—ফলে জমিদার যেখানে মহৎ হৃদয় সেখানে সমালোচনার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। অর্থাৎ অত্যাচারী জমিদার মাত্রেই তাঁদের কাছে ছিল নিন্দিত। কিন্তু সমগ্র জমিদারী ব্যবস্থাটাই যে ছিল শোষণের ভিত্তিতে গঠিত, জমিদারের জমিদারীর আয়ের সবটুকুই যে প্রজাশোষণের পরোক্ষ ফল সে সম্পর্কে খুব কমই প্রশ্ন তুলেছেন। তার তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিবিশেষে জমিদারের সদগুণ স্বীকার করলেও সমগ্র জমিদারী ব্যবস্থাটাকেই তিনি প্রবল অসাম্যবাদ এবং প্রজাশোষণের উপায় রূপে চিহ্নিত করেছেন। ভূস্বামীরাই আবার সরকারের আনুকূল্যে 'রাজা' খেতাব লাভ করে সকলের উপর প্রবলতাপ বিস্তার করতেন। সাম্য প্রবন্ধে, তথাকথিত জমিদার শ্রেণীকে সম্বোধন করেই বঙ্কিম লিখেছেন—

"তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ সে তোমাদের কোনও গুণে নহে। অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে—সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার নীচ কুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না। মনে থাকে যেন সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণমণ্ডলও তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা।"

বঙ্কিমের মতে বঙ্গদেশের কৃষকদের দুর্দশার মূল কারণই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তবে তার মধ্যে একটি গভীর কথা আছে। বিবিধ প্রবন্ধের এক জায়গায় বঙ্কিম লিখেছেন, "কতকগুলি জমিদার অত্যাচারী। তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য একথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমিদার বলিয়াছি বা বলিব সেইখানে ঐ অত্যাচারী জমিদারগুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় জমিদার সম্প্রদায় বুঝিবেন না।"

এই অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভবের মূল কি সে বিষয়ে পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। এই শ্রেণীর জমিদাররা কেউই প্রকৃত জমিদার নয়—এঁরা অধিকাংশই এককালে সরকারের নিযুক্ত ইজারা দার বা খাজনা আদায়কারী কর্মচারী ছিলেন।

প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে জমির প্রকৃত মালিক ছিলেন গ্রাম্য কৃষক গোষ্ঠী। গ্রাম্য-প্রধানদের অধীনে তারা জমিজমা চাষ বাস করত ও বংশ পরম্পরায় তা ভোগ করত। মুসলমান আমলেও গ্রাম্যকৃষক ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির মধ্যবর্তী জমির স্বত্বাধিকারী কোনও জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না তবে তখন যারা জমিদার অথবা জায়গীরদার বলে অভিহিত তারা মোগল সম্রাটের কর আদায়ের কর্মচারী

মাত্র ছিল। মুকুন্দরাম যে ডিহিদারদের অত্যাচারে তাঁর পূর্বপুরুষের ভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি এই নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী। এবং তিনি ছিলেন মুসলমান।

সরকার নিযুক্ত বেতনভোগী খাজনা আদায়কারী কর্মচারীরা যারা জায়গীরদার বা জমিদার নামে পরিচিত তাদের অনেকে বংশানুক্রমে জায়গীর অথবা জমিদারীর কাজ করে গ্রাম্য সমাজে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইংরেজ আমলেই প্রথম ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস করে অর্থনৈতিক শোষণের পরিবেশে ভারতে নূতম ভূস্বামী ও বণিক শ্রেণী এবং তাদের অন্তর্গত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের আবির্ভাব হয়েছিল। এবং সেই সঙ্গে নগর সভ্যতার পত্তনের ফলে জমিদার জীবন ক্রমশঃ গ্রামজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই ইংরেজ আমলের জমিদারের রূপই ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রাম জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার দরুন এবং জমির আয়বৃদ্ধির ফলেই এই অবস্থার উৎপত্তি। আয়বৃদ্ধির ফলে অর্থের সচ্ছলতার দরুন নৈতিক অধঃপতন দেখা দিয়েছে। এর কারণ জমিদার স্বয়ং। জমির প্রতি তাঁদের টান কম। তাঁদের অনুপস্থিতির সুযোগে অধীনস্থ কর্মচারীরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করে বেশ দু'পয়সা কমিয়ে নেন—অথচ জমিদার প্রজাদের প্রতি কোনও সহানুভূতি বোধ করেন না। বিলাস প্রমোদে গা ভাসিয়ে এই জমিদার গোষ্ঠীরা অধঃপতনের পথে তলিয়ে যায়।

বঙ্কিম তাঁর বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে সে কথাই উচ্চারণ করেছেন যে "ব্রিটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতিবারে দুর্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান জমিদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমিদার প্রজাপীড়ণ না করিবেন কেন?"

অতএব আইনের মধেই যে শোষণের ইঙ্গিত আছে বঙ্কিম অকুণ্ঠ ভাষায় তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং যাঁরা দেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে জমিদার তন্ত্রের সমর্থন করেন—তাঁদের ভ্রান্তধারণা দূর করে বলেছেন—"আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই যে জমিদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে—তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন? যে ধন এখন জমিদারদিগের হাতে আছে সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত কোথায় যাইত?"

বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'জমীদার'। এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের জমিদারীতন্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রাচীন হিন্দু রাজ্যে জমিদার ছিল না। ছিল রাজা ও প্রজা। মুসলমান আমলে নবাব বাদশাহরা পরগণায় পরগণায় কর সংগ্রহের জন্য কণ্ট্রাকটার নিযুক্ত করলেন। বেশী আদায় করতে পারলে তাদের লাভ। এর থেকেই জমিদারীর সৃষ্টি। এবং সেই সঙ্গে প্রজাপীড়নেরও। এই কণ্ট্রাকটাররাই পরে হন জমিদার।

এরপর ইংরেজ আমলে জমিদারদের শক্তিবৃদ্ধি করে জমিতে তাদের স্থায়িত্ব দিয়ে প্রজাপীড়নের পথ আরও প্রশস্ত হল। মোগল আমলে যারা ছিল কর-সংগ্রাহক তারাই হলো জমিদার। প্রকৃত ভূস্বামীর নিকট থেকে জমিদারী কেড়ে নিয়ে সরকারী তহশীলদারদের নূতন ভূস্বামী করা হল। বলা বাহুল্য এই নূতন ভূস্বামীদের মধ্যে সত্যিকারের আভিজাত্য ও বংশমর্যাদা অনেকেরই ছিল না। বঙ্কিমের মতে ইংরাজদের কলঙ্ক চিরস্থায়ী কেননা এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী। ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা করে বহু ব্যবসায়ী সুবিধাবাদী ব্যক্তিও সে সময় রাজা জমিদার খেতাব লাভ করেন। এই ভাবে প্রাচীন Feudal Lords বা সামন্ত প্রভুদের স্থান কি করে বুর্জোয়া তথা ধণিক ও বণিক শ্রেণী অধিকার করে নিল এবং আমলাতন্ত্র ও বণিক তন্ত্রই ক্রমে নব্য সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করল তারই একটি স্পষ্ট চিত্র এঁকেছেন বঙ্কিম। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিম যে সামন্তশ্রেণীর প্রাধান্য দেখিয়েছেন তাঁরা স্বয়ং জমিদার অথবা জমিদার বংশীয়, যেমন কৃষ্ণকান্ত, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, দেবেন্দ্র, হরলাল, হরবল্লভ প্রভৃতি। একদিকে জমিদারের ঐশ্বর্যবহুলজীবন, সম্পত্তি ঘটিত লড়াই, দান ধ্যান বদান্যতার কথাও বঙ্কিম বলেছেন—অন্যদিকে চরিত্রহীনতা, নারী ও মদ্যপানাসক্তির—প্রজা-শ্রেণীর উপর জমিদার ও তার কর্মচারীদের অত্যাচার ইত্যাদি চিত্রও বঙ্কিম প্রাসঙ্গিকভাবে দেখাতে ভোলেন নি।

তাই বিষবৃক্ষে জমিদার নগেন্দ্রনাথের পাশাপাশি তারই জ্ঞাতিভাই অপর জমিদার দেবেন্দ্রকে তিনি এঁকেছেন, এঁকেছেন গোবিন্দলালের পাশে হরলালকে।

বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাস। জমিদারও সমাজের কেবল অংশ মাত্র নন সমাজের চূড়া স্বরূপ। হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণ কান্ত রায় ও তাঁর পারিবারিক তথা সম্পত্তি ঘটিত বিসম্বাদকে কেন্দ্র করেই এই কাহিনীর সূচনা।

কৃষ্ণকান্তের কাছারির বর্ণনায় জমিদারীর কার্য পরিচালনার একটি সুষ্ঠু চিত্র আছে।

একপাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা খতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল,

থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়, আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন মহুরি, তহশীলদার, আমীন পাইক, প্রজা।

দেবীচৌধুরাণীতে 'চৌধুরাণী' খেতাব সম্পর্কে বঙ্কিম বিজ্ঞাপনে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে—Her title chaudhurani would imply that she was a Zamindar, probably a petty one."

এবং বরেন্দ্র ভূমের চৌধুরী খেতাব ধারী গ্রামের প্রধানদের এবং হস্তি অশ্ব ইত্যাদি চতুরঙ্গ সৈন্যদলের অধিপতিদেরই চৌধুরী খেতাব ছিল। জমিদারদের এই ডাকাতি বর্ণনায় পরবর্তীকালের প্রমথনাথ বিশীর জোড়াসাঁকোর চৌধুরী পরিবার উপন্যাসের সূচনা দেখা যায়। প্রমথনাথ বিশীর জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার উপন্যাসটি তারই বিস্তৃত রূপ।

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে গ্রামের এক চরিত্রহীন জমিদার পরাণ চৌধুরী ও তার ততোধিক দুষ্কৃতকারী গোমস্তা দুলর্ভ চক্রবর্তীর কথা আছে। অসহায়া অনাথা যুবতী প্রফুল্লকে নাপতানী ফুলমণির সহায়তায় এই জমিদার ও গোমস্তা কিভাবে অপহরণ করার চেষ্টা করে তার বিবরণে অত্যাচারী জমিদার গোমস্তার চরিত্রই প্রকাশিত।

দেবী চৌধুরাণী কাহিনীর পটভূমিকায় যে ঐতিহাসিক বিবরণ বঙ্কিম দিয়েছেন সামন্ততন্ত্রের বিবর্তনে তার যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল। বঙ্কিম লিখেছেন—

"মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে—ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র তাতে আবার বছর কত হইল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা।"

ইতিহাসের দেবী সিংহের অত্যাচারের কাহিনী সুবিদিত। জমিদারদের নিকট থেকে প্রাপ্য রাজস্ব সংগ্রহের জন্যই দেবী সিংহ ইজারাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অত্যাচারে বহু জমিদারের তালুকমুলুক নিলামে ওঠে।

দেবীচৌধুরাণীতে হরবল্লভ সেই অত্যাচারিত অথচ প্রবল প্রতাপশালী জমিদার শ্রেণীর প্রতীক। জমিদার হরবল্লভের দশহাজার টাকা মূল্যের তালুকখানা আড়াইশত টাকায় দেবী সিংহ খাজনার দায়ে কিনে নিল। অথচ বনেদী জমিদার বংশের বাহ্যিক চাল ছাড়া যায় না। লক্ষ্মী গেলেও ঠাঁট রাখতে হয়। এই সম্পর্কে বঙ্কিম লিখেছেন "যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন হয় সাবেক চাল ছাড়—নয় আমায় ছাড়। অনেকেই উত্তর দেন মা তোমায় ছাড়িলাম—চাল ছাড়িতে পারি না। হরবল্লভ তাহারই একজন। দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়াকর্ম দান ধ্যান, লাঠালাঠি পূর্বমতই হইতে লাগিল। খরচ আর কুলায় না। কিস্তি কিস্তি সরকারী খাজনা বাকী পড়িতে লাগিল।'

জমিদারের এই অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক ঠাটের এক মর্মস্পর্শী চিত্র রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন নয়ন জোড়ের বাবুদের চরিত্রে—তারাশঙ্কর জলশাঘরের কিংবা সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার চরিত্রে। সে সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

তার আগে জমিদার, ইজারাদার ও সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে, ধারণা স্পষ্ট করা যাক। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের আগে বিদ্যাসাগরই সম্ভবতঃ প্রথম এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন—যে প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র হরবল্লভ চরিত্রাঙ্কনে সম্ভবতঃ সেই সময়কারই একটি জমিদারী চিত্ররূপ তুলে ধরেছেন। হরবল্লভ, সেই ধরনের দেউলিয়া জমিদার। খাজনা বাকী পড়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরওয়ানা পর্যন্ত বেরিয়েছিল। পিতার মুক্তির জন্য সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ব্রজেশ্বর শ্বশুরালয়ে গমন করে সেখানেই সাগর বৌয়ের সূত্রে দেবীরানীর সঙ্গে পরিচয় পুনর্মিলন ইত্যাদি ঘটনার সূত্রপাত। অতএব সমগ্র দেবীচৌধুরানী উপন্যাসটির মূল ঘটনাবহুল রোমান্টিকতা ও তাত্ত্বিকতা সত্ত্বেও যে এই জমিদারী প্রথার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণের পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটেছে সে কথা অস্বীকার করা যায় কি?

ভবানীপাঠকের মুখ দিয়ে ভূম্যধিকারী ও ইজারাদারদের দুর্বিষহ অত্যাচারের বর্ণনা বঙ্কিম করেছেন। লুঠতরাজ নারী নির্যাতন শিশুহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ম নষ্ট, মানুষের উপর পাশবিক অত্যাচার ইত্যাদির যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন—তা নিতান্ত বাস্তব। এই ইজারাদার শ্রেণী যখন পরবর্তীকালে জমিদারে পরিণত হয়েছে তখনও সেই অত্যাচারী মনোবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় থেকেছে।

আমরা জানি, হরবল্লভের অযোগ্যতার ফলে বহু জমিদারী বেহাত হয়েছিল কিন্তু প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার ফলে পরে নতুন তালুক লাভ হল এবং জমিদারের প্রচুর আয়বৃদ্ধি হল অর্থাৎ হরবল্লভের পর ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের প্রেরণায় একজন আদর্শ জমিদার হয়ে উঠেছিলেন বোঝা যায়।

দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে সর্বদাই উপলব্ধি করা যায় মোগল শাসনের অবসান ও ইংরেজ যুগের সূচনায় সামন্তদের স্বরূপ ও অবস্থা। ব্যক্তিগত ভাবে জমিদার চরিত্রের ভালমন্দ ও তাদের পারিবারিক জীবনের ঐশ্বর্য বিলাস কিংবা সমস্যা কি কি ছিল।

জমিদার পরাণ চৌধুরী ও দুর্লভ গোমস্তার চরিত্রের দুর্নীতিপরায়ণতা লক্ষ্য করা যায় বিষবৃক্ষের প্রতিনায়ক দেবেন্দ্র চরিত্রে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ মহাধনশালী জমিদার হয়েও সদাশয় ছিলেন। বনেদী জমিদারবাটির বিশদ বর্ণনা বঙ্কিম দিয়েছেন। জমিদারের ঐশ্বর্যের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তার সাবেকি চালেরও চিত্র তিনি তুলে

ধরেছেন। এই বর্ণনা পরবর্তীকালের বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলামের বড় বাড়ীরই যেন এক প্রথম সংস্করণ। নগেন্দ্র নাথের বাড়ীর বর্ণনার সঙ্গে বঙ্কিম বর্ণনা দিয়েছেন কাছারি বাড়ী, পূজাবাড়ী, ঠাকুর বাড়ী, নাটমন্দির, পাকশালা—অতিথিশালা, হাতিশালা, গোশালা, চিড়িয়াখানা। তিন মহলা সদর ও তিনমহলা অন্দরের চমৎকার চিত্র যেমন দিয়েছেন সেই সঙ্গে জমিদার পরিবারের উপর নির্ভরশীল বৃহৎ পোষ্যবর্গের সরস বর্ণনা দিয়ে বঙ্কিম বলেছেন "নানাবিধ কুটুম্বিণীতে কাক সমীকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রিদিবা কলকল করিত।" সদাশয়, অতিথি বৎসর জমিদারদের সংসারেই এই প্রকার আশ্রিতের বাহুল্য দেখা দিত ফলে খরচও ছিল প্রচুর।

পূর্বেই বলা হয়েছে নগেন্দ্রনাথের পাশাপাশি অপর একটি চরিত্র দেবেন্দ্র। সে দেবীপুরের জমিদার। জমিদারী রক্ত তার দেহেও আছে কিন্তু সামন্তদের আর এক স্বেচ্ছাচারী চরিত্রহীন লাম্পট্যের দিক ফুটে উঠেছে তার চরিত্রে। এক বংশীয় হলেও দেবেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথের মত নয়।

জমিদারদের মধ্যে সম্পত্তিঘটিত শরিকি লড়াইয়ের চিত্র যেমন কৃষ্ণকান্তের উইলে আছে—গোবিন্দপুরের জমিদারদের সঙ্গে দেবীপুরের পুরুষানুক্রমে মকদ্দমার বিবরণও তিনি দিয়েছেন। সম্পত্তিঘটিত এই লড়াই জমিদার বংশের একটি অপরিহার্য দিক এবং জমিদারী বিভক্ত হতে হতে একআনি দু আনি অংশের জমিদার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সম্পত্তি বৃহৎ না হলেও জমিদারী দম্ভ ও রক্তের কৌলিন্য তাদের ঠিকই থাকে—তার থেকে যে ট্রাজেডির সূত্রপাত হয় তা নিয়েও পরবর্তী কালে বহু লেখক কাহিনী রচনা করেছেন—প্রসঙ্গক্রমে সে সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে।

তবে বিষবৃক্ষ দেবেন্দ্রনাথের অধঃপতনের একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ যদিও দেখিয়েছেন তথাপি সে উচ্ছৃংখল জমিদারের প্রতীক হয়ে উঠেছে। লালসা চরিতার্থ করার জন্য সে যে সকল ছলা কলার আশ্রয় নিয়েছে তাতে জমিদার পরাণ চৌধুরী ও তার গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাকে পাশাপাশি দাঁড় করানো যায়।

মোগল যুগের সূচনায় জমিদারদের চরিত্র চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বঙ্কিমের সীতারাম উপন্যাসে। সীতারাম উত্তরাধিকারসূত্রে শ্যামপুর গ্রামের জমিদার। কিন্তু বাস করতেন ভূষণা নগরীতে—সেখানে মুসলমান ফৌজদার ছিল গবর্ণর। পরে সীতারাম বিপদের ভয়ে পৈতৃক জমিদারী শ্যামপুরে গিয়ে নতুন করদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন, তাঁর সেই নবগঠিত রাজ্যের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকে তা প্রায় রাজার রাজধানী হয়ে উঠেছিল।

তবে সীতারাম তাঁর প্রজাদের কাছে রাজার সম্মান পেলেও রাজা নাম তখনও গ্রহণ করেন নি—কারণ দিল্লীর বাদশাহের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল। পাছে তিনি রাজা নাম গ্রহণ করলে স্থানীয় মুসলমানেরা তাঁকে বিদ্রোহী বিবেচনা করে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এই কারণে তিনি সাধারণ জমিদারের মতই দিল্লীর বাদশাহকে সম্রাট বলে স্বীকার করে জমিদারীর খাজনা নিয়মিত দিল্লীর বাদশাহের রাজকোষাগারে পোঁছে দিতে লাগলেন।

দিল্লীর বাদশাহের প্রতি এই আনুগত্য রক্ষা না করার জন্যই বাংলাদেশ বারো ভুঁইঞা বা দ্বাদশ ভৌমিক বিদ্রোহী আখ্যা পান এবং তাঁদের দমন করার জন্য আকবর থেকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল পর্যন্ত এই বারোভুঁইঞাদের দমনের চেষ্টা হতে থাকে।

সীতারামকে বঙ্কিম বারোভুঁইঞাদের মত বিদ্রোহীরূপে চিত্রিত করেননি—বরং তাঁকে মুসলমানদের সঙ্গে আপোয করে চলতে দেখা গেছে।

সীতারাম বাদশাহের আনুকূল্য পাবার জন্যই দিল্লীতে গমন করেন। রাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কেও অনুরূপ কাহিনী শোনা যায় অর্থাৎ তিনিও প্রথমে বাদশাহের আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করেন—কিন্তু তাতে ব্যর্থ হওয়াতেই পরে তিনি বিদ্রোহী হন। সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিম সীতারামের মুখ দিয়ে সেকথা বলেছেন "কার্য-সিদ্ধি হইয়াছি। বাদশাহের আমি কোন উপকার করিতে পারিয়াছিলাম—তাহাতে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য প্রদান মহারাজাধিরাজ নাম দিয়া সনন্দ দিয়াছেন।"

জমিদারদের রাজা নাম লাভের পিছনে সর্বত্রই এই ধরনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছিল। অতএব তথাকথিত রাজা রাজাড়ারা যে অধিকাংশই জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন একথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

এই সকল জমিদাররা স্বভাবতঃই বিলাসের অতিশয্যে গা ভাসিয়ে জমিদারীর কাজে অবহেলা করতেন। শ্রীকে কেন্দ্র করে সীতারামের চারিত্রিক অধঃপতন যে কেবল ন্যায়নীতি—পাপপুণ্যকেই ব্যঞ্জিত করে তা নয় সীতারামের যে প্রবৃত্তি ও চারিত্রিক দুর্বলতার ফলে রাজ্যের পতন ঘটল—সেই প্রবৃত্তি বহু জমিদারের রাজ্যনাশেরই কারণ স্বরূপ হয়ে থাকে।

আনন্দমঠ উপন্যাসের ১১৭৬-এর অর্থাৎ ইংরাজী ১৭৬৯-এর মন্বন্তরের পটভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে তদানীন্তন রাজস্ব ও খাজনা আদায়ের একটি সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই সময়কার শাসন পদ্ধতির বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয়

নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের আর প্রাণ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্নে যায়। অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। যেখানে যেখানে ইংরেজরা আপনাদের প্রাপ্য কর আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজনা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক খাজনা আদায় বন্ধ হয় না।" সেই কলিকাতাগামী খাজনার গাড়ী ও সৈন্যসামন্তের দ্বারাই পদচিহ্ন গ্রামের ধনী ব্যক্তি মহেন্দ্রের পথ চলার গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যত্র (প্রথম পরিচ্ছেদ) লিখেছেন— "লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল।" অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের দরুনও প্রজার নিকট থেকে অর্থ আদায় বন্ধ করা হত না।

আনন্দমঠেরই তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে দুর্ভিক্ষের পর-বৎসরের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রায় জনশূন্য বাংলাদেশের এক মর্মান্তিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন "শস্য জন্মে খাইবার লোক নাই। চাষারা চাষ করে, টাকা পায় না। জমীদারের খাজনা দিতে পারে না। জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমিদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমীদার সম্প্রদায় সর্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল।" আনন্দমঠের এই অর্থনৈতিক রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর্বকালীন ভূমি-ব্যবস্থারই স্মারক।

# অক্ষয়চন্দ্র সরকার

সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ নিবন্ধের মধ্যে লর্ড রিপন নামক রচনায় তদানীন্তন ভূমি সংক্রান্ত কিছু আলোচনা আছে। ১৭৯৩ সালের লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে জমিদার শ্রেণীর ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বড়লাট রিপনের আগে অন্য কোনও ইংরেজ লাটসাহেব দেশের প্রজা স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখেন নি। সেই কারণেই অক্ষয় চন্দ্র তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমের সমকালীন এবং অন্তরঙ্গ এই লেখকের বক্তব্য থেকে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

লর্ড রিপনকে অনেকেই ভারতবন্ধু বা দীনবন্ধু নামে অভিহিত করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারও তাঁকে দীনবন্ধু বলেছেন। লর্ড রিপন সম্পর্কে তাঁর প্রথম অভিমত হল "তাঁহার শাসন প্রণালী প্রজাশক্তি মূলক।...এ কথার অর্থ এই যে তিনি শক্তিহীন প্রজাকে শক্তিশালী করিতে চাহেন, প্রজাকে শুধু শাসনের পাত্র না করিয়া শাসন কর্ত্তা করিতে চাহেন।"

লর্ড রিপনের প্রধান কীর্ত্তি ছিল লবণের শুল্ক হ্রাস। দরিদ্রের পক্ষে নুনের মূল্য হ্রাস যে কত মঙ্গলজনক ছিল সে সম্পর্কে লেখক লিখেছেন 'যাঁহারা ধনী... যাঁহাদের জমিদারীর আয় প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা, জগতে দীন দুঃখী আছে বলিয়া তাঁহাদের জ্ঞান নাই...তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে পৃথিবীতে সকলেই—তাঁহাদের ন্যায় বিনা আয়াসে ক্ষুধার শান্তি করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা নহে। বঙ্গের কোটি কোটি লোক যথার্থই লবণের কাঙ্গাল, নূন সস্তা হওয়ায় দরিদ্র প্রজার আনন্দের তুলনা লেখক বলেছেন—জমিদার বাবুরা ত্রিশ হাজার টাকায় তিন লক্ষ টাকার একখানা জমিদারি পাইলে যেমন আহ্লাদে আটখানা হন—প্রজারাও তেমনি আহ্লাদিত হয়েছে।"

দেখা যাচ্ছে—লেখক প্রায়ই জমিদারদের দৃষ্টান্ত দিয়ে কথা বলেছেন। সম্ভবত, জমিদার শ্রেণী তখন সমাজে যথেষ্ট ঈর্ষা ও বিদ্বেষের পাত্র হয়ে উঠেছে। তাই রিপনের জমিদার স্বার্থ বিরোধী কার্য কলাপ লেখকের দ্বারা বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত হয়েছে।

এই আলোচনার এইখানেই শেষ নয়। লর্ড রিপনের অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে ছিল খাসমহলের নতুন বন্দোবস্ত এবং তিনি জমিদারের প্রজা উচ্ছেদের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্তনের চেষ্টা করেন।

খাস মহল বন্দোবস্তে তিনি যে সংস্কার সাধন করেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও বিশদ বর্ণনা অক্ষয় কুমারের রচনায় পাওয়া যায়। এই বিষয়ে তিনি লিখেছেন "ত্রিশ বৎসর অন্তর খাসমহলের সমস্ত প্রজার সমস্ত জমি জরিপ করা হয় এবং ঐ ইচ্ছা মত সমস্ত জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। এই জরিপ এবং খাজনা বৃদ্ধি উভয় কার্যই প্রজার পক্ষে অতিশয় অশুভের কারণ। খাসমহলের প্রজা এই দুই কার্যের দ্বারা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইয়া থাকে। দীনবন্ধু রিপন অসংখ্য দীনদুঃখীকে সেই পীড়ন হইতে উর্দ্ধারার্থ বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া গেলেন। তিনি এই নিয়ম করিয়া গেলেন যে দুই একটি নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বন্দোবস্তের সময় গভর্নমেণ্ট প্রজার জমি জরিপ বা খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না।

লেখক আরও মন্তব্য করেছেন—"যিনি ধনী জমিদার, যিনি ত্রিতল বিলাস ভবনে একটা বাতায়ন খুলিয়াও কখন কাঙ্গালের ভগ্ন কুটিরের দিকে একবার চাহিয়া দেখেন না তিনি এ কৃতজ্ঞতার অর্থ বুঝিবেন না।"

লেখকের এই কৃতজ্ঞতা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—সারা ভারতবাসীই লর্ড রিপনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিল। ইতিহাস যদিও রিপনের বিভিন্ন আইন সংস্কারের গুরুত্ব খুব বেশি স্বীকার করে না—ইংরাজ জাতি যদিও রিপনের বাদান্যতার প্রশংসা না করে বরং সমালোচনা করেছেন—তথাপি তিনি যে ভারতবাসীর প্রীতিভাজন ছিলেন সে কথা সবাই মানে। মনে হয় রিপনের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হলেও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান জমিদারী-প্রথা-বিরোধী মনোভাবের জন্যই তিনি দেশবাসীর অন্তরে স্থান পেয়েছিলেন।

# মীর মশারফ্ হোসেন

বঙ্কিমের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও বঙ্কিম যুগেরই অন্তর্গত এক শক্তিশালী লেখক মীরমশারফ্ হোসেন। তাঁর রচনার ভাষা বঙ্কিমের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদধর্মী কিছু ইঙ্গিত থাকায় মুসলিম সাহিত্যিকদের সেণ্টিমেণ্টকে আহত করেছিল।[১] মুসলমান লেখক মীরমশারফ্ তাঁর জমিদার দর্পণ নাটকে যে জমিদারের শোষণ ও অত্যাচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তা মুসলমান সমাজ ও মুসলমান জমিদারকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও—হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে—সকল জমিদার চরিত্রের উপরই এ গ্রন্থ আলোকপাত করেছে। জমিদার শ্রেণীই যে শোষণের প্রতীক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিভিন্ন লেখক নানাভাবে জমিদারের সেই প্রজাপীড়নের ছবি এঁকেছেন ঠিকই কিন্তু মীরমশারফের জমিদার দর্পণের অত্যাচারের চিত্র দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের কথাই স্মরণ করায়। নামের সাদৃশ্য যেমন লক্ষণীয় বিষয়গত মিল না থাকলেও ভাবগত মিল যথেষ্ট আছে। অর্থাৎ দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার এখানেও দেখানো হয়েছে। কেবলমাত্র পার্থক্য বিদেশী নীলকর সাহেবদের এদেশের মানুষদের উপর অত্যাচারের পরিবর্তে এখানে প্রজার উপর জমিদারের অত্যাচার দেখানো হয়েছে।

জমিদার এখানে যেন পিশাচের প্রতীক। দয়ামায়া লেশশূন্য। ক্ষেত্রমণির ধর্ষণের মত সেও প্রজার গর্ভবতী সুন্দরী বিবিকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। এক গোষ্ঠী স্তাবকের দল নিয়ে তার বাস। মোসাহেবেরা চাটুবাক্যে জমিদারের মনোরঞ্জন করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাবিক্ষোভ ঘনিয়ে ওঠে এবং জমিদার কৃতকর্মের ফলভোগ করে। মীরমশারফের জমিদার দর্পণ আলোচনার পূর্বেই স্বীকার করে নেওয়া যায় যে এই গ্রন্থের পূর্বে সামন্ততন্ত্রের উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত অন্য কোনও লেখক হানতে পারেন নি। বঙ্কিম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল নিয়ে প্রজাস্বার্থ সম্পর্কে কিছু কথা বললেও তাঁর উপন্যাসগুলিতে জমিদার শ্রেণীরই প্রাধান্য এবং সেখানে তিনি জমিদার প্রজার সম্পর্ক বা জমিদারের প্রজাশোষণের চিত্র কোথাও উদ্‌ঘাটিত

১। ১২৮৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে জমিদার দর্পণের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম যা লিখেছেন মীরমশারফ্ হোসেন রচিত 'বিষাদ সিন্ধু'র ভূমিকায় আবদুল আজীজ আল আমান তার উল্লেখ করেছেন।

করেননি। বরং মীরমশারফ হোসেনের প্রজাবিদ্রোহের জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি স্বরূপ জমিদার দর্পণ নামক গ্রন্থটি প্রচার করার বিরুদ্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।[১] প্রসঙ্গত বলা চলে এই সময় অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সারাদেশব্যাপী কৃষক বিদ্রোহ নানা আকারে ও নানা নামে প্রকাশ পাচ্ছিল। যেমন 'কোল বিদ্রোহ', 'তিতুমীরের বিদ্রোহ', 'নীল বিদ্রোহ', 'কৃষক বিদ্রোহ' প্রভৃতি। এই কৃষক বিদ্রোহ ছিল জমিদারের প্রজা উচ্ছেদ এবং খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। পাবনা এবং বগুড়া জেলাতেও মূলতঃ এই বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং ইচ্ছামত খাজনা বাড়াবার অধিকার লাভ ও হফরম রেগুলেশনে ক্রোক করার ক্ষমতা পেয়ে জমিদারের শক্তিবৃদ্ধি হ'ল। সেই সঙ্গে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অত্যাচার ও নীলকরদের জুলুম—কৃষকপ্রজাকে বিদ্রোহী করে তোলে।

মীরমশারফ্ জমিদার বংশীয় বলেই যে তিনি এই গ্রন্থে জমিদারের চরিত্রচিত্র অনায়াসে আঁকতে পেরেছেন—সে কথা তিনি ভূমিকাতেই বলে নিয়েছেন। অতএব নিজে জমিদার বংশীয় হওয়া সত্বেও জমিদারী চরিত্রের প্রতি তাঁর এই সহজাত বিতৃষ্ণা—সামন্ততন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণামেরই ইঙ্গিতবহ। অর্থাৎ বিদ্রোহী চরিত্রসৃষ্টি নয়—লেখক নিজেই একটি বিদ্রোহী চরিত্র। নাটকের প্রস্তাবনা অংশে সূত্রধার ও নটের সংলাপে মীরমশারফ্ জমিদার-দর্পণের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থাৎ—হা ধর্ম—

তোমার ধর্ম লুকাল·ভারতে
জমিদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে

জমিদারের প্রজাপীড়ন দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ছাড়া কিছু নয়। শহর এবং গ্রাম—উভয় স্থানেই জমিদার বংশ বাস করেন—তাঁদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান দু' ধর্মের লোকই আছে। কিন্তু প্রকৃতি ও আচার আচরণে সব জমিদারই এক। সূত্রধার এই জমিদার শ্রেণীকে জানোয়ার বলে অভিহিত করে তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছে—এরা খাসা পোষাক পরে দিব্বি সরু চালের ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও গদীর আশেপাশে ল্যাজ গুটিয়ে ঘিরে বসে থাকে।...বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জমিদার-দর্পণে সেই জানোয়ারদেরই অন্যতম জমিদার হারওয়ান আলির চরিত্রচিত্র নাট্যকার উপস্থিত করেছেন। জমিদার হারওয়াল আলির

১। বিষাদ-সিন্ধুর ভূমিকায় আবদুল আজীজ আল আমান বঙ্কিম প্রসঙ্গে এ কথা লিখেছেন। তিনি বঙ্কিমকে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন বলে মনে করেছেন।

মোসাহেব বা ইয়ার বন্ধুর দ্বারা বেষ্টিত একদিকে অলস অকর্মণ্য জীবনধারা—অন্যদিকে তার কুচক্রী পরস্ত্রীলোলুপ দুর্নীতির দিকে এখানে একই সংগে জীবন্ত ভাষায় ফুটে উঠেছে। প্রজার প্রতি জমিদারের বিন্দুমাত্র করুণা নেই। প্রজা আবুমোল্লাকে খাজনার দায়ে ধরে এনে তার উপর কায়িক নির্যাতন করেও শান্তি নেই জমিদারের—তার সুন্দরী বিবি নূরন্নেহারের প্রতিও তার লোভী দৃষ্টি পড়ে। আবুমোল্লার বকেয়া খাজনার দায় থেকে তাকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র নূরন্নেহার—যদি সে জমিদারের বৈঠকখানায় রাত্রিবাস করে—একথা জানাল কৃষ্ণমণি বৈষ্ণবী জমিদারের প্রেরিত দূতী—যার সঙ্গে তুলনা করা যায় নীলদর্পণের পদীময়রাণীর চরিত্রের। আবুমোল্লার পত্নী এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে কৃষ্ণমণি জমিদারের ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে বলে—"দেখ, জমিদার, সে কি না কর্তে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তার ক্ষ্যামতা আছে। জব্বান কল্লেও তো কর্তে পারে। সে যখন পণ করেছে তখন ছাড়ছে না।

আবুমোল্লার ভগ্নী আমিরণ জমিদার চরিত্র আরও বিশ্লেষণ করেছেন—"জমিদার হলেই প্রায় এক খুরে মাথা মুড়নো, কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকররাই জানে।...সৎকাজের বেলা এক পয়সা মা-বাপ! কিন্তু ওদিকে কল্পতরু। কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিণী নে উন্মত্ত কেউ ঘরে দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল কাটাচ্ছেন, এদেশের জমিদারদের অনেকের দশাই তো এই।"

বলাবাহুল্য মীরমশারফের এই মন্তব্য জমিদার চরিত্র সম্পর্কে চিরন্তন সত্য এবং পরবর্তীকালে বহু উপন্যাসে আমরা জমিদার শ্রেণীর এই বহির্মুখতার চিত্র পরিস্ফুট দেখতে পেয়েছি। সাহেব বিবি গোলাম তারই বিশদ বর্ণনা।

প্রজার পক্ষে আদালতে বিচার প্রার্থনা যে সে যুগে প্রহসন মাত্র ছিল। যার টাকা আছে আইন আদালত যে তারই জন্য সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন জমিদার হারওয়ান আলি মোসাহেবদের বলছে—'মকদ'মা আছে মামলা আছে, আমি আছি।.. তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি।'

সম্ভবতঃ মীরমশারফই প্রথম ইংরেজ শাসিত বাংলাদেশে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাকে আদালতে দাঁড় করিয়েছেন। প্রজাপক্ষের মোক্তার যে কথা উচ্চারণ করেছে তা একটি চিরকালীন সত্য। জমিদার মফঃস্বলে প্রজার হর্তাকর্তা। তাদের আদালত ফৌজদারী জমিদারই নিষ্পত্তি হক বা না হক আপনি নজরের টাকা হলেই হল। প্রজারা শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই। জমিদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্য হইতে পারে না। জমিদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা

বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমিদার একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া তার ভিটেমাটি একেবারে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেন। আদালতে বিচার ব্যাপারটা যে কেবলই প্রহসন—আসামী জমিদার যে টাকার সাহায্যে কত সহজে বেকসুর খালাস পান—তার চমৎকার দৃষ্টান্ত নাটকের বিলাসপুরে সেসন আদালতের বিচার দৃশ্যটি। প্রজা আবুমোল্লার গর্ভবতী স্ত্রী নূরন্নেহাবের প্রতি দৈহিক অত্যাচার করার ফলেই তার মৃত্যু ঘটে কিন্তু ডাক্তার রিপোর্ট দেয় মস্তিষ্কের রক্ত-ক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে। অতএব জজ রায় দেন আসামীপক্ষ নির্দোষ। আবুমোল্লা বিচার পায় না, স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া তার হয় না। শুধু অশ্রুজল আর আবেদন নিবেদনই সার হয়, জজ ব্যারিস্টারের ধমকে তাকে চুপ করে যেতে হয়। কেবল তাই নয় এর পরিণাম আরও ভয়ানক। কারণ জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করার স্পর্ধা করার দরুন আবুমোল্লার উপর কোপদৃষ্টি পড়ে জমিদারের। তার ঘরবাড়ী ভেঙে, সব কিছু কেড়ে নিয়ে জমিদার তাকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করেন।

নটনটীর কথার মাধ্যমে নাট্যকার লিখেছেন—"প্রজার কথা—আমাদের কথা কে শুনে?" আর কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়।" প্রজাদের এই দুঃখদুর্দশা সামন্ত শাসনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। মীরমশারফ্ বহুকাল আগেই জনগণের সামনে জমিদারের প্রজা নির্যাতনের দৃশ্য তুলে ধরে অভূতপূর্ব সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। নীলকর অত্যাচারের পক্ষে নীলদর্পণের ভূমিকা যতখানি জমিদার দর্পণকে ততখানি গুরুত্ব না দিলেও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রজাদের মানসিকতা গঠনের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে এ গ্রন্থ সেযুগে অনেকখানি সাহায্য করেছিল বলেই মনে হয়—যে কারণে স্বয়ং বঙ্কিমও এই গ্রন্থ প্রকাশে আপত্তি জানিয়েছিলেন। সেদিক থেকে বিচার করে বলা যায় বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে মীরমশারফের 'জমিদার-দর্পণ' একটি বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ।

# হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে কয়েকজন লেখকের রচনার মধ্যে জমিদার গোমস্তা প্রজা সম্পর্কের ইতিবৃত্ত—জমিদারের নামে গোমস্তার প্রজাশোষণ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে,—তার মধ্যে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রায় মহাশয়" (সাহিত্য পত্রিকা ২য় বর্ষ) গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ইতিপূর্বে রচিত আরও দু একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যায়—সে গ্রন্থগুলি হল—'শরৎ সরোজিনী' এবং 'হেমচন্দ্র' —দুইটিই নাটক। শরৎ সরোজিনীর রচয়িতা উপেন্দ্রনাথ দাস। তিনি দুর্গাদাস ছদ্মনামে লেখেন। এই কাহিনীতে দুই বিপরীত ধর্মী জমিদার চরিত্র সৃষ্ট হয়েছে। শরৎকুমার উচ্চশিক্ষিত এবং দেশপ্রেমিক। সে দেশকে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা দিয়েছে। বলা বাহুল্য এই জমিদার আদর্শবাদী জমিদার এবং পরবর্তীকালে এই ধরনের জমিদার চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা আরও বিভিন্ন লেখকের রচনায় পাব—সে প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে। শরৎকুমারের ঠিক বিপরীত চরিত্র মতিলাল দে এক পাষণ্ড এবং চরিত্রহীন জমিদারের প্রতীক। মতিলাল নামটির মধ্যেও যেন প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালের ছায়াভাস আছে। এখানে অবশ্য প্রজা জমিদারের তথাকথিত সম্পর্কের বর্ণনা নেই—ইংরেজশাসিত রাজ্যে জমিদারদের ভূমিকাই এখানে প্রধান বক্তব্য।

অপর লেখক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর 'হেমচন্দ্র' নামক নাটকে জমিদারের অত্যাচারের বিবরণ আছে।

অতঃপর হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রায় মহাশয় গ্রন্থটির আলোচনা করা যাক্। এটি একটি উপন্যাস—এবং এর বিষয়বস্তু সেই জমিদার গোমস্তা শ্রেণীর প্রজা-শোষণ। গ্রামের মধ্যে জমিদারকে আচ্ছন্ন করে গোমস্তা যে কত প্রবল প্রতাপান্বিত এবং অত্যাচারী হয়ে থাকে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত 'রায় মহাশয়' উপন্যাসের রায় মহাশয় চরিত্র। কেবল চরিত্র নয়—সমগ্র জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যেই যে কত বঞ্চনা, ছলনা এবং চক্রান্ত আছে—তারও রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন তিনি একটি জমি প্রজা বিলি করা উপলক্ষ্যে। জমিদারের ক্ষমতা বিশেষতঃ প্রজা উচ্ছেদের ক্ষমতা যে কত অসীম ছিল—এ তারও একটি জীবন্ত নজীর। উচ্চহারে সেলামীর লোভে এক প্রজার চাষের জমি অন্য প্রজাকে বন্দোবস্ত করে দিতে তাঁরা দ্বিধা করেন না। ফলে প্রজায় প্রজায় লড়াই অনিবার্য হয়ে ওঠে। এবং এই প্রজা বিরোধের সূত্র

ধরে প্রতিবেশী জমিদাররা যে কত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে, তারও বিশদ চিত্র এঁকেছেন লেখক।

রায় মহাশয় উপন্যাসটিকে এদিক থেকে অত্যন্ত বাস্তবানুগ বলা যায়। লেখক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উদ্ধৃতির সাহায্যে এই বিষয়টি আরও স্পষ্টতা লাভ করবে।

রায় মহাশয় আসলে দশ আনার জমিদারদের গোমস্তা। তাঁর পরিচয় দিয়ে লেখক বলেছেন—

আজ দশবৎসরের উপর হইবে রায় মহাশয় দশ আনাদিগের সরকারে কাজ করিতেছেন। একাদিক্রমে এই বিল্বগ্রামেই তিনি পাঁচ বৎসর ধরিয়া কাছারি করিতেছেন।

রায় মহাশয়ের কাছারি বাড়ির সামনে বিভিন্ন রকম ধান ঝাড়াইয়ের কাজ চলছে। তারই বর্ণনা দিয়ে লেখক বলেছেন—"এই সকল ধান জমিদারদের গত বৎসর প্রজারা যে ধান কর্জ লইয়াছিল—তাহাই সুদে আসলে আদায় হইয়াছে। সচরাচর ইহাকে বাড়ির ধান বলে।" এই বাড়ীর ধানের কথা চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরামও লিখেছেন তাঁর গুজরাটনগর পত্তনের কালে। "চাষ ভূমি বাড়ী দিব ধান।" এই ধানের বাড়ি সম্পর্কে লেখক আরও বলেছেন—"যে জমিদার বা মহাজন বাড়ির কারবার চালাইতে পারিত, সে দুই দিনে ফাঁপিয়া উঠিত।" পক্ষান্তরে যে প্রজা পেটের দায়ে বাড়ি লইতে বাধ্য হইত সে আর সুদের জ্বালায় কোনও কালে গুছাইয়া উঠিতে পারিত না। বাড়ির সুদের হার দেড়গুণ। যত বৎসর থাকিত তত বৎসরই সুদে আসলে একত্রে আসল হইয়া বৎসর বৎসর দেড়গুণ করিয়া বৃদ্ধি পাইত।

গরিব ছাঁ পোষা চাষা, সে দেনা দিবে না পেটে খাইবে? যে পেটে না খাইয়াও দেনা দিত, তাহার সুদের সুদ ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া ঘটিত না।"

কাছারিতে জমিদারের দৈনন্দিন কার্যাবলীর বিশদ বিবরণ দিয়ে লেখক লিখেছেন "এই সময়টুকুর মধ্যে প্রত্যহ কত মামলা মোকর্দ্দমা কত জুলুম জবরদস্তি, কত ধর পাকড় ও মারফৈজদ হইত তাহা কে নির্ণয় করিয়া উঠিবে?"

তিনি আরও বলেছেন—রায় মহাশয় কেবল জমিদারি কাজ লইয়াই সমস্ত সময়টা অতিবাহিত করিতেন না। দেওয়ানি বল আর ফৌজদারি বল, সে অঞ্চলে যত মোকদ্দমা উপস্থিত হইত, তাহা অন্ততঃ একটি বারের জন্যও রায় মহাশয়ের হাত না হইয়া কোর্টে উঠিত না। রায় মহাশয়—গোমস্তা জমিদার, হাকিম, জজ, হুজুর ধর্মাবতার সব।

সব ব্যাপারেই যে জমিদার মোটা রকমের নজর বা ঘুষ আদায় করতেন তারও আভাস দিয়েছেন লেখক। জমিদারের প্রতিনিধি গোমস্তা নিজে. সন্তুষ্ট না হলে পাইক দিয়ে প্রজাদের ভিটামাটি উচ্ছেদ করার চেষ্টাও তিনি করতেন। জেলার দারোগা ইনসপেকটররাও তাঁকে ভয় করতেন—এবং সেইজন্য তাঁর বিরুদ্ধে—অভিযোগ এলেও কিছু বলতেন না। লেখক আরও লিখেছেন—

"কিস্তির নিরূপিত সময়ের দশদিন আগে রায় মহাশয়ের মহলের সমস্ত টাকা কড়ায় গণ্ডায় গিয়া জমিদারের সেরেস্তায় পৌঁছিত। এ নিয়মের একটি বারও ব্যত্যয় হইত না। জমিদার যে জমার খাজনা .আট টাকার বেশি আশা করিতে পারিতেন না রায় মহাশয় তাহা বারটাকায় বিলি করিতেন। সুতরাং ইহা করিয়াও যদি তিনি নিজে দুপয়সা আপনার অংশে রাখিয়া দেন, তাহাতে জমিদার কথা কহিবেন কেন? প্রজারা কখন কখন বড় জ্বালাতন হইয়া ধর্মঘট করিয়া জমিদারের কাছে গিয়া, রায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে অনেক লাগাইত—প্রকাশ্যে পারিত না—গোপনে যাইত। জমিদার তাহাদিগকে মিছামিছি স্তোক বাক্যে আশ্বাস দিয়া ফিরাইয়া দিতেন। কিন্তু প্রজারা দেখিত, তাহারা যে কয়জন—এই কাজ করিয়াছিল—তাহাদের উপর রায় মহাশয়ের কড়া তাগাদা ও জুলুম আরও হইয়াছে। প্রজারা বুঝিত অবশ্যই রায় মহাশয় উহাদের ভিতরের খবর জানিতে পারিয়াছেন—অথচ জমিদারের আর উচ্চবাচ্যও নাই। আসল কথাটা তাহারা বুঝিত। আবার পুলিশে খবর দিলেও তার ফল কি হত সে সম্বন্ধে লিখেছেন—হয় ফরিয়াদি ২১১ ধারায় পড়িয়া জেরবার হইয়া জেলে যাইত না হয়, রায় মহাশয় বাকি খাজনার দায়ে তাহাকে সর্বস্বান্ত করিয়া তাহার বাস উঠাইয়া তবে ছাড়িতেন। এক কথায় বিল্বগ্রাম ও আসপাশ দশখানা গ্রামে রায় মহাশয়ের প্রতাপ সর্বাদিমতে অক্ষুন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

খাজনা আদায় কিংবা অন্যান্য মুনাফা আদায়ের ব্যাপারে জমিদারকে ঠকানো গোমস্তা রায় মহাশয়ের স্বভাবগত ছিল।

প্রজাদের ঘরে এনে খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করার একটি বাস্তব চিত্র রায় মশায়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে। কোন প্রজা খাজনার দাখিলা পায়নি কার সে টাকা উশুল হয়নি কেউ বলে তার বকেয়া ছিল না তবু রায় মহাশয় তার এক কিস্তির টাকা পাবণা বাবদ কেটেছে—কেউ বলছে তার জমির অধিকাংশ হাজা—তাই সে পুরা খাজনা দিতে পারিবে না কেউ বা অন্যান্য দায়ে পড়ে টাকা মকুবের জন কাদাকাটা করে সময় ভিক্ষা করছে।

কিন্তু তাদের অনুনয় বিনয়ের উত্তরে রায় মশায় কঠোর স্বরে নির্দেশ দিলেন

যতক্ষণ না সুদ সমেত সমস্ত টাকা শোধ করে ততক্ষণ চৈত্র রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখতে আবার কারুকে বেদম প্রহার দিতে।

মাধবকে জমি বিলি করার ব্যাপারে তাকে যাচাই করে নিতে রায় মশায় যা বলেছে তা চিরকালের জমিদারদের কথা। রায় মশায় বলেছে—"কি জান, আমার কাছে শক্তাশক্ত নাই আমি যা মনে করিব তাই যদি না হবে তবে আর জমিদারী শাসন কি হল? আর জমিদারের কথা তাতো জানই। জমিদারী জমিদারের ব্যবসা।"

রায় মহাশয়ের এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে জমিদারী প্রথা ও জমিদার চরিত্রের একটি সুষ্ঠু চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। বহু লেখকের রচনায় আমরা জমিদার চরিত্রের বিশ্লেষণ দেখেছি কিন্তু জমিদারের বকলমে গোমস্তার কূট চক্রান্ত ও অত্যাচারের এমন বিশদ ও নির্ভেজাল চরিত্র চিত্রণ বাস্তবিকই অন্য কোথাও এভাবে দেখা যায় না। এই কাহিনীর নায়ক হলেন রায় মশায় গোমস্তা। জমিদারের উল্লেখ মাত্র আছে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন। রায় মহাশয়ের কীর্তি কাহিনী এবং ক্ষমতার কথাই আগাগোড়া বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য তাঁর সব কাজেই যে জমিদারের পরোক্ষ সমর্থন থাকে সে কথা কারো অজানা নয়। মাধবকে জমিবিলি করার সর্ত বা সেলামি হিসাবে জমিদারের দাবী কত সেই সম্পর্কে রায় মহাশয় বলেন আমার এক শত আর জমিদারের এক শত এই দুইশত যদি পার তবেই ইহাতে হাত দাও। মনে মনে বনমালীর ওপর আক্রোশ বশতঃ মাধবের জেদ চেপেছিল। সে নগদ দুই শ টাকা হাতে দিতেই রায় মশায়—লেখকের কথায়—"সেই দণ্ডে বনমালীর প্রদত্ত কবুলতি খানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ও খাতা হইতে তাহার নাম উঠাইয়া দিয়া তাহাকে পাট্টা দিবার ৩ মাস পূর্বের তারিখের একখানি পাট্টা লিখিয়া দিলেন।"

কিন্তু টাকার বেলায় নিজে দেড়শত রেখে জমিদারকে দিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা

অচিরে জমির চাষ নিয়ে বনমালির সঙ্গে মাধবের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। বনমালি বোঝেনা কি করে মাধব তার চষা জমির ওপর অধিকার ফলায়? অথচ মাস কয়েক আগে এক আঁজলা সেলামি দিয়ে বনমালি রায় মহাশয়ের কাছে এই জমি জমা নিয়েছে। চাষ দিয়ে এক কুঁড়া ভুঁই বাজ বুনেছে গাছও হয়েছে।

বনমালির পক্ষে অনুরোধ জানাতে গিয়েছিল তিতু তরফদার। কিন্তু তার উত্তরে রায় মশায় বলেন যে জমিদার বাবুরা সব সময় প্রজার দুঃখ বুঝেন না, বলেন ইহাতে সরকারী কাজের ক্ষতি হয়। আপনার ক্ষতি না করিলে, কি

পরের ভাল করা যায় ? এই কথা বলে মহুরীকে জমাওয়াশীল, বাকা থোকা নিয়ে আসতে নির্দ্দেশ দেয়।

মাখলা গ্রামে ছয় আনি দিগের কাছারি বাড়ী। ছয় আনিদের গোমস্তা লক্ষণ ঘোষ। লেখক লক্ষ্মণ ঘোষ সম্পর্কে বলেছেন—গোমস্তার দল প্রায় সর্বত্রই সকলে সমধর্মী। বনমালী রায় মশায়কে জব্দ করার জন্য ভিন্ গাঁয়ের জমিদারের গোমস্তার সাহায্য নিতে চেষ্টা করে।

এই ঘোষণা তখন নতুন দাবী তোলে। বলে বনমালি যে জমি চাষ করত সে অংশ তার। সে বনমালিকে জমা দিয়েছে। তাই আরও দু মাস আগের এক তারিখ দিয়ে কবুলতি লিখে দিতে বলে বেচুকে একেবারে রেজেষ্ট্রী করে। তাহলে মাধবের কবুলতি জাল প্রতিপন্ন হবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবশেষে উভয় পক্ষে তুমুল লাঠালাঠি বেঁধে উঠল। দু চার জন মারাও গেল। অবশ্য আইনের চোখে ফাঁকি দিয়ে লাশ গুম করতেও লক্ষ্মণ ঘোষ পিছপা হল না।

রায় মশায়ের লোক বাধা দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিফল হল। ফলে তাদের পরাজয় ঘটল।

এইভাবে প্রজাদের জমি বিলি নিয়ে শরিকি জামিদারদের মধ্যে যে হরদম বিরোধ বিসংবাদ লেগে থাকত তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে লেখক উপস্থিত করেছেন। সেই সঙ্গে গোমস্তা চরিত্রও চরমৎকার পরিস্ফুট। গোমস্তার মুহুরী চরিত্রও তার নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট বাস্তবানুগ হয়েছে।

এই গ্রন্থের সমালোচনায় তাই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—"জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা মুহুরী হইতে সামান্য প্রজা পর্যন্ত সকলেই যথাযথ পরিমাণে বাহুল্য বর্জিত হইয়া আপন আপন কাজ দেখাইয়া গেছে।"

# রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের রচনায় জমিদারী প্রথার চেহারা বঙ্কিমের মতই দ্বৈতরূপে প্রকাশিত। ১। উপন্যাস ও ছোটগল্পে এবং। ২। প্রবন্ধ নিবন্ধ।

জমিদারী প্রথার অত্যাচারের রূপ রবীন্দ্রনাথ দেখাননি কিন্তু জমিদারী চরিত্রের আর এক দিক উদ্‌ভাসিত হয়েছে—সে হল জমিদারদের বংশগৌরব এবং শূন্যগর্ভ ঐশ্বর্যাভিমান এবং আভিজাত্যের অহমিকা। এর ফলেই জমিদার জমিদারে লড়াই বাঁধে—সংসারের বন্ধন শিথিল হয়—আবার অন্যের কাছে উপহাসাস্পদ যেমন হয় তেমনি অন্তঃসার শূন্য দম্ভের ভারে নিজেই বিরলে কেঁদে মরে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'যোগাযোগ', ছোটগল্প 'হালদার গোষ্ঠী', 'নয়ানজোড়ের বাবু' গল্পে জমিদারের এই স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জমিদার ছিলেন এবং পাবনা পতিসর ইত্যাদি অঞ্চলে তাঁদের সুবিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ দশবছর জমিদারী দেখা উপলক্ষ্যে পদ্মানদীর উপর নৌকায় বাস করেন। সেই সময়ের নজীর পাওয়া যায় ছিন্নপত্রের পত্রাবলীতে এবং সমকালীন চিত্রা চৈতালী সোনারতরীর বহু কবিতায়।

এই সময়টি গল্পগুচ্ছেরও জন্মকাল। অতএব ব্যক্তিগত জমিদারী সূত্রে রবীন্দ্রনাথ হয়তো জমিদার সম্প্রদায় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনে এটি একটি মূল্যবান অধ্যায় কারণ কবি এই সময় বাস্তব সংসারের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন।

পদ্মানদীর তীরবর্তী জনপদ আর সেখানে দীন দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতিদিনের দুঃখকষ্ট অভাব অভিযোগের কথা জমিদার হিসাবে তিনি শুনতেন এবং চাষী, জেলে মাঝিদের দুঃখের জীবন প্রতিমুহূর্তে দেখতেন। অথচ জমিদারী আভিজাত্যের জন্য তিনি সহজভাবে তাদের সঙ্গে মিশতে পারেননি বা তাঁরাও তাঁকে আপন করে নিতে পারেন নি। শেষ বয়সের রচিত 'ঐকতান' কবিতায় তিনি তাঁর এই আভিজাত্যের বেড়া আর সম্মানের চিরনির্বাসনে আর সমাজের উচ্চমঞ্চকে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে জীবনে জীবনে যোগ করার পথে বাধা সৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন। তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কবিজীবনের এই সময়ে যে পরিচয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে তিনি তাকে মূলধন করে রেখেছিলেন। তাঁর প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ জমিদার। তাঁদের সুখদুঃখের

অংশভাগী হয়ে তাঁদের অভাব অভিযোগ তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। এই সময়ে জমিদারী কার্য উপলক্ষ্যে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা তাঁর জীবনী ও সাহিত্যে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে সমকালীন গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে।

হালদার গোষ্ঠিতে জমিদারের অত্যাচারী চরিত্র রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন যে অত্যাচারী মনোভাবের সঙ্গে বাড়ীর বড় ছেলে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি। তাই একদিন সে গৃহত্যাগ করে জনারণ্যে মিশে যায়। জমিদারের আভিজাত্যের বেড়া ও আত্মদম্ভের উত্তরাধিকার হয়তো সব জমিদারের বংশধরই মেনে নিতে পারে না—ব্যক্তিজীবনে বা ঠাকুর পরিবারের কোনও চরিত্র থেকে হয়তো তিনি এই উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন। ব্যক্তিগত আদর্শ ও ব্যক্তিত্ববোধই যে মানুষকে গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র করে—ফলে কোনও কোনও বংশধারার মধ্যে সহসা ব্যতিক্রম ঘটে যায় বনোয়ারী লাল যেমন তার দৃষ্টান্ত তেমনি পরবর্তী বহু লেখকের হাতে এমনি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত আমরা পাব—যেমন শরৎচন্দ্রের দ্বিজদাস তারাশঙ্করের শিবনাথ্‌ এবং আরও বিভিন্ন উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রে।

অন্যতম ছোটগল্প 'প্রতিহিংসা'য় বংশানুক্রমিক ভদ্র জমিদার ও তার অধস্তন কর্মচারী দেওয়ানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিরোধের রসোজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে। সে যুগে দেওয়ানদের সতর্ক চেষ্টা ও প্রভুভক্তির ফলেই বহু জমিদারদের বাড়বাড়ন্ত হত। দেওয়ান গৌরীকান্তের চেষ্টাতেই মুকুন্দরাম, গণ্যমান্য জমিদারে পরিণত হন। কিন্তু তাঁর পোষ্যপুত্র বিনোদবিহারী ধনীর দুলালের মতই দুর্বল চরিত্র ছিলেন এবং প্রচুর টাকা ধার করে বেড়াতেন। দেওয়ানের বংশধর অম্বিকারচণ তাঁর কাছারিতেই কাজ করতেন। কিন্তু বর্তমান জমিদার পত্নীর অপমানজনক ব্যবহার অম্বিকাচরণ ও তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণীকে জমিদার বংশের বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে প্রতিহিংসা-পরায়ণ করে তুললেও পরে কিন্তু জমিদারের বিপদের দিনে আবার তার পাশে এসে দাঁড়ায় এবং ইন্দ্রাণীর অলঙ্কারের বিনিময়ে ডিক্রিজারীর ফলে হৃত জমিদারী পুনরায় ক্রয় করে আবার জমিদারকে প্রত্যর্পণ করেন। এই কাজের ফলে একই সংগে আত্মসম্মান ও জমিদারের মর্যাদা বজায় রাখলেন। জমিদারের নায়েবদের মধ্যে এমনি আদর্শবান ও সচ্চরিত্র নায়েবের দেখাও যেমন মিলত আবার বিপরীত ভাবও বহুক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

'উলুখড়ের বিপদ' নামক গল্পে গিরিশ বসু নামে এক দুষ্ট খল-চরিত্র নায়েবের চরিত্র রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেছেন। কিন্তু জমিদাররা এই ধরনের

নায়েবের কথাও বিশ্বাস করেন কারণ তাঁরা জমির ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরের মুখে ঝাল খান।

গিরিশ বসু যখন নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জমির খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলেন—তখন জমিদার তাঁকে পুরোপুরি সমর্থন করলেন এমনকি নায়েব যখন ব্যক্তিগত শত্রুতা বশতঃ ভট্টাচার্য মহাশয়কে লোক খ্যাপানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন তখন জমিদার স্বয়ং নায়েবকে হুকুম দিলেন যেমন করে পার ভট্টাচার্যকে শাসন কর।

জমিদাররা নায়েবের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হতেন এবং প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না রাখার ফলে সামজে কত যে অন্যায় অবিচার চলত—এই সামান্য গল্পের একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ তার উপর আলোকপাত করতে পেরেছেন।

জমিদারী প্রথার অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বর যে কত গভীর ট্র্যাজেডির বিষয় হতে পারে ঠাকুর্দা গল্পটি তার অপূর্ব দৃষ্টান্তস্থল। পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের জলসাঘরের ও সাড়েসাতগণ্ডার জমিদার এর যেন পূর্বাভাস এতে পাওয়া যায়।

নয়ানজোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড়ো সহজ ছিল না।

সাধারণের কাছে বাবু আখ্যা পাবার জন্য তাঁদের বহুবিলাস ও ব্যয় বাহুল্যের প্রয়োজন হত। নয়ানজোড়ের বাবুদের এককালীন জমিদার বৈভব ও বিলাসিতা প্রায় কিম্বদন্তীর মত ছিল।

কিন্তু ক্রমশঃ এই অমিতব্যয়িতার ফলে জমিদারের বৈভব বংশানুক্রমিক স্থায়ী হতে পারত না—কিন্তু সেই অতীতের হাতে গৌরবকে আঁকড়ে রাখার জন্য জমিদার বংশীয়দের প্রাণপণ প্রচেষ্টা অনেক সময়েই লোকের উপহাসের বিষয় হয়ে উঠত কারণ তাঁদের অন্তঃসারশূন্যতা তখন আর সাধারণের কাছে অবিদিত থাকত না—তাই অতীতের গালগল্প ও বনেদীয়ানা দেখানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা লোকচক্ষুর সামনে তার নিঃস্বতাকেই আরও বেশী প্রকট করে তুলত। সেই কারণে অনেকে অলক্ষ্যে তাঁকে করুণাও করত।

তেমনি বিলীয়মান জমিদারীর শেষ সলতে 'ঠাকুর্দা' গল্পের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী ওরফে ঠাকুর্দা। চরম দৈন্যদশার মধ্যেও পূর্বপুরুষের বিলাসবৈভবের গল্প ভাঙ্গিয়ে তিনি সকল মানুষের কাছে তাঁর আভিজাত্য বজায় রাখতে চান। সকলেই সে কথা বুঝত কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করত না উপরন্তু তাঁকে খুশী করার জন্য আরও মিথ্যা তোষামোদ করত। সম্ভবতঃ সেই কারণে ঠাকুর্দার আত্মাভিমান

কখনও ক্ষুন্ন হয়নি। শুধু তাই নয় তিনি যে নিজেকেও ছলনা করে চলেছেন সে বিষয়েও মাঝে মাঝে একেবারে অবচেতন হয়ে থাকতেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের সেই নিরীহ অহংকারের ফাঁপা আবরণটিকে একটি নির্দয় রসিকতার দ্বারা উন্মোচিত করার জন্য নায়কের কৌশল ও তার পরিণামের কাহিনী লেখক দিয়েছেন।

ছদ্মবেশী ছোটলাটের অভ্যর্থনায় ঠাকুর্দা যখন তার অতিকষ্টে সংরক্ষিত শেষ সম্বল গোলাপ ও আতরদান, স্বর্ণরেকাবীতে আসরফির মালা লাটসাহেবের হাতে তুলে দিলেন তাতে লুপ্ত গৌরব বংশাভিমানের যেমন করুণচিত্র ফুটে ওঠে সেই সঙ্গে প্রাচীন জমিদারী আভিজাত্যেরও একটা ধারণা পাওয়া যায়।

জমিদারের জমিদারীয় আয়ুষ্কাল যে বেশী দীর্ঘ হত না, হতে পারত না নয়ানজোড়ের বাবুদের অধঃপতনের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ তার যেন এক ঐতিহাসিক নজির দিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর্দাকে একটি Type চরিত্র রূপেই এঁকেছেন তাতে করুণ রস সৃষ্টি হলেও তার জন্য লেখকের ব্যক্তিগত কোনও একাত্মতা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু ঠিক বিপরীত ভাবে বলা যায় জমিদারী আইনের ফলে অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক সামন্ততন্ত্র যখন ভাঙ্গনের মুখে তখন সেই অতীত গৌরবের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন একজন উত্তরকালের লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্কর দুজনই জমিদার বংশীয়। কিন্তু জমিদারী মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনের মধ্যে কোথাও ছায়া ফেলেনি— একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়া যায়। তারাশঙ্কর নূতন ও পুরাতন যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নূতন যুগকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ঠিকই কিন্তু পুরাতনের জন্য তার বেদনাও কম নয়। কবি, সন্দীপন পাঠশালা, রাইকমল, হাঁসুলীবাকের উপকথার মত সাধারণ মানুষের লেখক হয়েও তারাশঙ্কর তাঁর নীল রক্তের স্পন্দনকে সর্বত্র অস্বীকার করতে পারেন নি। তাব অবক্ষীয়মান সামন্ততন্ত্রের জন্য একটি সুগভীর দীর্ঘশ্বাস তাঁর বহু রচনায় সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। সে সব কথা তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অভিজাত কবি এবং তাঁর সাহিত্যে সাধারণ মানুষের কোনও স্থান নেই অভিযোগ সর্বত্র স্বীকৃত হলেও সামন্ততন্ত্রের প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব রবীন্দ্রনাথের ছিল বলে মনে হয় না। বরং তিনি সচেতনভাবেই জমিদার চরিত্রকে সমালোচনা করেছেন। তাই সাধারণ মানুষ না থাকলেও জমিদারী

মনোভাবও রবীন্দ্রনাথ কোথাও প্রকাশ করেননি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বা সেজন্য তাঁর কোনও দুঃখবোধও প্রকাশ পায়নি।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মতামতের সাহায্য কিছুটা নেওয়া যেতে পারে। সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে সাহিত্যবিচার প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ—তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার সময় এল।

...বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো কিছু পাওয়া যায়না যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এদেশে আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদী বংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নিচে পর্যন্ত পৌঁছায়নি এরা অল্প-কালের পরিসরে মাথা তুলে ওঠে তারপরে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্যে সেই জন্য একটা আপেক্ষিক শব্দমাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাতবংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। একথা সত্য এই স্বল্পকালীন ধনসম্পদের আত্মসচেনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে।...হয়তো এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের—জমিদারী প্রথার ওপর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না।

এরপর নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন "এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে অন্ততঃ আমাদের কালে একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনদিন বড়োলোকের প্রহসন অভিনয় করিনি। অতএব আমার মনে যদি কোনও স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ পড়ে থাকে তা বিত্তপ্রাচুর্য কেন, বিত্ত সচ্ছলতারও নয়।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধনী সামন্ত আর সাধারণ মানুষ স্বতন্ত্র কিছু নয়—কোনও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব বশতঃ যে তিনি অভিজাতদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন তা নয়। তাই প্রথমেই তাঁর নিজের গল্পগুচ্ছের কথা মনে হয়েছে কারণ গল্পগুচ্ছের বেশ কিছু সংখ্যক গল্প অভিজাতদের নিয়ে লেখা অথচ তখন সর্বত্র সাহিত্যে মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি চলছে।

তাই লেখক আগে থেকেই সচেতন হয়ে বলেছেন—"আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছে বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে।"

অথচ আমরা জানি গল্পগুচ্ছর রচনাকালেই রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসবার সবচেয়ে বেশি সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল জমিদারী কার্যোপলক্ষে। কবি তখন শিলাইদহ পাবনা পতিসর অঞ্চলের

বিস্তীর্ণ জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভার পেয়েছেন। অর্থাৎ ভাবলোক থেকে কবি নেমে এসেছেন বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকায়। কাজেই পদ্মানদীর ওপরে দীর্ঘ দশবছর নৌকাবাসের ঘটনা তাঁর ব্যক্তি জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। সাধারণ ক্ষেত্রে জমির সঙ্গে যাঁদের যোগ থাকেনা তাঁরাই হন জমিদার। কিন্তু কবির ক্ষেত্রে হল ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। তাঁর জমিদার পরিচিতি যদিও সাধারণের থেকে তাঁর দূরত্ব এনে দিল—কিন্তু ঐ সময়ে তিনি পদ্মানদীর তীরে তীরে অসংখ্য জনপদ ও তার মধ্যে কারা দুঃখী মানুষ, সংগ্রামী মানুষ, কর্মী মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সুখদুঃখ ভালমন্দ আশা নিরাশার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং মনে মনে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে এই সময়ে তাঁর চেনা বহু চরিত্র সেই সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতি ও সামাজিক মানুষের বহু বাস্তব জীবন সমস্যা রূপ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'পল্লী প্রকৃতি' গ্রন্থে সংকলিত শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করি—

"পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম বয়সে পাইনি। এইজন্য যখন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হতে হল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। জমিদারির কাজকর্ম হিসাব পত্র খাজনা আদায় জমাওয়াশীল এতে কোনো কালেই অভ্যস্ত ছিলুম না। তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল।

কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল। যখন আমি জমিদারীর কাজে প্রবৃত্ত তখন তার জটিলতা ভেদ করে রহস্য উদঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা করে যে সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম তাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন কি পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্যে।

আমি কোনদিন পুরাতন বিধি মেনে চলিনি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তাঁরা জমিদারীর কাগজপত্র এমনভাবে রাখতেন যা আমার পক্ষে দুর্গম। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম। তাতে ফলও হয়েছিল ভাল।

প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসতো। তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার ছিল অবারিত। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তার জন্যে কিছু করার এই আকাংক্ষা আমার মন ছটফট করে উঠেছিল। তখন

আমি যে জমিদারী ব্যবসায় করি, নিজের আয়ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত কেবল বণিক বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্ত লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল।"

এই উক্তি থেকে একথাটা সহজেই অনুমান করা চলে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিত্বের জন্য গর্বিত ছিলেন না বরং ছিলেন লজ্জিত এবং ঐশ্বর্যের বনেদীয়ানা যে চিরস্থায়ী নয় এ বিষয়েও ছিলেন সচেতন। তাই তাঁর—রচনায় ধনী অভিজাতদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব আছে, এ কথা মনে করা যেমন ভুল সেই সংগে জমিদারতন্ত্রের ক্রম বিলীয়মানতার জন্য অন্তরে কোনও বেদনা অনুভব না করাও তেমনি স্বাভাবিক। অন্ততঃ এই উক্তি যদি সত্যভাষণ হয় এবং সামন্তদের প্রতি এই পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভংগীর জন্যই হয়তো জমিদার চরিত্রের দোষ ত্রুটি তাঁর রচনায় বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। কালান্তর প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত রায়তের কথা নিবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর রায়তের কথার ভূমিকা বিশেষ। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধটির আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলিকে পরে পর্যালোচনা করা হবে।

এক্ষণে গল্পগুচ্ছের পুনরালোচনা করা যাক। গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত আরও যে কয়েকটি রচনায় সামন্ততান্ত্রিকতার চেহারা অল্পবিস্তর ফুটে উঠেছে সেগুলি হল 'হালদার গোষ্ঠী' 'সমস্যাপূরণ' 'মেঘ ও রৌদ্র' ইত্যাদি। গোঁসাই গঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার বংশ। জমিদার মনোহর লাল অপেক্ষা নায়েব নীলকণ্ঠ প্রজাশাসনে অনেক বেশি তৎপর। সুদের দায়ে প্রজাকে উচ্ছেদ করা জমিদারী রীতি ছিল। নায়েবরা মনিবের টাকা ভেঙ্গে নিজের পেট ভরাত কিন্তু নীলকণ্ঠের প্রতি জমিদারের অগাধ বিশ্বাস। চুরি করলেও নায়েবের প্রতি জমিদার বিশ্বাস হারাতেন না। বরং তাকে বাহাদুর মনে করে প্রশংসা করতেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে উক্ত গল্পে এই মন্তব্য করেছেন—

"অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই মনিবের বিষয় রক্ষণ করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়াতো জমিদারির কাজ চলে না।"

জমিদারের প্রজা নিগ্রহেরও একটি ক্ষীণ চিত্র তিনি এঁকেছেন। ভিটাবাড়ির প্রজা অর্থাৎ খোদ বাস্তু বলে মধু অন্য প্রজাদের মত পালাতে পারল না। ফলে সমস্ত দেনার বোঝা তার উপর চাপল।

অবশ্য এই সকল জমিদারী অত্যাচারের হাত থেকে প্রজা আইনের দ্বারা রেহাই পেত যদি কিনা তার মামলা করার মত ক্ষমতা থাকে। জ্যেষ্ঠপুত্র বনোয়ারীর বলে বলী হয়েই প্রজা মধুকৈবর্ত থানায় খবর দিল এবং পুলিশ নীলকণ্ঠ

ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান করল।

কিন্তু ঘুষের সাহায্যে জমিদার পক্ষের মামলা চললেও প্রজাপক্ষেরই হার হল। নীলকণ্ঠ জেলে গেল এবং হালদার গোষ্ঠীর মূর্তিমান ব্যাতিক্রম বনোয়ারী-লালের চেষ্টাতেই তা হল।

এই সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—"অন্তত বটে এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়োবাবু জন্মিয়াছে এবং কোনো দিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয় ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়োবাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশ গৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই।" পরস্পর একতার অভাবে, প্রতিবেশী জমিদারদের নিকট অন্য জমিদারের দুর্গতির সংবাদ যে কত মুখরোচক ছিল—ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমিদার অখিল মজুমদারের নাকাল হওয়ার সরস বর্ণনায় সে কথার উল্লেখ আছে। আবার অন্য প্রতিযোগী ও সমতুল্য জমিদারের কাছে জমিদারী হস্তান্তরের যে রীতি ছিল বনোয়ারী উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে তা কার্যকরী করতে চেয়েছিল। পরে অবশ্য ঘটনার মোড় ফিরে যায়।

সমস্যাপূরণ গল্পের সূত্রপাত হয়েছে জমিদার পরিবারের পরিচিতির মধ্য দিয়ে। ঝিকড়াকোটার জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকার একজন আদর্শ জমিদার। কিন্তু তাঁর পুত্র শিক্ষিত সচ্চরিত্র কিন্তু জমিদারী খাজনা আদায়ের ব্যাপারে পিতার মত উদার হৃদয় নন। অর্থাৎ বহু প্রজার খাজনা ঋণ মকুব করা কিম্বা ব্রাহ্মণকে নিষ্কর জমি দান করা এই সব বিষয়কে তিনি প্রশ্রয় দেন না। বরং জমিদারীর আয় বৃদ্ধির দিকে বেশী মনোযোগী হয়ে উঠলেন যাতে এক পয়সাও ছাড়া না হয়।

কিন্তু প্রজাও যে অনেক সময় প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে—অছিমদ্দির আচরণে তার প্রমাণ আছে। জমিদারের সঙ্গে প্রজার মামলা বেঁধে ওঠে। পরে অবশ্য কাহিনীর গতি অন্য দিকে গেছে যদিও অছিমের জনক হিসাবে কৃষ্ণগোপালের দুর্বলতা জমিদারীর মেজাজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিপরায়ণতাকেই প্রকট করেছে।

গৃহপ্রবেশ গল্পটি একটি অসুস্থ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে লেখা হলেও জমিদারের প্রজাশোষণের ইঙ্গিত তাতে আছে।

মেঘ ও রৌদ্র গল্পের নায়িকা গিরিবালার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন "গিরিবালার পিতা হরকুমার এককালে নিজগ্রামের পত্তনিদার ছিলেন। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবি পদ গ্রহণ করিয়াছেন যে পরগণায় তাঁহাদের সেই পরগণাই নায়েবি সুতরাং তাঁহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।"

পূর্বে কথিত পত্তনিদারের উদ্ভব এবং জমিদারী হস্তান্তর ইত্যাদির ইঙ্গিত এতে আছে।

প্রজার সঙ্গে নায়েবের সম্পর্ক কোনদিনই ভাল হয় না। অবাধ্য প্রজাকে শাসন করাই যেন নায়েবের কাজ এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবিতে নালিশ রুজু করা তাঁদের উদ্দেশ্য।

এই ভাবে প্রজা ও জমিদার তথা নায়েবের সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। আবার অন্য জমিদায়কে জব্দ করার চেষ্টাতেও তারা যে কত কুশলী শশিভূষণের সঙ্গে ব্যবহারে তারও ঈষৎ ইঙ্গিত আছে। অবশ্য শশিভূষণ জমিদার কিনা তার উল্লেখ না থাকলেও তারও প্রজা আছে এবং তাদের খাজনা দেওয়া কিভাবে বন্ধ করা হল সে কথার উল্লেখ আছে।

উপন্যাসের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রপাতেই ঘোষাল ও চাটুয্যেদের চিরকালীন বিরোধের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন জমিদারী লড়াইকে প্রকট করে তুলেছেন।

অবশ্য দুই জমিদার বংশের ইতিহাস ভিন্নতর। নূরনগরের চাটুয্যেরা অর্থাৎ নায়িকা কুমুদিনী ও তার দাদা বিপ্রদাস যে বংশোদ্‌ভূত তারা খানদানী বনেদী জমিদার।

এককালে তাদের বিরাট জমিদারী ও তালুক মুলুক ছিল। সেই সংগে ছিল জমিদারের আভিজাত্য বোধ। কুমুদিনী এবং বিপ্রদাসের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মজ্জায় মর্জ্জায় মিশে গেছে। সেই সঙ্গে ঘোবাল বংশের সঙ্গে বিরোধ।

কিন্তু ঘোষাল বংশীয় মধুসূদনের বংশমর্যাদা ছিল না অর্থাৎ সে পুরুষানুক্রমে জমিদার নয় হঠাৎ বা এক পুরুষের জমিদারী। মধুসূদন মুহুরির সন্তান। কিন্তু ব্যবসায়ী বুদ্ধির দ্বারা সে নিজের বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছে—সেই সঙ্গে প্রচুর জমিদারীও ক্রয় করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে মধুসূদন রাজ খেতাব পেয়েছে।

আর নূরনগরের প্রসঙ্গে বলেছেন "নূরনগরের চাটুজ্যেদের অবস্থা এখন ভাল নয় ঐশ্বর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে।...সে প্রতাপ নেই, আয় নেই, ব্যয় বেড়েছে চতুর্গুণ। শতকরা ন টাকা হারে সুদের ন পা ওয়ালা মাকড়সা জমিদারীর চার দিকে জাল জড়িয়ে চলেছে।"

স্পষ্ট বোঝা যায় চাটুয্যে ও ঘোষাল পরিবারের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়তি জমিদার ও হঠাৎ জমিদারের পার্থক্যই তুলে ধরেছেন। ইংরেজ

প্রবর্তিত আইনের চালে যে নূতন এক জমিদার শ্রেণী তৈরী হয়েছিল মধুসূদন সেই শ্রেণীতে পড়ে। চরিত্রধর্মের দিক থেকে এরাই ছিল শোষক, অত্যাচারী এবং অমানুষ জমিদার। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না।

মধুসুদনের ধনলোভ ও পশুসুলভ বর্বরতার সঙ্গে কুমুদিনী কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। কারণ তার দেহের নীলরক্ত এই হঠাৎ বড়লোকের অর্থদম্ভের কাছে সহজে নতি স্বীকার করেনি। বনেদী জমিদার চাটুয্যেদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—পুরোনো ধনী ঘরে পুরাতন কাল যে দুর্গে বাস করে তার পাকা গাঁথুনী। অনেক দেউঁড়ি পার হয়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুকতে হয়। তাদের জমিদারী চাল সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন—ধন বোঝা হয়ে মাথায় চড়েনি পাদপীঠ হয়ে আছে পায়ের তলায়। এদের শৌখিনতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য খাসদরবারে ভোগবিলাস দুই খুব টানা মাপের—একদিকে আশ্রিত বাৎসল্যে যেমন অকৃপণতা আর একদিকে ঔদ্ধত্য দমনে তেমনি অবাধ অধৈর্য।

এইভাবে প্রকৃত বনেদী জমিদার চরিত্রের পূর্ণ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ চাটুয্যে পরিবার প্রসঙ্গে দিয়েছেন। কিন্তু জমিদার চরিত্রের হালচাল, প্রকৃত জমিদার ও হঠাৎ জমিদারের চরিত্রগত ও বংশগত পার্থক্য এবং জমিদারে—জমিদারে লড়াই বর্ণনা করলেও সমগ্র জমিদারী প্রথার সমালোচনা তিনি করেননি কারণ দুই জমিদারের বিরোধকে তিনি এক নবজাতকের আবির্ভাবের মাধ্যমে মীমাংসিত করতে চেয়েছেন এবং সেইখানেই হয়েছে যোগাযোগ নামকরণের সার্থকতা।

যোগাযোগ, হালদার গোষ্ঠী ও ঠাকুর্দা গল্পের মূল বিষয়বস্তুকে পাশাপাশি রেখে বলা চলে—যোগাযোগে জমিদারী রক্তের বংশাভিমান মধুসূদন কুমুদিনীর সংঘাতকে জটিলতর করেছে। মধুসূদন জমিদারী আত্মদম্ভের মূর্ত্ত প্রতীক যার কাছে মানুষের ব্যক্তিহৃদয় হয় অপমানিত। এবং এই আত্মদম্ভের মূলে আছে বর্ত্তমানের ঐশ্বর্য আতিশয্য। অতএব এ অহংকার অর্থকৌলীন্যের।

ঠিক বিপরীত ভাবে বলা যায় হালদারগোষ্ঠী সামন্ততন্ত্রের সেই চিরন্তন অহংকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ। কুমুদিনীতে যা ছিল অসম্পূর্ণ হালদার গোষ্ঠীর বড় ছেলে বনোয়ারীলালে রবীন্দ্রনাথ তাকে দিয়েছেন পূর্ণতা।

আবার আর এক দিকে আছেন নয়ানজোড়ের ঠাকুর্দা। মধুসূদন যেমন ঐশ্বর্য্যের অহংকারে স্ফীত ঠাকুর্দা সেই ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হয়ে অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর বাইরে অতীতের গালগল্পে চাপা দিয়ে রাখেন বর্ত্তমানের শূণ্যগর্ভ অবস্থাকে। ফলে লোকের চোখে নিজেকে বড় করার ব্যর্থ চেষ্টায় তিনি হন উপহাসাস্পদ।

# প্রমথ চৌধুরী

পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রমথ চৌধুরীর ‘রায়তের কথা’ প্রবন্ধের একটি দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে সেই ভূমিকার বিষয়বস্তু দিয়ে আলোচনা না করে স্বতন্ত্রভাবে প্রমথ চৌধুরী পর্যায়ে সে বিষয়টি আলোচনা করা গেল। রায়তওয়ারী ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মতামত যৌথভাবে জানা যাবে—এই কারণেই পৃথক ভাবে অধ্যায় রচনা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রথমে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মূল বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক।

প্রমথ চৌধুরী প্রথমেই বলেছেন—“রায়তের ভাবনা ভাবা বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে যে অনধিকার চর্চা নয় এর ভালো ভালো নজির আছে। বাঙালির মধ্যে যে শ্রেণীর লোকেদের আমরা গুরু বলে মান্য করি তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথার ব্যথী এবং সে কথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন।” এবং উক্ত প্রবন্ধে লেখকের শেষ কথা হল—

“সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালি সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের কো-অপারেশনের প্রয়োজন আছে—বিশেষতঃ যখন বাংলার বেশির ভাগ জমিদার হিন্দু, আর বেশির ভাগ রায়ত মুসলমান।

এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জমিদার ও প্রজার পারস্পরিক সম্পর্ক তথা জমির উপর তাদের অধিকার পূর্বে কি ছিল পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কি করা হল এবং কেনই বা এই বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিল সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্র আলোচনা এবং এই বন্দোবস্ত কতটা কার্যকরী হতে পেরেছে বা এর কল্যাণকর দিক কিছু আছে কিনা সে সম্পর্কেও তিনি সমালোচনা করেছেম অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিবৃত্ত সাধারণের সামনে উপস্থিত করেছেন। অত্যন্ত সহজ ভাষায় তিনি পূর্বাপর যে সব বৃত্তান্ত দিয়েছেন তার মূল কথা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে ঘোর অরাজকতা ঘটেছিল—সেই অরাজকতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে—ইংরেজরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করলেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সে যুগের নবাবী অত্যাচার ও বর্গি হাঙ্গামার বিশদ চিত্র পাওয়া যায়। যাই হোক এই বন্দোবস্ত সাময়িকভাবে করা হলেও জমিদারের কপালজোরে এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

প্রমথ চৌধুরীর লেখা থেকে জমিদার সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হল বাদশাহী আমলে জমিদার বলে বিশেষ শ্রেণী কিছু ছিল না—এবং তাদের অধিকারও ছিল সীমিত। প্রমথ চৌধুরীর কথায় বলা যায়—"জমির উপর যে তাদের উক্ত রূপ স্বত্ব আছে - একথা সেকালে কোনো জমিদারও দাবি করেন নি। কেন না তাঁরা জানতেন যে রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না এবং বাংলার নবাব ও দিল্লীর বাদশা এ'দের ভিতর যাঁর খুশি তিনিই যখন তখন জমিদারের গালে চড় মেরে তাঁর জমিদারি কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদকুলি খাঁ কিছুদিন পূর্বে বাংলার প্রাচীন ভূমধ্যাধিকারীদের নির্বংশ করে নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।"

জমিদাররা এক ধরনের ট্যাক্স কালেকটর ছিলেন অর্থাৎ বেতন ভোগী নন এইমাত্র। এবং তাঁরা ট্যাক্স আদায় করেন না—করেন খাজনা আদায়।

সেই অবস্থাতেই কোম্পানীর কর্তারা ঠিক করলেন যে জমিদারেরা যদি ভূম্যাধিকারী নাও হয় তো আইনতঃ তাঁদের তা হতে হবে। স্যার জন শোর ও লর্ড কর্ণওয়ালিস এই বন্দোবস্তের দুই পুরোধা। তবে জমির ওপর জমিদার ও রায়তের অধিকারের ব্যাপারটা তাঁদের খুব গোলমেলে ঠেকেছিল। কারণ ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকে জোত জমির ওপর প্রজার কতকগুলি বিষয়ে অধিকার পাকা হয়েই ছিল। জমিদার তার ওপর হস্তক্ষেপ করতেন না। অর্থাৎ জমিদার ও রায়তের ছিল মিশ্র অধিকার। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় "বাংলার প্রজা বাংলার জমির উপর তার চিরকেলে সত্ব-স্বামিত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাংলার জমির নির্ব্যূঢ় স্বত্বাধিকারী জমিদার নামক আর এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল যতদিন ষ্টেটের সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গে রায়তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে। এ দাবি অপূর্বও নয় অদ্ভুতও নয়। তাঁর মতে জমি চাষ যে করে জমি তারই হওয়া উচিত।

টেনান্সি এ্যাক্ট সম্পর্কে লেখকের অভিমত হল টেনান্সি এ্যাক্ট আজকের দিনে জমিদারদের হাতে সঙ্গীন অস্ত্র। প্রজাকে হয়রান করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও তো করো উচ্ছেদের মামলা, স্বত্বের মোকর্দ্দমা, জমার বৃদ্ধির নালিশ, ফসল ক্রোকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাকি খাজনার নালিশ। আর তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চাওতো করো তার নামে বাকিপড়া ও খাস দখলের নালিশ।

তবে জমিদাররা বেশিরভাগ আইনের মার রায়তদের মারেন না—তাই প্রজারা টিকে থাকে। তবে সরকারী কর্মচারীদের কাছে জমিদাররা সর্বদা সুবিচার পান না। তাঁদের বিত্তভোগী উকিল মোক্তাররা দরিদ্র প্রজাদের সহায় নন—জমিদারেরাই তাদের মক্কেল। তাই সরকারের আনুকূল্যে প্রজারা অনেক সময় রক্ষা পায়। ফলে প্রজারা সরকারের দাস হয়েই থাকে। দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দাসত্বই বাংলার প্রজাদের ভূষণ।

প্রমথ চৌধুরী নিজে জমিদার বংশীয়, এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনেরাও অধিকাংশ জমিদার অতএব জমিদার পক্ষকেই তাঁর সমর্থন করা উচিত। সেই হিসেবে তিনি বলতে পারেন যে সকল জমিদারই অর্থলোভী নয়। বরং আয় বাড়ানোর চাইতে ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্প্রদায়ের ঝোঁক বেশি।

সামন্ততান্ত্রিকতার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রমথ চৌধুরীর রচনায় এই ভাবে ধরা দিয়েছে এবং সাহিত্যে এই প্রজাদের কথা দিন দিন আরও বেশি করে আলোচিত হবে এইটিই ছিল তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস।

প্রমথ চৌধুরীর উক্ত রচনার সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন আর এক রায়তের কথা। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে প্রজার দুঃখ দুর্দশার বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার চর্চাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁর প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাতে পুলকিত নন এই কারণে যে তার মধ্যে যথার্থ সত্য নেই—ইংরেজী সাহিত্যের নকল নবিশী আছে। কারণ আমরা সব ব্যাপারে য়ুরোপীয় সাহিত্যের পদাংক অনুসরণ করতেই অভ্যস্ত। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে মহাজনকে লাগাও বাড়ি। জমিদারকে ফেলো পিষে। তখন বুঝতে পারলুম এই লাল মুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকল নৈপুণ্যের নাট্য-ম্যাজেণ্টা রংয়ে ছোপানো।"

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে সাহিত্যে সমাজের ওপর তলা থেকে নিচে নেমে আসতে আমাদের বহু ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে। অর্থাৎ সমাজে যেমন সাহিত্যেও তেমনি সামন্ততন্ত্রের একচেটিয়া অধিকারকেই সাহিত্যিকরা চিরকাল মেনে নিয়েছেন এর ব্যতিক্রম তাঁদের কাছে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। তবে রাজনীতি বা অর্থনীতিতে রাজা প্রজার অধিকারের ভেদ-রেখা সম্পর্কে মানুষ ক্রমশঃ যখন সচেতন হয়েছে এবং নতুন নতুন আইনে জমিদার ও প্রজার স্বত্বস্বামিত্বের নব নব পরিবর্তন দেখা দিল ফলে ক্রমশঃ জমিদার শ্রেণীর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য সীমিত হয়ে উঠল—জমিদাররাও

সাধারণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে চিরকাল ধরে জমিদারী শাসন শোষণ ও অত্যাচারে প্রজারা যখন বিক্ষুব্ধ ও আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে তখনই রাজায় প্রজায় লড়াই বেঁধেছে। ফলে দেখা গেছে অনেকের রচনায় জমিদার বংশেরই কোনও মানবতা বাদে উদ্‌বুদ্ধ সন্তান প্রজাদের নেতৃত্ব নিয়েছে এবং প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় আত্মোৎসর্গ করে স্বীয় দেহের নীলরক্তের প্রায়শ্চিত্ত করেছে এই ভাবে। আদর্শবাদী জমিদার ও সংগ্রামী প্রজা একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে যে নতুন জগৎ রচনা করেছেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে এক পরিবর্তন অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র ও সাম্যবাদ তথা কম্যুনিজমের এক অপূর্ব সন্ধিযুগ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও রায়তের মাঝখানে এক মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্‌ভব কেবল প্রজা অর্থাৎ চাষী মজুর নয় সেই সংগে মধ্যবিত্তরাও সাহিত্যে প্রধান হয়ে উঠেছে।

এই ভাবে রাষ্ট্র ও সমাজে সামন্ততান্ত্রিকতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও জমিদার নায়কত্বের যবনিকা পড়ল।

তবু প্রথমদিকের এই সংঘাত যে কয়েকজন লেখকের রচনায় স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে প্রধানতম।

কারণ হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর মত তিনিও নিজের স্বাভাবিক জমিদারী আত্মাভিমানের দোহাই দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে সামন্ততন্ত্রের প্রাধান্য মেনে নেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি কৈফিয়ৎ দিয়ে প্রথমে বলেছেন—"আমি নিজে জমিদার এই জন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তাহলে দোষ দেওয়া যায় না ওটা মানবস্বভাব।

পরে জমিদারের আসল পরিচিতি উদ্ধার করে তিনি বলছেন যে আসল জমিদারী ব্যাপারটাই একটা মস্ত ফাঁক—কারণ জমিদার যিনি অর্থাৎ প্রজার কাছে যিনি রাজা স্বরূপ তিনি আসলে ইংরেজ সরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা।

এই জমিদারী ছাড়তে হলে অপর আর একজন তেমনি জমিদারকেই দিতে হয় আবার জমি প্রজাকে দিলেও নতুন নতুন ছোটো জমিদারের আবির্ভাব ঘটবে। অতএব জমি যে হাতেই যাক সেখানেই বিপত্তির সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারের পক্ষ সমর্থন করে বলেছেন জমি বিক্রয় এবং হস্তান্তরের ফলে জমি যেমন খণ্ড খণ্ড হয় তেমনি জমিদার ও প্রজার মধ্যে বহু মহাজনের সৃষ্টি হয়। জমিদারের চেয়ে এই মহাজনদের অত্যাচার আরও বেশী।

এবং এ কথাও তিনি বলেছেন যে বহু জমিদার নিষেধ আইনের সাহায্যে বহু রায়তকে রক্ষা করেছেন। নীলকরদের অত্যাচার থেকে অর্থাৎ নীলকর যখন

ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টায় ছিল তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ নীলদর্পণে ইংরেজদের অত্যাচারে জমিদার ও প্রজাদের সমান দুর্দশা-ভোগ করতে দেখানো হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যাবুদ্ধিহীন রায়তেরাও ধনবৃদ্ধির দ্বারা জমিদার শ্রেণীভুক্ত হয়ে ওঠে। এই শ্রেণীর নবগঠিত জমিদারদের প্রজাপীড়ন আরও শোচনীয়।

জমিদার নির্লোভ নন, একথা রবীন্দ্রনাথ মানেন, তিনি বলেন আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব এবং রায়তের—জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয় একথা তিনি স্বীকার করেন কারণ সরকারের কাছে জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি না হলে জমিদারের ইচ্ছায় রায়তেরই বা জমা বৃদ্ধি পাবে কেন? এবং ভূমির উপর প্রজার স্বত্বও তিনি আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছেন।

নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি যে বলেছিলেন—"আমার জন্মগত পেশা জমিদারি কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি।" সেই হিসেবেই রাজা প্রজার বিরোধ মেটাতে হলে তিনি মনে করেন—কোনো আইনের দ্বারা তা সম্ভব নয়—এর জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তি অর্জন।

জমিদারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই স্বভাবসিদ্ধ অনীহা—অবশ্যই সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব নয় কারণ জমিদার প্রজা সম্পর্কে নানাবিধ সমস্যা নিয়ে ভাবতে দেখা গেছে রবীন্দ্র-পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকেও। ঠাকুর পরিবারের অন্যতম বংশধর সুবিখ্যাত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দ্বারকানাথ স্বয়ং জমিদার হয়েও প্রজাদের দুর্দশা মোচনের জন্য কতদূর উৎকণ্ঠিত ছিলেন লেখক যথাযথ তথ্যসহ তা প্রমাণিত করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে—দ্বারকানাথের পরম সুহৃদ রামমোহন তাঁর সহায়তা করেন।

সৌমেন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকায় এক জায়গায় লিখেছেন অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে চাষীর খাজনার হার বেঁধে দেওয়ার দাবী জানান রামমোহন। চাষীদের উপর জমিদারদের অত্যাচার যে কত নির্মম ছিল তার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেছিলেন The condition of the cultivators is very miserable, they are placed at the mercy of the Zamindars' avarice and ambition......the land-lords have met with indulgence from Government in the assessment of their revenue while no part of it is extended towords the poor cultivators."

শুধু তাই নয় পেশাদার স্থায়ী সৈন্যদের পরিবর্তে চাষীদের অস্ত্র ব্যবহার করবার শিক্ষা দিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করার প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে অধিকতর ক্ষমতা দেবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

দ্বারকানাথ সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তিনি ল্যাণ্ড হোলডার্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু প্রজাদের অধিকারের কথাও সেই সঙ্গে চিন্তা করা হয়েছিল।

সেই সময়টা ছিল বাংলাদেশে নীলকর সাহেবদের আধিপত্যকাল। ধানের জমিতে নীলচাষকে বাধ্যতামূলক করার মূলে জমিদার, প্রজা এবং নীলকরদের পৃথক পৃথক মনোভাব ব্যক্ত করে—দ্বারকানাথ এক বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং—স্বাক্ষর করেছিলেন "একজন জমিদার"।

সেই বিবৃতিতে তিনি এ দেশীয় বন্ধুদের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের প্রয়াস পেয়েছেন। টাউনহলের এক মিটিংয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে সকল মানুষের—ধারণা কি ছিল সে বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন যে—"টাউন হলের সভায় স্থিরীকৃত আবেদনের শেষ উদ্দেশ্য হল এ দেশীয় জমিদারদের তাদের জমিদারী থেকে বঞ্চিত করা এবং ইয়োরোপীয়দের এ দেশে ভূসম্পত্তি দেওয়া।

এই শ্রেণীর লোকেদের দ্বারকানাথ দেশের শত্রু বলে বর্ণনা করেছেন কারণ তাঁরা প্রকৃত পক্ষে চাষীদেরই ক্ষতি সাধন করেছেন। লেখক সৌমেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের দূরদর্শিতার উচ্চ প্রশংসা করে যে কথা বলেছেন তার সারমর্ম গ্রহণ করে বলা যায় যে—নীলকর অত্যাচারের এক বীভৎস স্মৃতি আমাদের মনে জাগরূক করার মূলে সে কালে জমিদাররাই ছিল প্রধানতঃ দায়ী এবং এর পিছনে তাদের প্রজা দরদ কতটা ছিল জানা যায়না তবে স্পষ্ট বোঝা যায় তাদের ব্যক্তি স্বার্থে আঘাত লাগার জন্যই তারা নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনীকে পল্লবিত করে প্রচার করার মূলে ছিল প্রজাদের সমর্থন পাবার চেষ্টা।

আসল কথা নীলকররা প্রথমদিকে চাষীদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মজুরি বিতরণ করে তার বিনিময়ে তাদের দিয়ে নীলচাষ করিয়ে নিত। ফলে চাষী ও প্রজা তথা মধ্যবিত্তশ্রেণী ছিল খুশী। কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়, বিনা মজুরিতে বেগার খটোনোতে বাধা পেতে লাগল জমিদার শ্রেণী। ধানচাষ করলে তাদের যে সুবিধা ছিল নীল চাষে সে সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হতে লাগল। সেই কারণেই বাংলা দেশের মাটিতে নীলচাষের অপ্রযুক্ততা, নীলকর সাহেবদের মুনাফালোভী চেহারা ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে তাঁরা জনগণকে

ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলেন এবং তাঁদের এই উত্তেজনা সৃষ্টির নাম হল দেশহিতৈষণা।

অবশ্য নীলচাষীরা অত্যাচার যে করেন নি তা নয়, কারণ মুনাফা করতে গেলেই অত্যাচার, লুণ্ঠন করতে হয় সে সকল খোরের বেলাতেই সমান। জমিদাররাও প্রজাদের কাজ থেকে খাজনা আদায়ের কম অত্যাচার করতেন না। কিন্তু যেহেতু নীলকরদের অধীনে প্রজা চাষীরা কিছুটা আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করে জমিদারের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল জমিদারশ্রেণী তাতে বাধ সাধলেন। এবং অজ্ঞ, অশিক্ষিত প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলে নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুললেন। তার ফল হল আরও ভয়ানক। নীলকরদের অত্যাচার নারকীয় বর্বরতায় পর্যবসিত হল। অবশ্য প্রজা জমিদার কেউই সে সে অত্যাচার থেকে বাদ গেল না।

এই অত্যাচারের চিত্রই অনেক পরে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে জ্বলন্ত ভাষায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু নীলদর্পণের পূর্বভূমিকা কিভাবে প্রস্তুত হল তারই যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়েছেন দ্বারকানাথ অনেক আগেই। এই কারণেই লেখক সৌমেন্দ্রনাথ তাঁর দূরদর্শিতার তারিফ করেছেন।

অতএব স্বয়ং জমিদার হয়েও যে দ্বারকানাথ জমিদার শ্রেণীর হীন স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন তাতেই তাঁর মানবতা বিশেষ ভাবে প্রকট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবতাবোধ হয়তো এই উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন কিন্তু নীলকর অত্যাচার সম্পর্কে তাঁর মতবাদ কিন্তু তাঁর পিতামহের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কারণ রবীন্দ্রনাথ বনেদী জমিদারদের বদান্যতাকে অস্বীকার করেননি এবং স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে বহু জমিদার নীলকরদের অত্যাচার ও ঋণের ফাঁস থেকে বাঁচিয়েছেন এ ঘটনা অমূলক নয়।

অর্থাৎ বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সামন্ততন্ত্রের ধারণা তাঁর পিতামহের থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর বিচার দৃষ্টি ছিল মানবতাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, আর দ্বারকানাথ বাস্তবজ্ঞান ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন সামন্ততন্ত্রের কাঠামোকে। তাই নীলকরের অত্যাচার থেকে কোন্ জমিদার কোন্ প্রজাকে বাঁচাল তা তিনি দেখেননি দেখেছেন সামন্তশ্রেণীর স্বার্থপরতার জন্যই একদিন বাংলাদেশে নীলকর অত্যাচারের আগুন বাংলাদেশে ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছিল।

প্রজাদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের আক্রোশের শিকার হবার ইন্ধন জুগিয়েছিল জমিদারেরাই। হয়তো পরে প্রজাদের রক্ষা করে—নিজেদের মহত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন সেই জমিদারদেরই কেউ কেউ

সমাচার চন্দ্রিকাই ছিল সেযুগের জমিদারদের স্বার্থরক্ষার মুখপাত্র। তাতে মাঝে মাঝে প্রজাদের জন্য যে সব দরদী কথাবার্তা প্রকাশ পেত তার সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ বলেছেন যে সে সব ছিল মেকী কান্নার নামান্তর। একথা বলেছেন সৌমেন্দ্রনাথ এবং তারই বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ জনৈক নিরপেক্ষ জমিদার নামে।

# শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র জীবন ও সাহিত্য পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে সামন্ততন্ত্রের কোন চেহারা সেখানে ধরা দিয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের জীবনীকারেরা যে পরিচয় দিয়েছেন তার থেকে জানা যায় শরৎচন্দ্রের পিতামহ ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা পুরুষ। একজন অত্যাচারী জমিদারের বিরূদ্ধাচরণ করার ফলে তিনি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে তাঁর মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় গাঙের ঘাটে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়

এর থেকে একটা জিনিষ অনুমান করা যায় যে শরৎচন্দ্রের পিতামহ ছিলেন তেজস্বী লোক—সত্যের জন্য লড়াই করার স্পর্ধা যাঁর ছিল। শরৎচন্দ্র তেমনি প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ না করলেও তাঁর লেখনী অস্ত্রে তথাকথিত অত্যাচারী শোষক সম্প্রদায়কে আক্রমণ করেছেন অত্যাচারিত মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে নালিশ জানিয়েছেন বিধাতার আদালতে।

তবে সমগ্র জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে, তাঁর আক্রোশ নয়—জমিদার মাত্রেই খারাপ একথা তিনি কোথাও বলেন নি বরং হয়তো ব্যক্তিজীবনে বহু সদাশয় জমিদারের আনুকূল্য লাভ করার ফলে জমিদার সম্পর্কে খুব বিরূপ ধারণা তিনি পোষণ করতেন না। কিন্তু তাঁর বিদ্বেষ ছিল অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। সে শোষক জমিদার থেকে তাঁর নায়েব গোমস্তা এমনকি অধঃস্তন কর্মচারী দারোয়ান পর্যন্ত যে কেউ হতে পারে।

সম্ভবতঃ তাঁর ধারণা ছিল জমিদার ব্যক্তি হিসাবে সর্বদাই খুব মন্দ হন না—জমিদারের মধ্যে ভালমন্দ দুইই থাকে। ভাল জমিদারের কাছে হয়তো প্রজা সুবিচার ও দয়াও পায় কিন্তু সে দয়ালাভের পক্ষে বিরাট অন্তরায় জমিদারের কর্মচারীরা। তারাই প্রজা ও জমিদারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার মূল কারণ। জমিদারের প্রধান ত্রুটি তিনি নায়েব গোমস্তার হাতেই জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন প্রজার দুঃখ দুর্দ্দশার সংবাদ রাখেন না। তাঁর কর্মচারী যে সংবাদ তাঁর কর্ণগোচর করেন, তিনি তাতেই আস্থাবান, তাঁদের এই ঔদাসীন্যতাই তাঁদের প্রধান ত্রুটি।

কিন্তু সমগ্র জমিদারী ব্যাপারটাই যে প্রজা শোষণের মুনাফাতেই গঠিত সে কথাই শরৎ সাহিত্যে খুব কমই বিশ্লেষিত হয়েছে। তিনি মূল জমিদারী প্রথার সমালোচনা না করে ব্যক্তি বিশেষের ভাল মন্দের ওপর দিয়েছেন। অর্থাৎ

মানব দরদী লেখক মানবতার দৃষ্টি দিয়েই সব কিছু বিচার করেছেন। সাম্য-বাদের কথা বলছেন। কিন্তু সমগ্র জমিদারী ব্যাপারটাই যে অসাম্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সে দিক দিয়ে কোথাও আলোচনা করেননি। কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবিচার অন্যায়ের চিত্র রচনা করে তথাকথিত সর্বহারাদের প্রতি পাঠক সমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। তাই বলা যায় শরৎ সাহিত্যে সামন্ত তন্ত্রের একটা আংশিক রূপ মাত্র ধরা দিয়েছে—পূর্ণ আলোচনা হয়নি। তাঁর সাহিত্যে বহু জমিদারই মহৎ নিষ্কলঙ্ক। অসৎ চরিত্র জমিদার যে নাই তা নয় কিন্তু তার মধ্য দিয়ে জমিদারী প্রথার সমালোচনা কম হয়েছে। ব্যক্তি বিশেষের আলোচনাই সেখানে মুখ্য।

শরৎ সাহিত্য বিশ্লেষণ করে সামন্ততন্ত্রে সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট ধারণা দেবার আগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত মতামত একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

'শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত বাতায়ন পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের ছোট খাতার থেকে কতকগুলো অসংলগ্ন টুকরো কথার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ও তার অর্থনৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাঁর বিক্ষিপ্ত চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে।

সেখানেই এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—"পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট-এর জন্যই জমিদার, তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত মিডল্‌ম্যান, সমস্ত সমাজের ইকনমিক অবস্থাকে বাড়তে দেয় নি—কেবলমাত্র জমি আঁকড়ে থেকে শুধু কৃষকরাই যা কিছু দেশের ওয়েল্‌থ সৃষ্টি করেছে। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট না থাকার জন্যই ওদেশে ইণ্ডাস্ট্রির উন্নতি হচ্ছে জমি কেনা ও বেশি সুদে লগ্নি কারবার হচ্ছে বংলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।"

এই কথাগুলিতে প্রমাণিত হয় যে শরৎচন্দ্র পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সমর্থক ছিলেন না—কারণ এতে জমিদারেরই লাভ হয় তাদের ধন বাড়ে কিন্তু সমাজের উন্নতি হয় না। দেশের উন্নতি হয় না। তাই যেখানে পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট নেই যেখানে জমিদার নেই—সেখানে শিল্পেরও উন্নতি ঘটেছে। কেবল কৃষিনির্ভর দেশের ইকনমিক্ উন্নতি হয় না।

এ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের একটি ঘটনা থেকে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। একবার তিনি রূপনারায়ণের তীরবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামের এক ফৌজদারি দেওয়ানী মামলায় জড়িয়ে পড়েন। তারই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই মর্মে এক পত্র লিখে জানালেন যে—

বড় জমিদারের কাছে পার আছে কিন্তু স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র পত্তনিদারের চাপ

দুর্বিসহ। ২।৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান কিন্তু ২।৪ বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো-লেগে গেলাম।

জমিদার ও প্রজার মাঝখানে নবোদ্ভূত মধ্যস্বত্বভোগীদের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার জন্যই পল্লীগ্রামের পরিবেশ বড় জটিল।

মামলা ও বিবাদ এদের বাতাসে বাতাসে। বিরাট ধনী ব্যক্তি মোহিনী মোহন ঘোষাল জমিদারি কিনে নতুন জমিদার হয়েছেন। তিনি চিরকালের খাস জমিদারির খালের জলের উপর জলকর বিলি করে প্রজাদের অধিকারে বাদ সাধলেন। অর্থাৎ প্রজারা আগের জমিদারের আমলে এ খালের জলের মাছ ইচ্ছা-মত ধরে খেত।

কিন্তু উদীয়মান জমিদারের কাছে জমির আয়বৃদ্ধির ব্যাপারটাই বড় প্রজা স্বার্থ বড় নয়। সেইকারণে জলকর বিলি অব্যাহত রইল। ফলে প্রজাদের সঙ্গে জমিদারের পেটোয়া রাজবংশীদের সঙ্গে মারামারি লাগল। ফলে একই সংগে দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলা শুরু হল।

জমিদার শক্তিমান ব্যক্তি। কেবল অর্থবান নয়, পুলিস, দারোগা, আইন, আদালত সবই তাঁর সহায়। ফলে গ্রামের লোকেরা বিপদে পড়ল। শরৎচন্দ্রই অবশেষে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলতে সাহায্য করেন। শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীরাই জিতেছিল কারণ জমিদারদের খাস জায়গা শিবোত্তর—এই হিসাবে তাতে জলকর বিলি বন্ধ করা হয়েছিল। উপন্যাসেই শরৎ প্রতিভার পূর্ণবিকাশ এবং সেই উপন্যাসের মূলভিত্তি এই বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা।

বাংলাদেশের সমাজ মূলতঃ ভূমিকেন্দ্রিক ছিল। কারণ কৃষি আর জমিই এদের প্রধান অর্থনৈতিক বনিয়াদ। তার উপর নির্ভর করে পল্লীসমাজ জীবন ধারণ করে। প্রজারা ভূমির সম্পদ বাড়ায় আর জমিদার ও মহাজন শ্রেণী তার ফলভোগ করে।

জমিদার শ্রেণীর কথা যে সকল গল্প উপন্যাসে স্থানলাভ করেছে অথবা জমিদারি শোষণ এবং জমিদার চরিত্র যেখানে আলোচিত হয়েছে—শরৎসাহিত্য থেকে তাদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া চলে—যেমন বিপ্রদাস, বড়দিদি, অপ্রকাশিত উপন্যাস জাগরণ, দত্তা, শুভদা, পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা, চন্দ্রনাথ, অভাগীর স্বর্গ ও মহেশ।

পূর্বেই বলা হয়েছে জমিদারনামক বিশেষ শ্রেণীর বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অভিযোগ ছিল না—ছিল অন্যায় শোষণকারীর বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন তাদের দলের শরিক-

তা সে বঞ্চনা এবং শোষণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যে প্রকারেরই হোক। অভাগীর স্বর্গে দুলের মেয়ে অভাগীর স্বর্গলাভের পথে যেসব বাধা প্রধান হয়ে উঠেছে তার মধ্যে কেবল সমাজ তথা জাতিগত বাধাই একমাত্র নয়। অভাগী কেবল ছোট জাতির মেয়ে বলেই নয় অর্থ-কৌলীন্যের অভাবও তার স্বর্গলাভের অন্যতম বাধা যে কারণে জমিদারের নায়েব গোমস্তা থেকে হিন্দুস্থানী দারোয়ান পর্যন্ত অসীম ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে, তা কেবল বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে নয়—অবশ্যই অর্থ ও ক্ষমতার বলে। গ্রামের প্রজারা প্রায় ক্ষেত্রেই জমিদার ও তার কর্মচারীদের লোভের শিকার ছিল। বালক কাঙ্গালী মায়ের সৎকারের জন্য কাঠ চাইতে গিয়ে কেবল গলাধাক্কাই পায় নাই—তার চেয়েও নির্মম লাঞ্ছনা তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। হাতে পোঁতা গাছের ওপর দাবী জানাতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ফলভোগও করতে হল। অধর রায়ের নির্দেশে দারোয়ান পাঁড়ে এসে কাঙালীকে সজোরে গলাধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

একে অস্পৃশ্য দুলে জাত, তায় অশৌচ অতএব সে দাওয়ায় উঠলে সব কিছু অশুচি হয়—অতএব গোবরজল দিয়ে সেই জায়গাটি শুদ্ধ করতে হয়। কাঙালীর বেলায় হিন্দুসমাজের এই বিধি গোমস্তা অধর রায় মেনেছেন—কিংবা ছোট জাতের মড়ার কাঠের কি প্রয়োজন কারণ তাদের দাহ করার বিধি নেই—সেই নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু অভাগীর স্বর্গ গল্পে এইটিই শরৎচন্দ্রের একমাত্র বক্তব্য নয়। আসল কথা গোমস্তা অধর রায় কেবল সমাজপতি নন—তিনি একজন গোমস্তা। জমিদার স্থানান্তরে থাকেন—অতএব গ্রামের তিনিই সর্বেসর্বা। জমিদার স্বয়ং না থাকলেও তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার ও অন্যায় শোষণের জন্যই কাঙালী ঘণ্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল।

জাতিবিচারের অপেক্ষাও অভাগীর স্বর্গে জমিদারের শোষণের চেহারা বেশী প্রকট। মায়ের হাতে পোঁতা বেলগাছ হলেও জমি জমিদারের। অতএব গাছে কাঙালীর অধিকার নেই। এখানে প্রজার অধিকারের সীমাবদ্ধতার প্রশ্নই দেখা দেয়। কাঙালীর গাছ কাটার অধিকার ছিল না বলেই জমিদারের দারোয়ান কাঙালী ও তার পিতাকে অশ্রাব্য গালি দিয়ে এবং চপেটাঘাত করে নিরস্ত করল ( স্মরণীয় যে ভূমিসংস্কার আইনে রায়তের গাছ কাটার অধিকার স্বীকৃত হয় ) অতঃপর কাঙালী সুবিচারের আশায় জমিদারের কাছারি-বাড়ীতে উপস্থিত হল। কিন্তু জমিদারি সম্পর্কে জমিদার যে কত পরনির্ভরশীল এবং প্রজাদের ব্যাপারে কত উদাসীন থাকেন তার বড় প্রমাণ গ্রামে তিনি কখনও পদার্পণ করেন না।

গ্রামের কাছারি বাড়ীতে জমিদারের বকলমে জমিদারি পরিচালনা করেন গোমস্তা। এ সত্য সর্বজনবিদিত। এই গোমস্তাশ্রেণী প্রজা বা জমিদার কারুরই স্বার্থ দেখেন না—শুধু ছলে বলে আপন স্বার্থরক্ষাই করে থাকেন। সেই কারণে প্রজাদের প্রতি তিনি থাকেন মায়ামমতাশূন্য—অন্যদিকে জমিদারকে তার প্রাপ্যটুকু কোনমতে বুঝিয়ে দিয়ে বাড়তি সবকিছু নিজেই ভোগ করে থাকেন।

এই সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যা লিখেছেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল—"জমিদার স্থানীয় লোক নহেন—গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা।" জমিদার সম্পর্কে কাঙালীর ধারণার ভ্রান্ততা প্রমাণ করে লেখক এর পর লিখছেন—"লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল—কাঙালী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল—পিয়াদারা ঘুষ লয়—তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবাদ না হইয়াই পারে না।"

কিন্তু তারপর শরৎচন্দ্র নিজেই মন্তব্য করেছেন—"হায়রে অনভিজ্ঞ বাংলা-দেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না।"

ঘুষখোর গোমস্তা অধর রায় যে কতবড় অর্থপিশাচ এবং হৃদয়হীন তার পরিচয়ও শরৎচন্দ্র দিয়েছেন। এ কেবল ব্যক্তি অধর রায় নয় সমস্ত গোমস্তা-শ্রেণীর সে প্রতিনিধিস্থানীয়। তাই চিরদরিদ্র অসহায় মাতৃশোকাতুর ক্ষুদ্র বালকের কাছেও কাঠের দাম বাবদ পাঁচ টাকা দাবী করতে তার বিবেকে বাধে নি। সর্বস্বের বিনিময়েও পাঁচ টাকা সংগ্রহ হবে না জেনে কাঙালী যখন অক্ষমতা স্বীকার করল তখন অধর রায় বিধান দিলেন চরায় পুঁতে দিতে। কাঙালী তার মায়ের হাতে পোতা গাছের দাবী জানাতে গেলে অধর রায় দারোয়ানকে নির্দেশ দিলেন গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বিদায় করতে।

এর পরও গোমস্তা নির্বিকারভাবে হুকুম করল কাঙালীর খাজনা বাকী আছে কিনা দেখতে এবং সেই সংগে পাছে পালায় তাই তার জালটাল কিছু বাজেয়াপ্ত করতেও নির্দেশ দিল। গোমস্তার হৃদয়হীন ব্যবহারের বর্ণনা দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র লিখছেন—'গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়ল না। পড়িলে এ চাকরী তাহার জুটিত না।' অর্থাৎ জমিদারিপরিচালনার কাজে যে সহানুভূতি, ইত্যাদি বদান্যতা ব্যাপারগুলি বর্জন করতে হয় অথবা এই কাজের দায়িত্ব মানুষকে সম্পূর্ণ হৃদয়হীন করে তোলে অভাগীর স্বর্গ গল্পের চতুর্থ

অধ্যায়ে লেখক শরৎচন্দ্র শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। মানবদরদী লেখক মানবতা বিরোধী ব্যাপার মাত্রেরই প্রতিবাদ করেছেন জমিদারিব্যবস্থায় এই মানবতার অভাব আরও স্পষ্ট লক্ষিত। তাই এ ক্ষেত্রে তিনি জমিদার ও তার কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

জমিদারের প্রজার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের মানুষই ছিল, তার মধ্যে প্রধানতঃ মুসলমানরাই ছিল চাষী সম্প্রদায়। ছোট জাতের হিন্দুর মত মুসলমানদের উপরও উচ্চসমাজের পীড়ন ও শোষণ সমানভাবেই চলে। মহেশ গল্পের গফুর এদিক দিয়ে কাঙালীরই সমগোত্রীয়। প্রচণ্ড অজন্মার বছরেও দরিদ্র প্রজারা খাজনা দেবার দায় থেকে রেহাই পায় না। প্রাণাধিক প্রিয় বলদ—মহেশকে নিজের মুখের গ্রাস তুলে দেয় গফুর। ঘরের চালের খর টেনে মহেশের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটায়। কিন্তু তবু যখন দৈবচক্রে গফুরের হাতেই মহেশের অপঘাত মৃত্যু ঘটল তখন ব্রাহ্মণ জমিদার কিংবা ব্রাহ্মণ তর্করত্ন তাকে কসাই বলে অভিহিত করে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করলেন। শেষসম্বল পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে ভিটে ছেড়ে চলে যাবার আগে গফুরের চোখের জল বাধা মানল না। শেষবারের মত আল্লার দরবারে নালিশ জানিয়ে গেল গফুর—যারা বিধাতার দেওয়া মাঠের ধান, নদীর জল থেকে মহেশকে বঞ্চিত করেছে তাদের যেন তিনি ক্ষমা না করেন। এখানেও সেই শোষক জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে গফুরের অভিযোগ মর্মরিত হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র মুসলমান এই অপরাধে নয়, বকেয়া খাজনার দায়ে, অথবা যেকোনও সামান্য অপরাধেও প্রজারা ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ হত হামেশাই। প্রজার ব্যথা দুঃখকষ্ট শাসকশ্রেণীর সহানুভূতি আকর্ষণ করত না। ফলে বিধাতার আদালতেই শেষবিচারের আশায় নালিশ জানিয়ে যেত অত্যাচারিত গফুরের দল।

শরৎচন্দ্রের সময় জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ না হলেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ঘুণ ধরেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের প্রতি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব ধার্য করার ফলে জমিদারকর্তৃক প্রজাশোষণের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েই চলতে থাকে। প্রজার দেয় খাজনার ওপরেও ছলে বলে কৌশলে নানাভাবে অর্থ শোষণের চেষ্টা চলতে থাকে এবং প্রজাশোষণের অর্থে জমিদাররা বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। ঐশ্বর্য বিলাসের মোহে তাঁরা গ্রাম ছেড়ে নগরে গিয়ে বাস করতে থাকেন—ফলে গ্রামের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র ক্রমে ক্ষীণ হতে থাকে। প্রজাদের প্রতি তাদের সহানুভূতি লুপ্ত হতে থাকে অন্যদিকে প্রজারাও জমিদারশ্রেণীর প্রতি আস্থা হারাতে থাকে।

গ্রামের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক হয়ে ওঠে একান্ত কৃত্রিম এবং রজতকেন্দ্রিক। গ্রামের সঙ্গে জমিদারের এই আত্মিক বিচ্ছেদও যে জমিদারি উচ্ছেদের অন্যতম পুরোধা কারণ শরৎসাহিত্যে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এই প্রসঙ্গে পল্লী-সমাজের দুই জমিদার বেণী ঘোষাল ও রমেশের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জমিদারিপ্রথার অন্তর্ঘাতটাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জমিদারদের সাবেকী চাল, শোষণের আদর্শ ত্যাগ করে রমেশ যে সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার মধ্য দিয়েই সামন্ততন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অবক্ষয় লক্ষ করা যাচ্ছে।

পল্লীসমাজে বেণী ঘোষালের স্বার্থপরতায় গ্রামবাসীদের দুর্দশার শেষ নেই। আদর্শবাদী রমেশের উৎসাহে যখন গ্রামের মধ্যে পীরপুরে স্কুল খোলা হল তখন বেণী ঘোষাল যা বলেছিল তা উদ্ধৃত করা হল।

"সে লেখাপড়া শিখিয়ে সমস্ত প্রজা বিগড়ে তুলবে আর জমিদার হয়ে আমি মুখ বুঁজে সইব তা যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এমনিই তো মুসলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না—তার উপর লেখাপড়া শিখলে জমিদারি রাখা না রাখা আমাদের সমান হবে তা এখন থেকে বলে রাখছি।"

কোনও আদর্শ বা অনুপ্রেরণা পিছনে থাকলে যে প্রজারা সংঘবদ্ধভাবে অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে সে কথাও পল্লীসমাজে বলা হয়েছে। বেণী ঘোষালের বিরুদ্ধে প্রজারা মামলা করতে চায়। তারা রমেশকেই জমিদার বলে মানে। বেণী ঘোষালের মত জমিদাররা চোর-ডাকাত ছাড়া কিছু নয়। স্পষ্টই বলে খাজনা দিয়ে বাস করা—ভয় কারুকে করব না কিন্তু নিজেদের মধ্যে একতার অভাবে তাদের বিক্ষোভ কার্যকরী হয় না—দেনাপাওনাতেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসেরই নায়ক অথবা নায়িকা জমিদার তবে কয়েকটি উপন্যাসে তাদের ঐশ্বর্য বিলাস এবং কিছু-কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আভাস দেওয়া হয়েছে। তবে প্রজা ও জমিদারের সম্পর্ক সর্বাধিক স্পষ্ট যেখানে সে হল দেনা পাওনা। যদিও এর কাহিনী মূলতঃ ভ্রষ্টলগ্ন প্রেমের পুনরুজ্জীবনের, তথাপি বীজগাঁয়ের জমিদাররূপে চণ্ডীগড় পদার্পণ করার মুহূর্ত থেকে শেষপর্যন্ত জমিদার ও প্রজা এবং এই উভয়ের মধ্যস্থ নায়েব, গোমস্তা, মহাজন প্রভৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক ও সংঘর্ষের চিত্র শরৎচন্দ্র এঁকেছেন তার মূল্যও কম নয়। শরৎচন্দ্রের হাতে জীবানন্দ অত্যাচারী, ব্যাভিচারী জমিদারের সার্থক প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন। জমিদার বলতে সাধারণতঃ জমিদারের চিরন্তন যে রূপ আমাদের মনে

জেগে ওঠে জীবানন্দকে প্রথমে সেইরূপেই দেখানো হয়েছে। লেখকের ভাষাতেই সে কথা বলা যাক—"অত্যাচারী বলিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার বংশের চিরদিনই একটা অখ্যাতি আছে। কিন্তু বৎসরখানেক পূর্বে অপুত্রক জমিদারের মৃত্যুতে ভাগিনেয় হইতে ছোট বড় সকল প্রকার জীবনই একেবারে দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছে।"

চণ্ডীগড়ের দেবত্র সম্পত্তি কি ভাবে বীজগাঁয়ের জমিদারিভুক্ত হল সে সম্পর্কেও শরৎচন্দ্র লিখেছেন "আজ মন্দির সংলগ্ন মাত্র কয়েক বিঘা ভুমি ভিন্ন সমস্ত মানুষে ছিনাইয়া লইয়াছে। গ্রামখানি এখন বীজগাঁয়ের জমিদারিভুক্ত।" কেমন করিয়া এবং কোন রহস্যময় পথে অনাথ ও অক্ষমের সম্পত্তি এবং এমনি সিংসহায় দেবতারাও ধন অবশেষে জমিদারের জঠরে আসিয়া স্থিতিলাভ করে, সে কাহিনী পাঠকের জানা নিষ্প্রয়োজন।

এই সকল সম্পত্তির মালিক যাঁরা তাঁরা কিন্তু কদাচিৎ সহর থেকে গ্রামে পদার্পণ করেন। যদিও গ্রামের উন্নয়ন বা পরিদর্শন তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। স্বাস্থ্যোদ্ধার অথবা কিছু মুনাফা আদায় করাই লক্ষ, তথাপি তাঁদের হঠাৎ আগমনে গ্রামের নায়েব গোমস্তাদের মধ্যে কিরূপে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এখানে শরৎচন্দ্র তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

সুদীর্ঘকাল এই গ্রামের কাছারি-বাড়ীতে জমিদারের পদার্পণ ঘটে নাই এবং জমিদারের বসবাসের নিমিত্ত নির্মিত বাংলোবাড়ী শান্তিকুঞ্জ দীর্ঘকালের দেখা-শোনার অভাবে আগাছা জঙ্গলে ভরা জীর্ণ মলিন হয়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন "কতকাল ধরিয়া যে এখানে কেহ প্রবেশ করে নাই—কতকাল ধরিয়া যে কাছারির প্রধান কর্মচারী সদরে কেবল মিথ্যা কৈফিয়ৎ পেশ করিয়া আসিতেছে তাহা হিসাব করিয়া লইবার কেহ নাই।"

এই অবস্থায় জমিদার জীবানন্দের আকস্মিক আগমনে গোমস্তা এককড়ি নন্দীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। এতকালযে কোনও কাজও করে নি এ কথা জানতে পারলে তার কি অবস্থা হবে, ইহারই জমিদারিতে বাস করিয়া ছেলেপুলে লইয়া কোথায় পলাইয়া সে যে আত্মরক্ষা করিবে—ইহার কোন কিনারাই তাহার চোখে পড়িল না।

সমস্তগ্রামের জমিদারের কর্মচারীদের কাছে হুজুরের আগমন একটাই নিদারুণ দুঃসংবাদের মত।

বিশ্বম্ভর সম্পর্কে লেখক বলেছেন "তাঁহার মগজ যেমন পরিষ্কার—তেমনি ঠাণ্ডা এবং পিয়াদা হইলেও গোমস্তার সহিত সম্বন্ধটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।"

এই বিশ্বম্ভর মদ্যপ জমিদারকে সন্তুষ্ট করার উপায় সম্পর্কে গোপনে পরামর্শ দিয়ে যে আশার বাণী উচ্চারণ করল তার মর্ম এই যে হুজুরের নেকনজরে পড়লে নন্দীমশায়ের অদৃষ্টেও যে একদিন সদরের নায়েবীপদ মিলবে না—এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না।

এবার জীবানন্দের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তার বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও তার দীর্ঘদিনের অত্যাচারক্লিষ্ট চেহারার পুংখানুপুংখ বিবরণ তিনি দিয়েছেন জীবানন্দ সকলের কাছে একটি মায়ামমতাশূন্য, লম্পট নেশাখোর ও ভয়ঙ্কর মানুষরূপেই পরিচিত।

এই দুরাচারী জমিদার বীচগাঁয়ে পদার্পণ করে প্রথমেই বায়না ধরলেন কাছারির তসিল বাবদ হাজার দশেক টাকা চাই।

অবশ্য জীবানন্দ নিজের স্বরূপ প্রকাশে কুণ্ঠিত নন। তার নির্লজ্জ সত্যভাষণ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন যে সে ভক্তি এতই অশ্লীল যে জমিদারের গোমস্তার পর্যন্ত লজ্জা বোধ হয়।

জমিদারের গোমস্তাগণ যে হৃদয়হীনতা ও নির্লজ্জতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন—লেখকের এ উক্তিতে সে কথাই প্রমাণিত হয়।

অবশ্য জীবানন্দের নির্মম অত্যাচারী স্বরূপের মূলে শরৎচন্দ্র যে কারণ নির্দেশ করেছেন—তা আর যাই হোক জমিদারি শোষণের ইঙ্গিত দেয় না। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবেই জীবানন্দের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটেছিল—সেই কারণেই ষোড়শীর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে স্বেচ্ছাচারী জীবানন্দের আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু ষোড়শী জীবানন্দকে যে আদর্শ দেখিয়েছিল তা হল যথার্থ প্রজাহিতৈষী জমিদার হয়ে ওঠা। কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটবার আগে পর্যন্ত ষোড়শী জীবানন্দের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে প্রজা-জমিদারের সম্পর্ক, ভূমিসংক্রান্ত বিভিন্ন অধিকারের প্রশ্ন, গোমস্তা, নায়েব ইত্যাদির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এতে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রথমেই বলা হয়েছে চণ্ডীগড় গ্রামখানি সম্পূর্ণভাবে দেবত্র সম্পত্তি, মা চণ্ডীর ও তাঁর সেবায়িতদের এলাকাধীন। কিন্তু বীজগাঁয়ের জমিদার তার ওপর জোর খাটাতে চাইছেন—এমন কি মন্দিরের অভ্যন্তরেও তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার খেয়াল চরিতার্থ করার বাসনা জাগে। প্রজাদের ঘরে ঘরে পুকুরের মাছ, বাগানের ফল মূল, চালের লাউকুমড়া তো জমিদারের লোক গায়ের জোরে প্রতিদিন সংগ্রহ করছে তারপর আবার মন্দিরে খাসী দিয়ে মহাপ্রসাদ তৈরী করার ইচ্ছা হল জমিদারের। চণ্ডীগড়ে এই সময়কার অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—

"জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মাত্র পাঁচদিন চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন। এইটুকু সময়ের অনাচার ও অত্যাচার সমস্ত গ্রামখানা যেন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নজরের টাকাও আদায় হইতেছে। কিন্তু সে যে কি করিয়া হইতেছে তাহা জমিদার সরকারে চাকরী না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাও পাগলামি।"

জমিদার সরকারে যারা চাকরি করে তারা যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষ অন্ততঃ মানুষ নামের অযোগ্য, স্নেহদয়ামায়াহীন কতকগুলি স্বার্থপর জীব একথা শরৎচন্দ্র অনেক জায়গাতেই বলেছেন। জমিদার অপেক্ষা তাঁর এই অধীনস্থ কর্মচারীদেরই তিনি বেশী দায়ী করেছেন।

জমিদার জমির সংবাদ রাখেন না। অন্য সময় গোমস্তারা তাঁকে ফাঁকী দেয়, তাই অল্প কয়েকদিনে একেবারে সুদে আসলে সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া ও নিজের সব রকম ভোগ বিলাসের উপকরণ ও তার উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করা এই ছিল জমিদারী মনোভাব। জমিদারের এইপ্রকার খামখেয়ালীপণায় কত মানুষ যে ভিটামাটি হারায় কত মানুষের পরিবারের সম্ভ্রম ধূলায় মেলে তার ইয়ত্তা নেই। জমিদারের অত্যাচার স্ত্রী পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই সমান।

তথাপি জমিদারের প্রজা উৎখাতের মামলায় জমিদারের বিপক্ষে সাক্ষী দেবার সাহসও কেউ কেউ রাখে। তার মধ্যে তারাদাস একজন। কিন্তু জমিদার সে ভোলেন না, তাই সময়ে সে ব্যক্তি তার আক্রোশের শিকার হয়। জমিদারের দাবীদাওয়া সর্বদা আইন মেনে চলে না। তাই যখন জীবানন্দ গোমস্তা এককড়ির কাছে তারাদাসের জমির পরিমাণ জানতে পারলেন তখন তিনি হুকুম দিয়ে বসলেন --বিঘে পিছু দশটাকা তাঁর নজর চাই। তখন এককড়ি কুণ্ঠিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—আজ্ঞে সে যে নিষ্কর দেবোত্তর হুজুর। তদুত্তরে জমিদার বলেন—না, দেবোত্তর এ গাঁয়ে এক ফোটা নেই। সেলামী না পেলে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

বোঝা গেল জমিদার গায়ের জোরেই অবিষ্কার জাহির করেন—আইনের বিধি-ব্যবস্থার ধার ধারেন না।

ষোড়শীর সঙ্গে জমিদারের সংঘাতও সেই অধিকারের সূত্র ধরেই হয়েছিল। জমিদারের টাকা আদায় করার জন্য পেয়াদারা তারাদাসের বাড়ীতে হানা দিলে অনুপস্থিত তারাদাসের পরিবর্তে কন্যা ষোড়শী নিজেই জমিদারের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছিল—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা পর্যন্ত করেনি। জমিদার যখন জমি বাঁধা দিয়ে বা বিক্রয় করে হলেও জমিদারের প্রাপ্য সংগ্রহের উপদেশ ষোড়শীকে দিলেন তখন ষোড়শী উত্তর করেছিল—

দেবতার সম্পত্তি বাঁধা দেবার বিক্রি করার অধিকার তার নেই। সেই সঙ্গে একথাও জানিয়েছিল যে দেবত্র সম্পত্তি থেকে যে নজর তিনি দাবী করেছেন তা যথার্থই জমিদারের প্রাপ্য নয়।

তখন জীবানন্দ বলল—"প্রাপ্য বলতে চাইনা। ওটা তোমাদের দেয় এই বলতে চাই। তোমার মনে হতে পারে বটে, অন্য জমিদারদের ত দিতে হয়নি—তার কারণ, তাঁরা আমার মত সরল ছিলেন না। স্পষ্ট করে দাবী করেন নি, কিন্তু প্রায় সমস্ত গ্রামখানাই ধীরে ধীরে বেদখল করে নিয়েছেন। তাঁরা একরকম বুঝেছিলেন। আমি একরকম বুঝি।" জীবানন্দের এই উক্তি থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে নিষ্কর দেবত্র জমি জমিদারের পক্ষে একটা সমস্যা। তবে সেই সকল সম্পত্তি থেকে মুনাফা লাভের পদ্ধতি বিভিন্ন জমিদারের বিভিন্ন রকম। কেউ কৌশলে তিলে তিলে গ্রাস করে আর কেউ গায়ের জোরে অত্যাচার করে অধিকার খাটায়।

দেনাপাওনায় শরৎচন্দ্র সাগর সর্দ্দারের মুখ দিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে যে উষ্মা প্রকাশ করেছেন তা শুধু সাগর সর্দ্দারের ব্যক্তিগত আক্রোশ নয়, ছোটজাত ভূমিজ প্রজাদের সে প্রতিনিধি। জমিদার ও কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের অত্যাচারে তারা ক্ষিপ্ত।

সাগর বলেছে—জমিদারের পাইক পেয়াদা বহুত আছে তাও জানি, গরীব বলে আমাদের দুঃখও তারা কম দেয়নি। অতএব সুযোগ হলে যে জমিদারের প্রতি প্রতিশোধ নিতে তারা পিছ পা হবে না—একথা সাগর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে। তারা আসলে চণ্ডীমন্দিরের অধিকর্ত্রী ষোড়শীর প্রজা বলেই নিজেদের মনে করে. তারা কোন ক্রমেই জমিদারের প্রজা নয়। ষোড়শীও নিজেকে জমিদারের প্রজা মনে করে না—তাই সে বলে আমি তোমার হুজুরের প্রজা নই—আমার বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে।

জমিদারের এলাকাধীন নয়—এমন জায়গা খাস সরকারের অধীন। তাদের ভালমন্দের বিচারের ভার স্বয়ং রাজার। দেবত্র সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে অধিকারের লড়াইয়ের চিত্র এঁকে শরৎচন্দ্র প্রকারান্তরে জমিদার ও সরকারের অধিকারের তার-- তম্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপার ছাড়া গ্রামের প্রজার ভালমন্দের অন্যান্য বিষয় জমিদার ও তাঁর নায়েব মহাজনের জানার কথা নয়। কিন্তু গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন সেই সব ব্যাপারে অত্যাচারী জমিদারের সাহায্য প্রার্থনা করেন—তখন তাদের শুভবুদ্ধি জাগরণের অভিসন্ধি বুঝতে অসুবিধা হয় না। জমিদার জীবানন্দ আর যাই

হোক সরলতা ও নির্লজ্জতা তার একটি বড় গুণ ছিল। তাই যখন ভৈরবীদের চরিত্রশুদ্ধির বিষয়ের মীমাংসা করার জন্য নীতিজ্ঞান হীন চরিত্রহীন জমিদারকে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে বলা হল,—তখন তিনি তামাসা করে বললেন যে জমিদার বা তার লোকজনেরা কেউই সাধু নয় চরিত্রের দিক দিয়ে—জীবানন্দের ভাষায় এরা সকলেই আপনার লোক, জ্ঞাত গোষ্ঠী এমন কি মণিমাণিক্যের এ পিঠ ও পিঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কেবল চরিত্রের দিক নয়, আর একটি বর্ণনায় শরৎচন্দ্র জমিদার গোষ্ঠীর অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করে তুলেছেন। জীবানন্দের কাছে একটি সরকারী নোটিশ এসেছে। তাতে বলা হয়েছে দেনার দায়ে তার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারি করা হয়েছে এমন কি তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হতে পারে।

নিজের সম্পর্কে তাই জীবানন্দ প্রফুল্লকে বলে "তোমার দাদাটি যে কস্তুরীমৃগ, সুগন্ধ আর কতকাল চেপে রাখবে ভাই। টাকা। টাকা। এর নালিশ আর তার নালিশ তমুকের ডিক্রী আর তমুকের কিস্তি খেলাপ—"

জীবানন্দের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল দেনার দায়ে চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যাওয়া জমিদারগোষ্ঠীর চিত্রই ফুটে উঠেছে। তারাদাস ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরে সমগ্র জমিদার গোষ্ঠীর সর্বনাশ সাধন করতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশের কর্মচারী থেকে আদালত পর্যন্ত সকলেই ধনীর সহায়—তাই তো সাধারণ মানুষ সুবিচার পায়না কখনও জমিদার প্রজাদের স্বার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখেন না জমিদারীকে কেবল অতি সুখের উপায়রূপে ব্যবহার করে থাকেন। অধিক লাভের আশায়, প্রজাদের যথাসর্বস্ব দক্ষিণের মাঠকে মাঠ ভূমিখণ্ড জমিদারের তরফ থেকে মাদ্রাজী সাহেবকে বিক্রী করার প্রস্তাব উঠল। কালিন্দীর মধ্যে যেমন চিনিকল স্থাপনের জন্য জমি বিক্রির চেষ্টা চলছিল এর জন্য প্রজা মরুক জমিদারের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই—প্রজাদের কথা চিন্তা বা তাদের মতামত গ্রহণ করার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না।

অথচ এই জমিজমা প্রজারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করে আসছে—তা ছাড়া সমস্ত মাঠ কেবল বীজগ্রামের সম্পত্তিও নয়—এর কতক অংশ চণ্ডীমাতার, কিছু রায় মহাশয়ের খরিদা অতএব জীবানন্দ একাকী ইচ্ছা করিলেও সে জমি হস্তান্তর করতে পারে না। এ কাজ সম্পূর্ণ বেআইনী। কিন্তু জীবানন্দদের মত জমিদার শ্রেণীর ক্ষেত্রে আইনের প্রশ্ন তো বাতুলতা মাত্র।

ষোড়শী একথা প্রথমে অবিশ্বাস করলেও পরে যখন জানল যে প্রজাদের

কথা মিথ্যা নয়—সে ক্রোধ ভরে বলল—তাই যদি হয়ে থাকে তোরা আদালতে নালিশ করগে। কিন্তু প্রজারা নিরুপায়—কারণ জমিদারের সঙ্গে শত্রুতা করা কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করে জলে বাস করারই সামিল। শেষ পর্যন্ত ষোড়শীর প্রেরণায় তারা প্রাণ দিয়ে জমি রক্ষার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেও পরে দেখা গেল বিদ্রোহী প্রজারা শক্তিমান জমিদারেরই বশ্যতা স্বীকার করেছে।

জীবানন্দ ও ষোড়শীর ভিতরের সম্পর্ক যত গভীরই হোক বাইরে তা সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত হয়েছে। এই সংঘর্ষ একান্তভাবে জমিদার ও চণ্ডী মন্দিরের প্রকৃত সেবায়িতের অধিকারের লড়াই। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকে যেমন রাজা ও পুরোহিতের অধিকারের দ্বন্দ্ব এও যেন কিছুটা তাই। তবে সেখানে রাজাই বড় কারণ তিনি মানবতার প্রতীক, আর এখানে ষোড়শীর প্রভাব বেশী কারণ সে মানুষের হয়ে লড়াই করেছে। পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর তাঁর গণদেবতায় যতীনের মুখ দিয়ে সেই দেবত্র সম্পর্কে জমিদারের অধিকারের সীমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

কিন্তু শক্তির প্রাধান্য সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সেই জোরেই জমিদার স্বয়ং প্রজাদের অধিকার করে বসেন। যারা একদিন জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তারাই পরে জমিদারের পদানত হল—এ সম্পর্কে ষোড়শীকে সাগরসর্দ্দার যে রিপোর্ট পেশ করল তার অর্থ হল—যাদের জমি জমা গেল—তাদের কি হল জানতে চাইলে সাগর বলল—

"ভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আসচে তা থেকে তারা বাদ যাবে না। এই যে সেদিন প্রজার পক্ষ থেকে পাঁচ হাজারের নজর দাখিল হল তার খতের কাগজগুলো রায় মশায়ের সিন্দুক ছাড়া আর কোথাও জায়গা পায়নি—নইলে তিনি একটা হুকুম দিতে না দিতে ভিড় করে আজ সকলে যাবেই বা কেন?"

সাগরের মত লোকেরা জমিদারের অধীনে বাস করার চেয়ে জলে বাস করা পছন্দ করে বেশী কারণ সেখানে তবুও খাবার জোটে। তার মত কত ভূমিজ প্রজারা জমিদারের অত্যাচারে উৎখাত হয়ে চা বাগানের কুলি হয়েছে কেউ কয়লা খুঁড়তে গেছে। অথচ তাদের কত জমিজমা হাল বলদ ছিল একদিন আজ তাদের অর্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্ধেক রায় মশায়ের। শরৎচন্দ্রের কথায় সমস্ত জমিজমা হয় জনার্দ্দন না হয় জমিদারের কর্মচারী স্বনামে বেনামে গিলিয়া খাইয়াছে। জমিদার ও নায়েব গোমস্তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজা উচ্ছেদের এক মর্মান্তিক বিবরণ সাগর সর্দ্দারের উক্তির মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। সাগর তারই প্রত্যক্ষদর্শী।

অবশ্য জমিদার গোমস্তার এই ধরণের প্রজা শোষণকে শরৎচন্দ্র দুর্বলের ওপর সবলের চিরন্তন অত্যাচার বলেই ধরে নিয়েছেন। এর কোনও প্রতিকার নেই। এই অন্যায় অবিচার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে—এবং চলবেও। কারণ জমিদাররাই যে কেবলমাত্র শোষক শ্রেণী নন তার প্রমাণ জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের পরেও এই অন্যায় শোষণ বন্ধ হয়নি। সমাজে মুনাফাখোরেরা আজও দুর্বলের রক্ত শোষণ করে চলেছে। একদল মানুষের শ্রমের ফল ভোগ করে পুষ্টিলাভ করছে তথাকথিত বুর্জোয়া সমাজ। অতএব একদিন যে শোষকের দল জমিদার রূপে প্রজার রক্ত শোষণ করত কালে কালে সে শোষণের ইতিহাস নাম বদলে হল মালিকের শ্রমিক শোষণ কিংবা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রোলেটারিটের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই কর্ষণজীবী ও আকর্ষণ জীবী।

অতএব শরৎচন্দ্র জমিদার নামক বিশেষ শ্রেণীকে অভিযুক্ত না করে সর্বকালের শোষক মানুষদের বিরূদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা ও বৃহত্তর সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

শরৎচন্দ্র জমিদার শ্রেণীর শোষক রূপের পাশাপাশি এক আদর্শ জমিদার চরিত্রসৃষ্টি করে এক নূতন আদর্শবাদ স্থাপন করতে চেয়েছেন। পল্লীসমাজে অসৎ বেণী ঘোষাল ও আদর্শবান রমেশের মধ্যে যে সৎ অসৎ এর দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে পৃথকভাবে দেনাপাওনায় জীবানন্দের একক জীবনেই সেই শোষক ও আদর্শ জমিদারের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

শোষক জীবানন্দ যখন ষোড়শীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানবসেবার ব্রত গ্রহণ করেছে এবং জমিদারের অধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়েই যখন আপন মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটাতে পেরেছে তখনই সে হয়েছে একজন আদর্শবাদী জমিদার এবং সম্ভবতঃ জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের কোনও অভিযোগ ছিল না যদি না সে জমিদার অত্যাচারী হয়। আসল কথা জমিদারী শোষণের মূল কারণ রূপে শরৎচন্দ্র জমিদারের কর্মচারীদের প্রধানতঃ দায়ী করেছেন সেই কারণেই জমিদার জীবানন্দ যখন হৃদয়বান মানুষের মত প্রজাদের মঙ্গলচিন্তা করতে লাগলেন তখন তাঁর পরিবর্তন তাঁর কর্মচারীদের স্বার্থে আঘাত হানল—ফলে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে আহত হলেন।

সাগর সর্দ্দারের বর্ণনার পর ষোড়শী যা চিন্তা করেছিল—শরৎচন্দ্রের ভাষায় তা হল যে প্রবল, যে ধনবান, যে ধর্মবিরহিত তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন পথ দুর্বলের খোলা নাই। কোথাও ইহার নালিশ চলেনা। ইহার বিচার

করিবার কেহ নাই ভগবান কান দেন না—সংসারে চিরদিন ইহা অবারিত চলিয়া আসিতেছে।

আসলে ষোড়শীর মুখ দিয়ে যে কথা লেখক বলছেন তা কেবল জমিদার শ্রেণী নয় সর্বশ্রেণীর শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেখকের ব্যক্তিগত অভিমতই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

চণ্ডীগড়ের ভূমিব্যবস্থা এবং ষোড়শী ও এককড়ি নন্দীর মধ্যে রেষারেষির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক যে বক্তব্য রেখেছেন সেও জমিদার ও প্রজার মধ্যে অধিকারের সীমা রেখার কিছু আভাস দেয়। শরৎচন্দ্র লিখেছেন—ভৈরবীদের আমলে অনেক জমি মন্দিরের নিজ জোতে ছিল। তাহাদের যথেচ্ছামত সেগুলি প্রতি বৎসর ভাগে বিলি হইত এবং এই উপলক্ষে প্রজায় প্রজায় হাঙ্গামার অবধি থাকিত না। অথচ লাভ কিছুই ছিল না। তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্তের অভাবে প্রাপ্য অংশের কিছু বা প্রজারা লুটিয়া খাইত এবং অবশিষ্ট আদায় যদি বা হইত অপব্যয়েই নিঃশেষ হইত। এই সকল ভূমিই যে (ষোড়শী) ভূমিহীন ভূমিজ প্রজাদিগকে বছর ছয়সাত পূর্বে ফকির সাহেবের নির্দেশমত নির্দিষ্ট হারে বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। জনার্দন রায় ও এককড়ি নন্দীর সহিত তাহার বিবাদের সূত্রপাতও তখন হইতে। জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর মানসিক পরিবর্তনের একটি চিত্র শরৎচন্দ্র এঁকেছেন। পশু জীবানন্দ হঠাৎ মানুষের প্রতি দরদী হয়ে উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র জমিদার গোমস্তার পূর্বতন অত্যাচারের একটা নজীর তুলেছেন—মানসিক পরিবর্তনের পর জীবানন্দ প্রথমেই সেটি সংশোধন করে প্রায়শ্চিত্ত করল। এই দুষ্কর্ম জমিদারদের একচেটিয়া ছিল। সে হল চাষীদের একটি জল নিকাশের ব্যবস্থা। অথচ এই সামান্য বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে কি নিষ্ঠুরতার পরিচয়ই না তারা দিয়েছেন। তার ছোট একটু ইতিহাস শরৎচন্দ্র বিবৃত করেছেন—জীবানন্দ দেখলেন মাঠের জল নিকাশের জন্য চাষীরা এইবার এই পথের উপর দিয়া নালা কাটিয়া দিয়াছিল। নন্দী মহাশয়ের আদেশ অর্জন করিবার মত প্রচুর দক্ষিণা যখন তাহারা কোনমতেই সংগ্রহ করিতে পারে নাই—তখনই শুধু সর্বনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এই কাজ করিয়াছিল।

কিন্তু দরিদ্রের এই দুঃসহ স্পর্ধা এককড়ি হুজুরের গোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন নিরুপায়ের অশ্রুজলে ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন নাই।

জমিদাররা যে কত কান পাতলা হতেন এবং গোমস্তাদের মুখে ঝাল খেতেন—

তাছাড়া প্রজাদের মঙ্গল সাধন তো দূরের কথা তাদের শাস্তি দেবার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনেও তাঁরা দ্বিধা বোধ করতেন না—জীবানন্দ চৌধুরীর মধ্য দিয়ে তারই দৃষ্টান্ত লেখক রেখেছেন।

তাই জীবানন্দের মধ্যে মানবতার বিকাশ হবার সঙ্গে প্রথমেই সেই বুজানো নালাটার অসমতল অংশটির প্রতি দৃষ্টি পড়ে জীবানন্দের মন কেমন করে উঠল—দরিদ্রপীড়নের এই উৎকট চিহ্ন এই পথে কতবারই ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কিন্তু আজ ইহাই চোখে পড়িয়া দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল—আহা কত ক্ষতিই না জানি হয়েছে। কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হয়ত পেটভরে দুবেলা খেতেও পারে না। কেনই বা মানুষ এসব করে।

মনের সেই দুর্বল মুহূর্তে জীবানন্দ যখন মন্দিরে আশ্রয়প্রার্থী কৈবর্ত উমাচরণের কাছে তার নিবাসস্থল বংশীবট গ্রামের জমিদারের অত্যাচারের কথা শোনে—"রাজায় প্রজায় প্রীতি নাই সম্বন্ধ নাই—আছে শুধু শোষণ করিবার বংশগত অধিকার।" তখন জীবানন্দ এই ভাগ্যবিড়ম্বিত অত্যাচারিত মানুষটির জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। এবং পরে যখন শোনেন রাজাবাবু অর্থাৎ তাঁরই হুকুম অনুসারে তিনদিনের বেশী সে মন্দিরে থাকা চলবে না এবং সেই হুকুম তাঁর নামে চালিয়েছে এককড়ি নন্দী ও তারাদাস তখন তাঁর মন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে উঠল।

এরপর শান্তিকুঞ্জ দগ্ধ হবার ঘটনায় এককড়ি যখন সাগর সর্দারকে আগুন দেবার জন্য দায়ী করল এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ভূমিজ প্রজার আন্দামান বাস কামনা করল তখন জীবানন্দ শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে বললেন—তাহলে তোমাকেও তো সঙ্গে এদের যেতে হয় এককড়ি। জমিদারের গোমস্তাগিরি কাজে তুমি যাদের ঘরে আগুন দিয়েছ সে খবর তো আমি জানি।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনায় জমিদার ও প্রজার সংঘর্ষ ঘনিয়ে উঠেছে যদিও এর পিছনে জমিদারের অদৃশ্য হস্ত সকলের অগোচরে কাজ করছিল অবশ্য সে জমিদার অত্যাচারী জীবানন্দ নয় মানুষ জীবানন্দ।

জমিদার হিসাবে আপন স্বার্থরক্ষায় যিনি প্রজাদের অগোচরেই তাঁহাদের পিতৃপুরুষের জমিজমা আখের চাষ ও গুড়ের কারখানা করার জন্য মাদ্রাজী সাহেবকে বিক্রি করেছিলেন আজ ভূমিজ ও অন্যান্য প্রজারা একযোগে জমিদারের নামে নালিশ রুজু করে সেই বন্দোবস্ত বাতিল করবার আবেদন করেছে। আদালত থেকে সেই বিষয়ে পরোয়ানা এসেছে।

জমিদারে প্রজায় লড়াই—এককড়ি স্বয়ং কালেকটার সাহেবের সংগে যোগ-

সাজগ করে গোমস্তার বুদ্ধি কৌশল অনুসারে একের বিষয় অপরকে বিক্রয় করার যতরকম উপায় আছে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক চোরা সই, অনেক তমসুক ও কর্জার খত প্রস্তুত করেছেন। এর জন্য বিস্তর খরচও হয়েছে।

তথাপি হীন মূর্খ মৃতকল্প চাষীর দল জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ করার শক্তি সাহস ও অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করল সে বিষয়টি সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ একথা যে সকলেই জানে—ইংরেজের বিচারালয় ধনীর জন্য তৈরী, দরিদ্রের জন্য নয়—প্রজার পক্ষে আদালতে দাঁড়ানো যে কত হাস্যকর সেকথা সকলেই জানে—সেইজন্য আদালতের পরোয়ানায় সকলেই বিস্মিত হয়ে পড়ল। কারণ জমিদারেরই তাতে একচেটিয়া অধিকার সে ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক। আদালত কখনও প্রজার পক্ষে কথা বলে না।

জীবানন্দ তখন সাঁকো তৈরীর খেয়ালে মেতে উঠেছে। লোকে জানে না জমিদারের প্রজার মঙ্গল নিয়ে এত মারামারি কেন ? বিশেষতঃ জীবানন্দের পূর্বতন চরিত্রকেই লোকে স্বাভাবিক বলে জানে কাজেই তার ব্যতিক্রম মানেই পাগলামি। সাঁকো তৈরীর খরচ অনেক তাই, দেওয়ানজী তাকে সাবধান করতে গিয়ে বললেন. জমিদারী বাঁধা পড়বে যে।

বাবু বললেন—প্রজারা সব বছর বছর খাজনা যোগাচ্ছে আর মরছে। তাদের জমি বাঁচাবার জন্যে যদি জমিদারী বাঁধা পড়ে পড়ুক না।

সাঁকো তৈরীর ব্যাপারে বীজগাঁয়ের জমিদার একসঙ্গে খাটেন—প্রজাদের দিয়ে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই নালিশ করিয়েছেন জীবানন্দ এর জন্য কারাভোগ করতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। অথচ মাদ্রাজীসাহেব জমির দখল চান—তার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

জীবানন্দের মহত্বের এতসব দৃষ্টান্ত স্থাপনের ফলে এককড়ি, জনার্দন প্রভৃতি গাঁয়ের মুনাফালোভীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। যে জমিদারকে দিয়ে ষোড়শীকে উচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা চলেছে—এখন স্বার্থের খাতিরে সেই লোকটার কাছে যেতে তাদের দ্বিধা। এইসকল ঘটনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন জটিল গ্রাম্য রাজনীতি ও নিষ্ঠুর জমিদারী শাসনের যথার্থ স্বরূপ ফুটে উঠেছে অন্যদিকে জীবানন্দের মধ্যে মনুষ্যধর্মের উদ্বোধনে শরৎচন্দ্র এক স্পষ্ট আশাবাদ ঘোষণা করেছেন বলা যায়—জমিদার যদি প্রকৃত প্রজাদরদী হয়ে ওঠেন ও ব্যক্তিগতভাবে জমিদারী পরিচালনা করেন—তবে ঐ মধ্যস্বত্বভোগী নায়েব গোমস্তারা কোনও দিনই প্রাধান্য পায় না। বরং শেষপর্যন্ত নিজেদের কলে নিজেরাই ধরা পড়ে।

জীবানন্দ যখন নির্মলকে কথার উত্তরে বলে 'আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি—সে হবার নয়—কৃষকেরা তাদের জমি ছড়েবে না। কারণ এ শুধু তাদের অন্নবস্ত্রের কথা নয়। তাদের সাতপুরুষের চাষ আবাদের মাঠ। এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক এ তাদের দিতেই হবে।...আপনি ভালই জানেন অন্যপক্ষ অত্যন্ত প্রবল. তার উপর জোরজুলুম চলবে না। চলতে পারে কেবল চাষাদের উপর। কিন্তু চিরদিনই তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসচে। আর হতে আমি দেব না।'

বস্তুতঃ জীবানন্দের মধ্যে এই শুভবুদ্ধির উদয় করে শরৎচন্দ্র শোষক জমিদারদের সামনে এক আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জমিদাররা যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রজার মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট হন তবে প্রজাসাধারণ চিরকাল ধরে যে অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার পেয়ে আসছে তার প্রতিকার হতে পারে কিন্তু তা হয় না বলেই জমিদারশ্রেণী সম্পর্কে প্রজার অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

আইনতঃ জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ করবার আগে থেকেই যে বিভিন্ন সাহিত্যিক মানসে এর ভালমন্দ সম্পর্কে বিচারব্যাখ্যা স্থান পেয়েছিল শরৎসাহিত্যে তার বিশিষ্ট প্রমাণ মেলে।

শরৎচন্দ্রের 'জাগরণ' উপন্যাসে জমিদারিপ্রথার এক বিশদ ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখক উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। কিন্তু সেই সম্পূর্ণ অংশে তিনি জমিদারি বিষয়ে যতটুকু আলোচনা করেছেন বর্তমান নিবন্ধে তার গুরুত্বও কম নয়।

পিতা মিষ্টার রে প্রাচীন জমিদার বংশোদ্ভূত হয়েও জমিদারি চাল শেখেন নি—সম্ভবতঃ এর কারণ তিনি গ্রামের জমিদারি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং বিদেশে মানুষ হয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই ছিলেন বিদেশী কেতাদুরস্ত।

অতএব, দীর্ঘদিন বিদেশে কাটিয়ে প্রবীণ বয়সে মিঃ রে যখন তাঁর গ্রামে বসবাস করতে এলেন তখন সেই পুরানো জমিদারি ভাব তিনি কিছু আয়ত্ত করতে পারেন না। তাঁর বিদুষী ও প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না কন্যা তাঁর পদে পদে ভুল ধরতে শুরু করে এবং সেই সংগে সে নিজেকেই নতুন উৎসাহে জমিদারি কাজের উপযুক্ত করে তুলতে থাকে। এই উদীয়মানা নব্যা জমিদার প্রথমেই যে ত্রুটিটা ধরেছিল, তা হল তার বাবা দীর্ঘকাল জমিদারির সঙ্গে সংযোগ না রাখার দরুন সমস্ত সিস্টেমটা ( জমিদারি— ) একেবারে মরচে ধরে গেছে। সেই সব পরিষ্কার করতে গিয়ে যদি কেউ আত্মহত্যা করে বসে সে কি আমার অপরাধ ?

আলেখ্য দেখল তার বাবার উদারতার সুযোগে জমিদারির এক বিরাট অংশের অপব্যয় হচ্ছে এবং বহু বিষয় অনাদায় থেকে যাচ্ছে। তার বাবার প্রশ্রয়ে অমরনাথ প্রভৃতি টেররিস্ট নেতাদের কার্যকলাপ বিস্তারলাভ করছে—গ্রামে নাইটস্কুল হয়েছে—সেই স্কুলের তেলের খরচও কাছারি বাড়ী থেকে যোগানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে ম্যানেজারের অভিযোগপূর্ণ চিঠি—যে জমিদারির অন্তর্গত অমরপুর হাটে তারা জোর করে বিলাতী বস্ত্র বর্জন করছে, আবার তার বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দেওয়ায় প্রজারা নাকি ধর্মঘট করে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে। এমন কি লুটপাটের ভয়ও দেখিয়েছে। জমিদারের দেয় সরকারী খাজনা জমা দেবার সময় হয়েছে কিন্তু তহবিলে কিছুমাত্র মজুত নেই। এ সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই আলেখ্য জমিদারের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা চালালো। তাতে কে বাঁচল কে মরল তার দেখার দরকার নেই। জমিদারির কাজে অযোগ্যতার জন্য বহুদিনের পুরানো কর্মচারী বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলীকে বরখাস্ত করে নতুন লোক বহাল করা হল। সেই শোকে নয়ন গাঙ্গুলী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিল। জমিদারির আয় বাড়ানোর নেশায় আলেখ্য যে ভুল করল, যে দিন সে সে কথা উপলব্ধি করতে পারল—সেদিনই তার যথার্থ জাগরণ হল। জাগরণ নামের মধ্যে আলেখ্যচরিত্রের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র জমিদারশ্রেণীরই জাগরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা ও ভেঙ্গে পড়ার মূলে যে সামন্তশ্রেণীর এই ক্রমবর্ধমান অর্থলোলুপতাই মূল কারণ তার প্রতি শরৎচন্দ্র স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন।

অমরনাথ যে বলেছিল—'সংসারে জমিদার ও প্রজা ছাড়া যদি না আর কিছু থাকতো তো কোন কথাই ছিল না। কিন্তু বিপদ এই যে, তৃতীয় ব্যক্তি বলে একটা বস্তু সংসারে আছে এবং পছন্দ না করলেও সে বস্তুর অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করা যাবে না।

শরৎচন্দ্র এখানে যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলেছেন—জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাকে বিদ্রোহের এরাই দিয়েছে প্রেরণা। দেনাপাওনায় জমিদার জীবানন্দ নিজের বিরুদ্ধে প্রজাদের দিয়ে নালিশ করিয়েছে, সে নিজে সেই তৃতীয় পুরুষের দায়িত্ব নিয়েছে।

পল্লীসমাজে শোষক জমিদার বেণী ঘোষালের বিরুদ্ধে জমিদার বংশের মানবতাবাদী বংশধর রমেশ প্রজাদের প্ররোচনা দিয়েছে। তার জাগরণে অমরনাথ সেই ভার গ্রহণ করেছে।

জমিদারি কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রাচীন নয়ন গাঙ্গুলীকে বরখাস্ত করে তার সংসারে যে দারিদ্র্যের ও অশান্তির আগুন জ্বালা হল তা জমিদারি

স্বৈরাচারেরই দৃষ্টান্ত। অর্থ ও প্রতিপত্তির মোহে আলেখ্য মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে নি। দরিদ্রের দুঃখের কথা ঘৃণায় অবজ্ঞায় কানে তুলতে চায় নি। আলেখ্যের এই শোষণস্পৃহা বেড়েই চলতো—যদি না বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলীর আত্মহত্যা, অমরনাথের প্রচ্ছন্ন অপমান ও নিতাই পণ্ডিতের সদুপদেশ তার মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করত ও পরিবর্তন আনত। অবশ্য এখানে আবার সেই প্রসঙ্গ এসে পড়ে। শরৎচন্দ্র জমিদারশ্রেণী মাত্রকেই দোষারোপ করেন নি। মানুষের মধ্যে যেমন ভালমন্দ ভুলভ্রান্তি থাকে জমিদারশ্রেণীও ত্রুটিশোধন করতে পারলে মানবতার আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। আলেখ্যের চারিত্রিক পরিবর্তনে সেই আভাস আছে।

জাগরণ উপন্যাসে কেবল জমিদার-প্রজা সংঘর্ষ, জমিদারের স্বৈরাচারের বর্ণনাই লেখক দেন নি—আলেখ্যের ভাবী স্বামী কমলাকিরণ ও মিস্টার রায়ের কথোপ-কথনের মধ্যে দিয়ে আরেকটি বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা হল সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা অর্থাৎ জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের আভাস। এই প্রসঙ্গে উভয়ের কথাবার্তা আংশিক উদ্ধৃত করা চলে—

কমলাকিরণ বলিলেন—আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার রে, কিন্তু আপনি নিজে জমিদার হলেও অনেক বিষয়েই ইনডিফারেণ্ট। আমি কয়েকটা বড় এস্টেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে একটা ব্যাপার সর্বত্রই ওয়াচ করে যাচ্ছি। কতকগুলো স্বদেশী ছাপমারা প্যাট্রিয়টদের পেশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেওয়া বল্‌শেভিক প্রোপাগাণ্ডা ও তাদের টাকাই হচ্ছে এর মূলে। আপনি নিশ্চয়ই জানবেন মিস্টার রে গভর্নমেণ্ট এমন অনেক কথাই জানে যা এ দেশের জমিদাররা ড্রিমও করে না।

গোড়াতেই বিশেষ একটু সচেতন না হলে সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় বিচিত্র নয়। আপনি নিশ্চয় জানবেন।

মনে রাখতে হবে জাগরণ দেনাপাওনা পল্লীসমাজ ইত্যাদি উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের সেই প্রাচীন অত্যাচারী জমিদার চরিত্রসৃষ্টিই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না—সেই সঙ্গে প্রজা জাগরণের ফলে শিথিলমূল সামন্ততন্ত্রের একটা বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

দেশপ্রেম প্রকাশের প্রধান অবলম্বন হয়েছিল জমিদারি অত্যাচারের পীড়িত প্রজারা, এর নাম আর যাইহোক বল্‌শেভিক প্রোপাগাণ্ডা যে নয় সে কথা শরৎচন্দ্র স্বীকার করেছেন। এবং মিস্টার রে-র মত জমিদাররাই হয়তো জমিদারি উচ্ছেদের পরোক্ষ সহায়ক হয়েছিলেন।

তাই শরৎচন্দ্র মিস্টার রে সম্পর্কে লিখেছেন—"কিন্তু জমিদারি যাঁহার তাঁহার মুখে আশঙ্কার কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে তিনি বলিলেন—পশ্চিমের ব্যাপার আমি ঠিক জানি নে বটে, কিন্তু আমাদের এই বংলাদেশে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ একটু অন্য রকমের। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। কমল প্রতিবাদ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—

২৫ বৎসর পূর্বে যা ছিল—আজও ঠিক তাই আছে কোন চেঞ্জ হয় নি। এ আপনি কি করে মনে করবেন ?"

তার উত্তরে রে সাহেব সেই পরিবর্তনের কথা মেনে নিয়েই তিনি বললেন কমল, শিক্ষার গুণে হোক, সময়ের গুণে হোক, জমিদারের অত্যাচারের ফলে হোক দেশের প্রজাদের মধ্যে যদি এতবড় পরিবর্তনই এসে থাকে জমিদার তারা চায় না, দুদিন আগে হোক পরে হোক, তাদের যেতেই হবে, তোমরা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

কিন্তু শুধু যদি আমার এই ছোট জমিদারীটুকুর কথাই বলো, তবে এই কথাটা আমার শুনে রাখ যে প্রজাদের আমি বাস্তবিক ভালবাসি। জমিদার হিসাবে নিজে কখনও অত্যাচার করি নি কর্মচারীদের সাধ্যমত করতে দিই নি।" তাঁর মেয়ের কথা থেকে জানা যায় রে সাহেব বহুবার প্রজাদের কাছ থেকে—জমিদারের প্রাপ্য খাজনা মাপ করেছেন। কিন্তু প্রজাদের সেই দেয় না দেওয়াকে মেয়ে অন্যায় প্রশ্রয় মনে করলেও তিনি তা করেন না—তাঁর বক্তব্য প্রাপ্য মানেই ন্যায্য নয় আমাদের যা প্রাপ্য প্রজাদের তা ন্যায্য দেয় নাও হতে পারে।

ঠিক এমনি কথা নিমাই পণ্ডিতের মুখ দিয়ে আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। সেখানে অবশ্য শুধু প্রজা-জমিদার নয়—চিরন্তন মানব অধিকারের প্রশ্নই নিমাই পণ্ডিত আলেখ্যর কাছে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত প্রজা-জমিদারের সম্পর্কের মধ্যেও শরৎচন্দ্র এই মানব অধিকারকেই বড় করে প্রচার করেছেন। এইখানেই—লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য।

নিমাই বলেছে—যারা জন্মেছে তারা যত দুর্বল, যত অক্ষম যত পীড়িতই হোক, বাঁচবার অধিকারে তাদের কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এতবড় জমিদারির দৈবাৎ আজ তুমি মালিক। তাই তোমার বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে আর একজনকে অনাহারে আত্মহত্যা করতে হবে, এত হতেই পারে না এবং যে সমাজ বিধানে এতবড় অন্যায় করাও তোমার পক্ষে আজ সহজ হতে পারল এ বিধান যত দিনেরই প্রাচীন হোক কিছুতেই এটা মানুষের সমাজের চূড়ান্ত এবং শেষ বিধান হতে পারে না।......অক্ষম অকর্মণ্য বলে আজ যাদের তোমরা বিচারের ভান করছ

তাঁদেরই ছেলেপুলের কাছে আর একদিন তোমাদেরই কর্মপটুতার জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন মনুষ্যত্বের আদালতে কেবল জমিদারির মালিক বলেই আরজি পেশ করা চলবে না।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে জমিদারি অত্যাচারে অভাগীর অভাগ্যকে দ্বিগুণতর হওয়ার কাহিনী লেখক আমাদের শুনিয়েছিলেন—কিন্তু সে ছিল প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ। বিচারের বাণী সেখানে নীরব নিভৃতে কেঁদেছে।

কিন্তু জাগরণে শরৎচন্দ্র আরেক ধাপ এগিয়েছেন—হয়তো যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই। তাই আলেখ্যর প্রশ্ন—প্রজারা কি বিদ্রোহ করবে আপনি বলছেন ?

নিমাই কহিলেন—'বিদ্রোহ শব্দটা শুনতে খারাপ, অনেকেই ওটা পছন্দ করে না। ওটা নিছক অবস্থা এবং শিক্ষার ফল। জগতে বুদ্ধিমানরা এতকাল তাদের আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। আজ হঠাৎ তাদের ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে। পেট না ভরলে তারা আর নীতির বচন এবং পুরানো আইন-কানুনের চোখ রাঙানিতে থামবে না এমন ত ভরসা হয় না।'

জাগরণ উপন্যাসে জমিদারিপ্রথার যেমন বিস্তৃত আলোচনা – ততটা না থাকলেও শরৎচন্দ্রের আরও বেশ কিছু উপন্যাসে জমিদারি চেহারার বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। যেমন বড়দিদি, দত্তা, বিপ্রদাস, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতি।

বড়দিদি উপন্যাসে লালতাগাঁয়ের জমিদাররূপে সুরেন্দ্রকে দেখাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে ছবি এঁকেছেন—তা চিরাচরিত জমিদারের একটা প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা।

বিলাসবহুল মোসাহেব পরিবৃত জীবনে যে কল্পবৃক্ষস্বরূপ তার স্তাবকবৃন্দ তার দাক্ষিণ্যে প্রতিপালিত অন্যদিকে প্রজাদের কাছে তিনিই হন মূর্তিমান শোষক। অর্থাৎ নিমাই যে কথা বলেছেন—জমিদারের বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে ভিখারী প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। অবশ্য সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্র তাঁর সেই চিরন্তন সুরটি বিস্মৃত হন নি—অর্থাৎ জমিদার মানুষটি নিজে খারাপ থাকেন না —আসল শয়তান তাঁর বকলমে যে ম্যানেজার বা নায়েব বা গোমস্তাটি কাজ করেন তিনি। তবে জমিদারের প্রধান ত্রুটি জমিদারি পরিচালনায় তাঁর ঔদাসীন্য এবং অক্ষমতা। অথবা গোমস্তা ম্যানেজাররাই জমিদারবাবুদের বিলাসী ও নিষ্কর্মা চরিত্রহীন ও কাজকর্মে উদাসীন করে তোলার রসদ যোগায় যাতে জমিদার নায়েব গোমস্তার কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিশ্চিন্ত থাকে। আর জমিদারের নামে স্বেচ্ছাচার চালায় নায়েব গোমস্তারা। তাদের ভিটামাটি উচ্ছেদ করে। মোটা ঘুষের টাকা খেয়ে বেআইনীভাবে অসহায়া বিধবার সম্পত্তি খাজনার দায়ে বাজেয়াপ্ত করে নেয় বাইরের লোক জানে এ সবই জমিদারের কাজ। জমিদারের নাম হয়

নিষ্ঠুর, অত্যাচারী অথচ জমিদার নিজেই জানে না—তাঁর নামে কি দুষ্কর্ম চলছে। জমিদারের পক্ষে অবশ্য এই নিষ্ক্রিয়তাই তাঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ।

সুরেন্দ্র ছিল এই শ্রেণীর জমিদার, আত্মভোলা, অধ্যয়নপ্রিয় এই মানুষটিকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত করে তুলেছে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী এবং স্তাবক বন্ধুরা। শরৎচন্দ্র এই সম্পর্কে লিখেছেন—সুরেন্দ্রনাথের যেমন সুখ্যাতি তেমনি অখ্যাতি। একদল লোক কহে এমন বন্ধুবৎসল উদারচেতা, অমায়িক ইয়ার প্রতিপালক জমিদার আর নাই। অন্যদল কহে এমন উৎপীড়ক অত্যাচারী জমিদার এ তল্লাটে কখনও জন্মায় নাই। আমরা জানি এ দুইটা কথাই সত্য। প্রথমটি সুরেন্দ্রনাথের জন্য সত্য দ্বিতীয়টি তাঁহার ম্যানেজার মথুরানাথবাবুর জন্য সত্য।

অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের এই বিলাসব্যসন ও ইয়ার প্রতিপালন ব্যাপারে মথুর বাবুর খুব উৎসাহ। এ সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—"খরচ যোগাইতে তিনি (মথুরবাবু) মুক্ত হস্ত। কিন্তু এজন্য জমিদারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। তাঁহার শাসনগুণে প্রজারা সে ব্যয় বহন করে। মথুরবাবুর নিকট একটি পয়সা বাকি বকেয়া থাকিবার যো নাই।

ঘর জ্বালাতে, ভিটা ছাড়া করিতে, কাছারি-ঘরের ক্ষুদ্র কুঠুরিতে দেনাপাওনাতেও খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারের কাছারি-ঘরে আবদ্ধ রেখে অত্যাচার করার বর্ণনা আছে—। আবদ্ধ করিতে তাহার সাহস ও উৎসাহের সীমা নাই।

প্রজার আকুল ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে সুরেন্দ্রপত্নী শান্তি দেবী মাঝে মাঝে স্বামীকে নিজে জমিদারি দেখতে অনুরোধ করেন ইয়ার বন্ধু নিয়ে বসে থাকার জন্য অনুযোগ করেন এবং মাঝে মাঝে ম্যানেজারকে দূর করে দেবার কথাও বলেন।

সুরেন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল হলেও মনুষ্যত্বহীন নন। তাই মাঝে মাঝে শান্তির কথায় যখন জমিদারি দেখার উৎসাহ প্রকাশ করে তখনই মহাবিপদে পড়ে মথুরবাবু বলেন এমন করলে কি জমিদারি রাখতে পারবে? উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাসি হেসে বলে—দুঃখের রক্তশুষে এমন জমিদারীতে কাজ কি মথুরবাবু?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মথুরবাবু টিকেই থাকেন এবং জমিদারি অত্যাচারও পূর্ণো-দ্যমে চলতে থাকে। বড়দিদি বিধবা মাধবীর গোলগাঁয়ের জমিদারি নিয়ে কূটচক্রান্ত চলতে থাকে। জমিদারের খাজনা বাকী—এই অজুহাত দেখিয়ে চাটুয্যে-মশায় মাধবীকে বোঝায় তার কিছু জমি বিক্রয় হয়েছে আর কিছু বন্দোবস্ত হয়েছে। মাধবী জমি বিক্রয় বা বন্দোবস্তের কাগজ দেখাতে চাইলে অগত্যা চাটুয্যেমশায় ম্যানেজারের সঙ্গে যোগসাজস করতে বাধ্য হয়। কারণ এইসব কারসাজীর ব্যাপারে জমিদারের ম্যানেজারের মত এতবড় সহায় আর নাই।

পঁচিশ বিঘা জমির মূল্য প্রায় তিন হাজার টাকা—সেই লাভের ভিত্তিতে জমিদারের কাছারিতে সেলামী বাবদ ম্যানেজার দাবী করলেন হাজার টাকা, চাটুয্যে রাজী হল। এই বিষয়ে উভয়ের পরামর্শ মত যে ব্যবস্থা হল সে সম্পর্কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—

"যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রতি বাকি খাজনাবাবদ দশবৎসরের সুদে আসলে দেড়সহস্র টাকার নালিশ হইল। শমন বাহির হইল। কিন্তু মাধবীর নিকটে তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর এক তরফা ডিক্রী হইয়া গেল এবং দেড়মাস পরে মাধবী সংবাদ পাইল যে বাকি খাজনার দায়ে জমিদার সরকার হইতে তাহার মার বাটীশুদ্ধ নীলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে।"

জমিদারের অজ্ঞাতেই সবকিছু ঘটনা ঘটে কিন্তু নাম হয় জমিদারের। জমিদার প্রজাদের কাছে হন নিষ্ঠুর অত্যাচারী। শরৎচন্দ্র প্রজাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে সে কথায় উল্লেখ করেছেন। জমিদারের আচরণের প্রতিবাদে মাধবী প্রতি-বেশিনীকে প্রশ্ন করে—"তোমাদের কি মগের মুল্লুক ?

কেন বল দেখি ?

তা নয় তো কি। একজন ঠকিয়ে আমার সর্বস্ব নিতে চায় তোমরা দেখছ না। সে বলিল—আমরা আর কি করব, জমিদার যদি নীলাম করে, আমরা দুঃখী লোক তাতে কি করতে পারি ?" তারপর প্রতিবেশিনী জমিদার সম্পর্কে যে বর্ণনা দিল তা জমিদার সম্পর্কে চিরন্তন ধারণারই প্রকাশ।

"এমন উৎপীড়ক জমিদার, এমন অত্যাচার এদেশে কখনও পূর্বে দেখে নাই।"

মাধবী স্বয়ং জমিদারের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে প্রতিকার দাবী করবে এই সংকল্প করেছিল কিন্তু তার রূপযৌবনের জন্য প্রতিবেশীরা জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করল কারণ জমিদারের চরিত্রহীনতার কথাও সর্বজনবিদিত ছিল।

কিন্তু জমিদারের এই পরিচয়ের পিছনে কার হস্তক্ষেপ ছিল সে বিষয় শরৎ-চন্দ্র গোপন করেন নি। প্রজার কাছে জমিদারকে নিষ্ঠুরতার প্রতীক হিসাবে দেখা-নোই তাঁর উদ্দেশ্য এবং অভীষ্টসিদ্ধির উপায়।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে যখন আত্মসচেতন হত তখন মাঝে মাঝে সে আদায়-উসুল বাকি-বকেয়া জমাখরচ, বন্দোবস্ত মামলামকদ্দমা নথিপত্র সব যাবতীয় জমিদারের কাছারির ব্যাপার নিয়ে বসত। সেই সূত্রেই মাধবী নাম্নী বিধবার ঘর-বাড়ী এবং দশ বৎসরের খাজনার দায়ে বেনামী নীলামে করে নেওয়ার

ঘটনা তার চোখে পড়ল এবং সুরেন্দ্র ম্যানেজারকে তলব করে পাঠান। এর পরবর্তী ঘটনা যাইহোক এর থেকে জমিদারের খেয়াল খুশিমত আচরণ প্রজা উচ্ছেদের একটি চমৎকার নজীর পাওয়া যাবে।

শরৎচন্দ্রের দত্তা উপান্যাসের মূল বিষয় যদিও বিজয়া-নরেন্দ্রের প্রেম এবং বিবাহ, তথাপি এই প্রেম প্রথম অবস্থায় বাহ্যিক বিরোধ ও সংঘাতের সূত্র ধরেই অগ্রসর হয়েছে। এবং এই বিরোধ ছিল প্রধানতঃ একজন জমিদার ও প্রজার।

পিতৃবন্ধু জগদীশের ঋণশোধের ছলে তার পুত্র নরেন্দ্রের ভিটামাটি উচ্ছেদের জন্য রাসবিহারী ও তৎপুত্র বিলাসবিহারী বিজয়াকে প্ররোচনা দিয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী জমিদারের শান্তিরক্ষার জন্য হিন্দুদের দুর্গোৎসব ও ঢাকঢোল বাদ্য নিষেধ করা হল। উপরন্তু নরেন্দ্রের পিতৃক বাটীতে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন হতে লাগল। জমিদারের নাম নিয়ে আসলে এর সবকিছুই রাসবিহারীর চক্রান্ত, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল পুত্রের সঙ্গে বিজয়ার বিবাহ দিয়ে সমস্ত জমিদারী হস্তগত করা। তাই জমিদারের ম্যানেজারের কাজ তিনি করছিলেন।

নরেন্দ্র যখন আত্মপরিচয় গোপন রেখে প্রজার তরফ থেকে জমিদারের কাছে সোজাসুজি আবেদন জানাতে এল যাতে হিন্দুদের প্রির আকাঙ্ক্ষিত দুর্গাপূজায় যেন বাধা না দেওয়া হয়, তখন বিলাসবিহারী যে অপমান করলেন স্বয়ং জমিদার তনয়া বিজয়া তা করে নি বরং প্রজাদের আবেদন রক্ষার আশ্বাস দিয়েছিল কিন্তু ম্যানেজারের প্রতাপের কাছে জমিদার যে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেন এবং তাঁর প্রজা-বাৎসল্য যে লোকচক্ষুর অগোচরেই থেকে যায় জমিদার বিজয়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতি-ক্রম ঘটে নি। তবে নরেন্দ্রের প্রভাবে ক্রমশঃ বিজয়ার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে থাকে।

গ্রামের মধ্যে নরেনের স্কুল চালানো, তাতে গ্রামবাসীদের হাতে কলমে কৃষি-কার্যের পদ্ধতি শেখানো, দেশের নিরন্ন মানুষের প্রতি তার আন্তরিক মমতা—বিজয়ার চরিত্রগত দাম্ভিকতাকে খর্ব করতে থাকে। গ্রামে প্রথম পদার্পণের সময় যে জমিদারী মনোভাব নিয়ে সে এসেছিল ক্রমশঃই নরেন্দ্রের প্রভাবে সে মনোভাব পরিবর্তিত হল। তখন রাসবিহারী প্রভৃতির অর্থসংগ্রহের নেশা আর বিজয়ার মনকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। একদিন চরম উষ্মার মুহূর্তে বিজয়া তাই বিলাসকে রূঢ় ভাষায় অপমান করে বলে যে তার সংগে দয়ালের কোনও অধিকারগত পার্থক্য নেই কারণ তারা দুজনেই জমিদারের সেরেস্তার কর্মচারী—অতএব বৃদ্ধ দয়ালকে কাজের ত্রুটির জন্য বরখাস্ত করার ক্ষমতা বিলাসের নেই। এই সময় বিজয়ার মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তা জমিদার মাত্রেরই

থাকা উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ জমিদার চরিত্রে এই ধরনের ব্যক্তিত্ব দেখা যায় না এবং সেই কারণে তিনি ম্যানেজার এবং গোমস্তার হাতের ক্রীড়াপুত্তলীমাত্র হয়ে থাকেন। বিজয়ার মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের জাগরণ নরেন্দ্রের পরোক্ষ প্রভাবও হতে পারে।

তবে দত্তা উপন্যাসে গোমস্তা বা নায়েব লোকটি অর্থাৎ দয়াল অত্যন্ত নিরীহ ও সৎপ্রকৃতি কিন্তু জমিদার নায়েব এবং প্রজার মধ্যে তৃতীয়পক্ষ রাসবিহারীই এখানে প্রবল প্রতিপক্ষ। বিজয়ার সংঘর্ষ তারই সংগে, নায়েবের সংগে নয়।

জমিদারচরিত্র এবং জমিদারী বিষয়ের ইঙ্গিত শরৎচন্দ্রের আরও কয়েকটি উপন্যাসে পাওয়া যাবে। তার মধ্যে হিন্দু জমিদার পরিবারের রক্ষণশীলতা ও ও সাবেকী চালের প্রতি তীব্র আক্রমণ আছে বিপ্রদাস উপন্যাসে।

বিপ্রদাসের বন্দনা প্রগতিশীলা নারী চরিত্র। বিপ্রদাস ও দ্বিজদাস দুজনেই জমিদারপুত্র এবং জমিদারীর সমান অংশভাগে। কিন্তু বিপ্রদাসই প্রকৃত জমিদারীর পরিচালক এবং তার মায়ের মনের মত ছেলে। কিন্তু দ্বিজদাস একটি ব্যতিক্রম। দেশপ্রেমের বহ্নিতে সে উদ্দীপ্ত। কৃষক মজুর শ্রেণীর সে নেতা। তারই নেতৃত্বে গ্রামের অন্য নেতারা মিছিল করে এগিয়ে চলে। তাদের জমিদার বিপ্রদাস সম্পর্কে তাদের মন্তব্য—ওরাই তো আমাদের পরম শত্রু—আমাদের গায়ের রক্ত অহরহ শুষে খাচ্চে। আমাদের আসল অভিযান ওদেরই বিরুদ্ধে।

ভারতের দেশাত্মবোধ প্রাথমিক ভাবে যে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাবিক্ষোভকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার কারণও জমিদারের প্রজাশোষণ এবং প্রজার অধিকারে হস্তক্ষেপ মানেই ছিল গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা। কিন্তু দেখা যেত জমিদার পরিবারের মধ্য থেকেই এই গণতন্ত্রের চেতনা জেগেছে বহু ক্ষেত্রে। তারাশঙ্করের ধাত্রী দেবতার যেমন শিবনাথ চরিত্র। দ্বিজদাসও ঠিক তেমনি করেই বলেছিল—ওতে ( জমিদারীতে ) আমার এক বিন্দু লোভ নেই। দেশের পনের আনা লোক একবেলা পেটভরে খেতে পায়না—উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও না আর বিনা পরিশ্রমে আমার বরাদ্দ পোলাও কালিয়া ও পাপের অন্ন আমার মুখে রোচেনা। গলায় আটকাতে চায়। ও বিষয় আমার গেলেই ভাল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিজদাসের কৃষক প্রজা নিয়ে মাতামাতির চেয়ে বিপ্রদাসের উদার মহত্ত্বকেই শরৎচন্দ্র বড় করে দেখিয়েছেন এবং সে ব্যক্তিত্বের কাছে বন্দনা দ্বিজদাস সকলেই হার মেনেছে।

যদিও বন্দনা বিপ্রদাসের হিন্দুয়ানী ও রক্ষণশীল বনেদী চালকেই বার বার আক্রমণ করেছে এবং সেই কারণে জমিদারী ব্যবস্থার বিশেষ আলোচনা হয়নি—

তথাপি বিপ্রদাসকে শরৎচন্দ্র আদর্শ জমিদার করেই তৈরী করেছেয। বিপ্রদাস হিন্দু মুসলমান সকল প্রজার জন্য টোল মকতব খুলেছেন – প্রজাদের জল নিকাশের জন্য খাল কেটেছেন এবং তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে দান করে চলেছেন—দানের অঙ্কও বিরাট। দ্বিজদাসের বিরোধিতা দিয়ে কাহিনীর শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র জমিদারের আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতার হয়তো ক্ষীণ প্রতিরোধ চেষ্টাও থাকতে পারে।

চন্দ্রনাথ উপন্যাসেও চন্দ্রনাথ জমিদার, জমিদারের প্রাসাদ বাড়ীর বর্ণনা ও জমিদারের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ ছাড়াও এখানে একটা মূল্যবান কথা আছে—চন্দ্রনাথের স্ত্রী সরযূর বংশ পরিচয় প্রকাশ হবার পর সকলেই তাকে ত্যাগ করতে বলল। চন্দ্রনাথও তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন পর পুনরায় তিনি সরযূ ও তার পুত্রকে ফিরিয়ে আনেন। মণিশঙ্কর এ কাজ মেনে নিলেন এবং মহা আড়ম্বরে পুত্রের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করলেন। তখন চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিল—'কিন্তু সমাজ'? মণিশঙ্কর তদুত্তরে বলেছিলেন 'সমাজ আমি সমাজ তুমি। এ গ্রামে আর কেউ নেই। যার অর্থ আছে সেই সমাজপতি।'

অতএব জমিদারই হন সমাজপতি এবং তাঁর কাজের সমালোচনা করার অধিকারও অন্য মানুষের নেই। তাই মণিশঙ্কর যখন পুত্রসহ সরযূকে গ্রহণ করে সামাজিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করলেন—তখন সরযূর ত্যাগের ব্যাপারটা প্রজাদের কাছে মনে হয়েছিল "একটা মিথ্যা অপবাদ রটনা হইয়াছিল হয়ত সে একটা জমিদারী চাল মাত্র।"

জমিদারের স্বৈরাচারের এও আর একদিক। কাশীনাথ গল্পে জমিদারের প্রাসাদবাড়ীতে সোনার খাঁচায় বন্দী জামাতা কাশীনাথের হৃদয়বেদনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের স্বাধীনতার আনন্দের সংগে জমিদারশ্রেণীর অভিজাত্যময় কৃত্রিম জীবন ধারার এক সুন্দর বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে। এ জীবনে বিলাস আছে কিন্তু স্বাধীনতা কম—আত্মমর্যাদা হারাবার ভয়ে সাধারণ মানুষের সংগে তারা দূরত্ব রক্ষা করে চলে। সাধারণ ঘরের ছেলে আত্মভোলা অধ্যয়নপ্রিয় কাশীনাথ তাই বড়লোক জমিদার শ্বশুর বাড়ীতে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। কাশীনাথের স্ত্রী কমলা সে কথা বোঝে কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হয় অন্য রকম। কাশীনাথকে জমিদারের ম্যানেজারের পদ দিয়ে শ্বশুর প্রিয়বাবু নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন, কাশীনাথও কাছারির কাজকর্ম মোটামুটি মনোযোগের সঙ্গে করত যদিও তার মন তাতে বাঁধা পড়ে নি, কমলা তার প্রতিশোধ নেবার

জন্য বিশেষতঃ স্ত্রীর প্রতি কাশীনাথের একপ্রকার ঔদাসীন্যের প্রতিফল দেবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করেছিল কমলাকেই সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা দেবার। পিতাও কন্যার অনুরোধ রেখেছিলেন। সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবার পর কমলা কাশীনাথের পরিবর্তে নূতন ম্যানেজার নিয়োগ করে পূর্ণোদ্যমে জমিদারির চালনা করতে লাগল তার ক্ষমতালোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব পর্যন্ত খাজনার দায়ে অপহরণ করতে দ্বিধা করে না।

নতুন ম্যানেজার বিজয়বাবুর উৎসাহে মোকদ্দমা শুরু হল—কাশীনাথ বিপক্ষের সাক্ষ্য দিয়ে জমিদারের দাবি যে অন্যায় তা প্রমাণিত করল।

কাশীনাথের প্রতিপক্ষতায় মামলায় হার হওয়াতে কমলার ক্রোধ দ্বিগুণ বেড়ে গেল এবং কাশীনাথ গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হল। কিন্তু নিস্তার পেল না—অন্ধকারে আততায়ীর হাতে কাশীনাথ খুন হল। রক্তাক্ত অবস্থায় ধূলায় লুটিয়ে পড়েছিল কাশীনাথ। এমন কি এই হত্যার চেষ্টার পিছনে কমলার হাত আছে সে সন্দেহও তার মনে জেগেছিল। পরে শরৎচন্দ্র কাশীনাথ কমলার ভুল বোঝা-বুঝির অবসান অন্যভাবে ঘটিয়ে যদিও উপন্যাসের গতি রক্ষা করেছেন কিন্তু কমলা-কাশীনাথের বিরোধের মধ্যে যে সত্য ফুটে উঠেছে তা সেই সামন্ততন্ত্রের চিরন্তন অধিকার প্রমত্ততা, অন্যায়, অর্থলোভ, স্বার্থান্ধতা এবং স্বার্থের জন্য নির্মম গুপ্তহত্যাকেই সূচিত করে। অবশ্য এখানে কেবল নায়েব অপরাধী নয়—জমিদারই এখানে সক্রিয়ভাবে অপরাধী।

আরও দুটি উপন্যাসে জমিদারের চরিত্রচিত্র ফুটে উঠেছে—তার একটি দেবদাস ও অপরটি শুভদা।

দেবদাসের দেবদাস জমিদারপুত্র—অতএব অর্থকৌলীন্যের অধিকারী। সেই কারণেই কেনাবেচা ঘরের মেয়ে পার্বতীর সঙ্গে দেবদাসের বিবাহ সম্ভবপর হল না।

দ্বিতীয়তঃ, পিতার জীবদ্দশা এবং মৃত্যুর পরও প্রভূত অর্থ হাতে থাকার জন্যই দেবদাস উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রায় গা ভাসিয়ে দিতে পেরেছিল। এ ক্ষেত্রে পার্বতীকে ভোলা এর প্রধান উদ্দেশ্য হলেও জমিদার দুলালের সাধারণ চরিত্রধর্মই দেবদাসে প্রকাশ পেয়েছে বলা যায়। পার্বতীর যেখানে বিয়ে হল তিনিও প্রবীণ জমিদার ভুবন চৌধুরী। তাঁর বাড়ীঘর ও সাবেকীচালের বর্ণনায় জমিদার বাড়ীর প্রথাসিদ্ধ বর্ণনাই শরৎচন্দ্র দিয়েছেন। ভুবন চৌধুরীর বিরাট বাড়ী, অতিথি সৎকার, দোলদুর্গোৎসব, বিলাসবহুল জীবন, সদর মহল, অন্দর মহল, পূজার দালান, নাটমন্দির, অতিথিশালা, কাছারি-বাড়ী, তোষাখানা, দাসদাসী—পুরাতন সেকেলে

জমিদারের সবটুকু বৈশিষ্ট্য শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন--তবে দ্বিতীয়বার দারগ্রহণ এবং তরুণী পত্নীর নিকট আত্মসমর্পণের দরুন ভুবন চৌধুরীর চরিত্রের শুচিতা রক্ষিত হয়েছে। ভুবন চৌধুরী চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসের রামসদয় চরিত্রের কথা স্মরণ করায়।

শরৎচন্দ্রের অপর উপন্যাস শুভদা। শুভদায় দুই ভিন্ন প্রকৃতির জমিদার চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। হলুদপুরে অর্ধক্রোশ দূরে বামুনপাড়ার জমিদার নন্দীরা। ললনার পিতা হারান মুখুয্যে সেই জমিদারের সরকারে কুড়িটাকা বেতনে কাজ করতেন। কিন্তু অভাবের তাড়নায় হারান অসৎ উপায়ে সরকারী তহবিলের কিছু অংশ নিজের বাবদ ব্যয় করতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ সেই চুরির পরিমাণ দাঁড়ায় তিন হাজারেরও বেশী টাকা।

জমিদার ভগবান নন্দীর চরিত্র শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দয়ালু ধর্মনিষ্ঠ ও বিশ্বাসীরূপে চিত্রিত করেছেন। সেই হিসাবে তিনি হারানবাবুকে প্রথমটা অবিশ্বাস করেন নি। পরে যখন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খাতাপত্রের হিসাব পরীক্ষা করলেন তখন চুরি ধরা পড়ল। তিনি খোলাখুলিভাবেই হারানকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এবং এ কথাও বললেন চুরি না করে যদি সে জমিদারের কাছে অর্থ সাহায্য চাইত তিনি নিশ্চয়ই তা দিতেন। এবং সেই সঙ্গে হারানকে তার জমিজেরাত কিছু থাকলে তা বিক্রয় করে অর্থ পরিশোধ করতে বললেন। কিন্তু হারান বলেছিল জমিজেরাতের মধ্যে আমার একমাত্র ভদ্রাসন আছে, তাই বিক্রি করে নিন।

জমিদার ভগবান নন্দী হারানের পারিবারিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়ে যখন জানলেন তারা প্রকৃতই দুঃস্থ—তথাপি হারান অসদুপায়ে অর্থসংগ্রহ করে গাঁজার নেশা করে, তিনি তাকে শাস্তি দেবার জন্য পুলিসের সাহায্যে হারানকে হাজতে পাঠালেন।

কিন্তু তিনিই আবার হারানের স্ত্রী শুভদার সঙ্গে ব্যবহারে অসীম উদারতার পরিচয় দিলেন। গভীর রাত্রিতে শুভদা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল তিনি মনে করেছিলেন তাঁর চরিত্রহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদের কাছেই এই স্ত্রীলোকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরে যখন তিনি জানলেন শুভদা স্বামীর মুক্তি প্রার্থনায় শেষ সম্বল বালাদুগাছি সঙ্গে করে এনে জমিদারের করুণা প্রার্থনা করছে তখন ভগবান নন্দী বললেন "সে যেরকম দুশ্চরিত্র তার শাস্তি পাওয়াই উচিত ছিল —তবুও তোমার জন্য ছেড়ে দেব।"

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে জমিদারের প্রজাপালক চরিত্রটি চমৎকার ব্যঞ্জিত

হয়েছে। জমিদার প্রজাকে শুধু শোষণই করেন না—পিতার মত দুষ্ট প্রজাকে শাসন এবং ক্ষমাও করেন—ভগবান নন্দী তারই আদর্শস্থল। এই ধরনের আদর্শবান জমিদার সেকালে বিরলদৃষ্ট ছিল না।

এই পাশাপাশি আর একধরনের জমিদার চরিত্র ফুটে উঠেছে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে। অবশ্য এই চরিত্রই বিলাসী জমিদার সম্পর্কে আমাদের বিশিষ্ট ধারণার প্রতীক। সুরেন্দ্রনাথ নারায়ণপুরের জমিদার। বায়ু পরিবর্তনের জন্য নৌকাযোগে ভ্রমণ করতে বার হয়েছেন। তাঁর বয়স—আয় অনেক। কাজেই পারিমিত্র ও বিলাসিতার অভাব নেই। বায়ু পরিবর্তনও তাঁর একটা খেয়াল। ইয়ার বন্ধুদের উৎসাহেই তিনি সুসজ্জিত বজরায় দু-তিন মাসের জন্য জলযাত্রায় বার হলেন। সঙ্গে বাঈজী জয়াবতী। সুরেন্দ্রনাথের মতে স্ত্রীপুত্র ও বাড়ীর জন্য মন খারাপ হওয়া কাপুরুষতার নামান্তর। তাঁর বন্ধুরা অবশ্য বেশীদিন প্রবাসে থাকতে রাজী হল না। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর সে কাপুরুষতা নেই। তাঁর মধ্যে বাইরের আসক্তি বেশী। এই ধরনের বহিরাসক্তি অধিকাংশ জমিদার চরিত্রের অঙ্গ ছিল। সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক আসক্তি ছিল—সেখানে প্রেম বলে কিছু নয়। তাই জয়াবতীর স্থান মালতী অনায়াসেই অধিকার করে। নারায়ণপুরের জমিদার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন "শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে অনেকেই বোকা মনে করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা ছিলেন না। কিন্তু অনেক সময় তিনি দুর্বল প্রকৃতির লোকের মত কর্ম করিতেন, এইজন্য তাঁহাকে সহজে বুঝিতে পারা যাইত না।"

ললনা ওরফে মালতীকেও তিনি সাধারণ স্ত্রীলোক, যারা অর্থের সন্ধানে কলিকাতায় যেতে চায় তাদের মতই মনে করেছেন। মালতীর কান্নায় তাই সুরেন্দ্রবাবুর হাসি পায়। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—পরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হাসি আসিল। কারণ এসব লোকেরও যে কাঁদিবার যথেষ্ট কারণ থাকিতে পারে সকলেই যে শুধু মন ভোলাইবার জন্য কাঁদে না—তাহা তিনি কুসংসর্গ দোষে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।

পরে জয়ার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত সুরেন্দ্রনাথের যেন নতুন জীবন ফিরে এল এবং সে মালতীকে বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে মালতীর পিতামাতাকে অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—যদিও কার্যতঃ বিবাহ হয় নি।

তবু এ কথা সহজেই অনুমেয় যে ধনী বিলাসী জমিদারশ্রেণী নারীর মূল্য চিরদিন অর্থ দিয়েই ধার্য করতে চেয়েছে। তবে যদি কোনও মানসিক আঘাতে তার চরিত্র পরিবর্তন ঘটে—তখন সে মানুষকে মূল্য দিতে শেখে। সুরেন্দ্রনাথকে

শরৎচন্দ্র সেই চিরন্তন জমিদার করে যদিও তৈরী করেছিলেন—তথাপি এখানেও শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদ মিশিয়ে দিয়েছেন।

সম্ভবতঃ আদর্শবাদী শরৎচন্দ্র জমিদারশ্রেণীর সামনে এক মানবতার আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসগুলিতে অধিকাংশ জমিদারই আদর্শচরিত্র হয়ে উঠেছে। তবে গোমস্তা বা নায়েবদের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ এবং এদেরই জন্য জমিদাররা নিন্দিত হন—যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা মহৎ হয়ে থাকেন এইভাবে নায়েবশ্রেণীকে দায়ী করে জনসাধারণের চোখে জমিদার-শ্রেণীকে দোষমুক্ত করে তাঁদের শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র। এমন কি নায়েব-গোমস্তার চক্রান্তের কাছে জমিদারশ্রেণী যে কত অসহায় সে কথাও প্রকাশ করে তিনি তাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। তবে দীর্ঘকাল ধরে শোষণের উৎপীড়নে যদি প্রজাসাধারণ জমিদার বিরোধী হয়ে তার বিলুপ্তি কামনা করে—তাতে শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট সমর্থন আছে। জাগরণ উপন্যাসে তিনি প্রজার সেবার মধ্য দিয়েই একমাত্র জমিদারের শোষণের প্রায়শ্চিত্ত করার পথ আছে—এ কথা বলেছেন।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে সাধুর কথায় শ্রীকান্ত তারই আভাস পেয়েছে অথাৎ প্রজার মঙ্গলসাধনের মধ্য দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা।

শ্রীকান্ত যখন গ্রামে পা দিল তখন তাকে গ্রামের মানুষদের অভাব অনটন অস্পৃশ্যতা দুর্গতি ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে সাধু বলল—দাদা এই হচ্ছে দেশের সত্যিকার ছবি।

পরে আরও বলে—দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করে দাদা? মন ত? কিন্তু সে বলেই কি আমরা আর এদের রেখেছি? বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিঙরে বার করে দিয়েছি। এর বেশি চাওয়াকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্ধা বলে মনে করে।

কি কলই না আমাদের বাপ পিতামহরা ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন?

এ বছর ফসল ভাল হয় নি সাধু সে কথা জানিয়ে শ্রীকান্তকে বলল—দাদা যে ছলেই হোক ভগবান যখন আপনাকে আপনার প্রজাদের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েছেন তখন হঠাৎ আর পালাবেন না। বিশেষ কিছু যে করতে পারবেন তা ভাবি নে, তবে চোখ দিয়েও প্রজার দুঃখের ভাগ নেওয়া ভাল। তাতে জমিদারি করার পাপের বোঝাটা কতক হাল্‌কা হয়।

হয়তো জমিদারি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের শেষ কথাই এই ছিল। সাধুর মুখে সে ইঙ্গিতই পরিস্ফুট।

# তারাশঙ্কর

শরৎচন্দ্রের পর ক্রমবিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের লুপ্ত গৌরব ও নূতন পুরাতনের সন্ধিক্ষণের এক মর্মস্পর্শী চিত্র যিনি নিজের জীবনের মধ্যে অনুভব করে সাহিত্যে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তিনি হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজে জমিদার বংশীয় বলেই একদিকে যেমন লুপ্তশ্রী সামন্তদের জন্য একটা বিষাদবোধ তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন—অন্যদিকে উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ কলাকার হিসাবে নবজাগ্রত ব্যক্তিত্বের উন্মেষকে তিনি সাদর এবং উত্তপ্ত অভিনন্দন জানিয়েছেন। মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধনের ফলে সামন্ততন্ত্রের কাঠামো কিভাবে একটু একটু করে গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে তারও প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনায়। নূতনকে গ্রহণ করেও তিনি অতীতকে বিস্মৃত হতে পারেন না। সামন্ততন্ত্রের চিরাচরিত প্রথার অচলায়তনের সঙ্গে আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তাঁর রচনায়। অত্যাচারী জমিদারদের শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, জনগণ জেহাদ ঘোষণা করে সেই সঙ্গে চলে নূতন নূতন আইন প্রণয়নের প্রহসন। অথবা সেই জমিদারিব্যবস্থার প্রাচীন ঠাঁট ও দম্ভকে চূর্ণ করে আবির্ভাব হয় কোনও বিদ্রোহী বংশধরের—ফলে পরিবারের মধ্যেই শুরু হয় অন্তর্বিরোধ। কেবল রাজায় প্রজায় নয়, রাজায় রাজায় নয়—শুরু হয়ে যায় আত্মিক দ্বন্দ্ব।

জমিদারিব্যবস্থার মধ্যে যেমন ক্ষমতার লড়াই আছে—আছে ক্ষমতা হস্তান্তর অথবা ক্ষমতা বিলোপেরও ব্যবস্থা। পুরাতন জমিদারকে সরিয়ে দিয়ে নতুন জমিদার আসে অর্থাৎ যাঁদের জমিদারের নীলরক্ত নেই—কিন্তু ক্ষমতা ও অর্থের সাহায্যে যারা চাষী থেকে পত্তনিদার বা জমিদার হয়ে উঠেছে। তাদের শোষণ ও অত্যাচার হয় আরও তীব্র। তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, একদিকে যেমন রাঢ়ভূমের আঞ্চলিকতার প্রভাবে লালিত অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রের নানান দিক এখানে আলোচিত হয়েছে।

ধাত্রীদেবতায় চিরন্তন জমিদারি অভিমান ও আড়ম্বরের সঙ্গে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। এর ফলে জমিদারি গৌরব শেষ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে ব্যক্তিত্বের মহিমার কাছে।

এই জমিদারি আত্মাভিমান ও দম্ভের দুই প্রকাশ ধাত্রীদেবতার পিসিমা ও গৌরী চরিত্রে। শিবনাথ জমিদারের ছেলে আর পিসিমা জমিদারের ভগ্নী।

পিসিমাই শিবনাথের ধাত্রীদেবতা। তাঁর শিক্ষা শাসন শিবনাথকে এক আদর্শ জমিদারে পরিণত করতে চায়। বংশগৌরবকে তিনি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চান না। শিবনাথের মধ্যে জমিদারি মেজাজকে উৎসাহিত করে তোলার জন্য তিনি দুঃসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবনাথের জীবনে তার মায়ের প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠা দায় হয়। শেষ পর্যন্ত স্বদেশই হল তার ধাত্রীদেবতা অর্থাৎ যে লালন করে।

শিবনাথের বংশপরিচয় দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর এক ক্ষুদ্র জমিদারের পরিচয় দিয়েছেন। বাঁড়ুজ্জেরা ক্ষুদ্র জমিদার। সাত আনায় শিবনাথের আয় হাজার চারেক টাকা। তবে পাকা বন্দোবস্ত অনেক আছে—পালকি বহনের বেহারা চাকরাণ জমি ভোগ করে। মহলে পাইকদের জমি দেওয়া আছে। সদরে কাজ করবার জন্য পাইকের কায়েমী বন্দোবস্ত। নাপিত বৃত্তিভোগী পুরোহিতের দেবোত্তরের পূজক এমন কি গয়া শ্রীক্ষেত্র কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানের পাণ্ডারা পর্যন্ত জমি ভোগ করে। জমিদারের কাছারি-বাড়ীর বর্ণনাতেও তিনি চিরন্তন জমিদারি ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের চিত্র তুলে ধরেছেন। বিবাহ উৎসবে জমিদারি ঠাঁট বজায় রাখার জন্য বাবুদের কারখানায় খেমটা নাচের ঐতিহ্যকেও পিসিমা শিবনাথের বিবাহে বাদ দিতে চাননি। যদিও মাত্র সাত আনার জমিদারের পক্ষে বিলাসিতার জন্য অপব্যয় করার মত অর্থ ছিল না তা ছাড়া দিনকাল খারাপ দুর্মূল্যের বাজার।

ক্ষুদ্র জমিদার হলেও পিসিমা সেই জমি ও জমিদারি নিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য খরচ করে শিবনাথকে ঘোড়া কিনে দিলেন। কিন্তু সেকালে যে বিষয়টি সবচেয়ে অভিযোগের ছিল—মাটির সঙ্গে, প্রজাসাধারণের সঙ্গে জমির মালিকের যোগ না থাকা। সেইখানেই শিবনাথের ও তার মায়ের সঙ্গে পিসিমার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। শিবনাথ জনজীবনের মধ্যে নেমে এসে সেই চিরন্তন জমিদারী দম্ভের বিরুদ্ধে, জনমনে প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছে। শিবনাথ জনগণের সেবা করুক, চাঁদা তুলে দরিদ্রভাণ্ডার খুলুক—এ পিসিমার ইচ্ছা নয় কারণ সেই আভিজাত্য বোধ। জমিদারপুত্র হয়ে শিবনাথ কেন ছোটলোক প্রজার সঙ্গে মিশবে? শিবনাথের পড়াশোনার জন্য তার মা তাকে জমিদারের কাছারিতে বসতে দিতে চায় নি এতে পিসিমার ঘোর আপত্তি। জমিদার বাড়ীর বৌ জ্যোতির্ময়ী এতখানি বয়সেও কোনও প্রয়োজনেই অন্তঃপুরের পর্দা ঠেলে বহির্বাটিতে আসতে পারেন না। পিসিমা সবক্ষেত্রেই পুরানো সেই জমিদারি ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু যুগধর্মের প্রভাবে তা স্থায়ী হল না।

স্রোতের টানে পিসিমাকেও নেমে আসতে হল জনগণের মধ্যে। জমিদারের অহমিকা এবং একান্ত বস্তুতান্ত্রিক, স্বার্থপর জমিদার চরিত্রের স্ত্রীরূপ হল গৌরী চরিত্র। কিন্তু তাকেও শেষ পর্যন্ত শিবনাথের আদর্শকে বড় বলে মেনে নিতে হয়েছে। নবজাগ্রত আদর্শবাদ এবং দেশপ্রেমের কাছে স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব জমিদারি ঐতিহ্যের এ এক শোচনীয় পরাজয়। তারাশঙ্কর এখানে আদর্শকেই বড় করেছেন।

অপর দুই গ্রন্থ গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম। গণদেবতারই দ্বিতীয় পর্ব পঞ্চগ্রাম। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত চণ্ডীমণ্ডপ নামক ধারাবাহিক উপন্যাসটিরই সংশোধিত রূপ হল গণদেবতা।

গণদেবতায় সমাজের দুটি দিক। একদিকে চাষী, মজুর, কামার, কুমোর, ছুতোর, নাপিত আর একদিকে জমিদারশ্রেণী। এই জমিদারিপ্রথা আবার নানা বিবর্তনের সম্মুখীন। প্রাচীন জমিদার বংশীয়দের কেউ জমিদারি হারিয়ে চাষীর পর্যায়ে নেমেছেন—দ্বারিক চৌধুরী সেই শ্রেণীর মানুষ। আবার একজন চাষী ছলে বলে কৌশলে গ্রামের জমিদারি করায়ত্ত করেছে। যেমন হরিপাল। তবে দ্বারিক চৌধুরীরা অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন চেহারায় আচার ব্যবহারে এবং চরিত্রগৌরবে তাঁর পুরোনো আভিজাত্য হারিয়ে ফেলেন নি। তারাশঙ্করের বেদনা-বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের প্রতিরূপে এই একদা জমিদার দ্বারিক চৌধুরীদের জন্য। জমিদারি প্রথার অবক্ষয়ের এক বিষাদ চিত্র তিনি এঁকেছেন দ্বারিক চৌধুরীর জীবনে। এ সম্পর্কে প্রথমেই তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। চৌধুরী বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি এ অঞ্চলে বিশেষ মাননীয় জন। আচার ব্যবহার বিচারবুদ্ধির জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। লোকে এখনও বলে কেমন বংশ দেখতে হবে। এই চৌধুরীর পূর্বপুরুষেরাই এককালে এই দুইখানি গ্রামের জমিদার ছিলেন—এখন ইনি অবশ্য সম্পন্ন চাষীরূপেই গণ্য কারণ জমিদারি অন্য লোকের হাতে গিয়েছে।

এই দুইখানি গ্রাম বলতে শিবপুর আর কালীপুর। এক চৌধুরীবংশই এই দুই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা—কিন্তু পরে কালীপুর শিবপুরে জমিদারি বিবাদের সূত্রপাত হয়।

কালীপুর একদিন শিবপুরের জমিদারের অধীন ছিল তাই কালীপুরের চৌধুরীরা যখন শিবপুরের জমিদারি স্বত্ব কিনে শিবপুরে বাস করতে লাগল তখন স্বভাবতঃই তাঁদের অহঙ্কার ঔদ্ধত্যরূপে প্রকাশ পেতে লাগল।

কিন্তু বর্তমানে সে গৌরব ও অহঙ্কার অপসৃত। সেই বংশোদ্ভূত দ্বারিক

চৌধুরীর পরিচয় দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন, "চৌধুরীদের সমৃদ্ধি অনেক দিনের কথা। দ্বারিকা চৌধুরীর একপুরুষ পূর্বে তাহাদের বংশের সম্মান সমৃদ্ধির ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়াছে। চৌধুরীরও আভিজাত্যের কোন ভান নাই মোট কথা চৌধুরী শান্তভাবেই অবস্থান্তরকে মানিয়া লইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে।

এই প্রাচীন আভিজাত্য সংস্কারকে আঁকড়ে থাকার যে কি মর্মযন্ত্রণা তারাশঙ্কর অন্যত্র জলসাঘর গল্পে সে ভাবটি প্রকাশ করেছেন। সে বিষয়ের আলোচনা পরে করা হবে। তবে গণদেবতারই শেষ পর্ব পঞ্চগ্রামে ঠাকুরের সেবা চালাতে না পেরে চৌধুরী যখন গৃহদেবতা লক্ষ্মী জনার্দনকে বিক্রয় করার কথা ভাবে এবং হরিপাল সেই গৃহদেবতা নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠা করার আশ্বাস দেয় সে সংবাদ শুনে নায়ক দেবুর মনে অদ্ভুত বিষাদ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পুরানো দিনের বহু কীর্তি, বহু ইতিহাস, বহু দাক্ষিণ্য বিজড়িত চৌধুরী বাড়ীর শোচনীয় ধ্বংসোন্মুখরূপে যেন এক অতিকায় জানোয়ারের কঙ্কালের মত কিংবা জরাজীর্ণ শোথ্‌রোগগ্রস্ত বৃদ্ধের মত মনে হয়। দেবু তাই চৌধুরীদের মজা দীঘির পারে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে। এই বেদনা কেবল নায়ক দেবুর নয়। লেখকেরই অন্তরের ঘনীভূত বেদনা। অথচ অন্যদিকে উদীয়মান জমিদারের অত্যাচার গণশক্তিকে জাগ্রত ও সংঘবদ্ধ করেছে। তাদেরই নায়ক দেবু আর তার ইষ্ট গণদেবতা। এদেরই নিয়ে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেবু অভিযান চালিয়েছে। গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম মিলে সে অভিযান পূর্ণরূপে পেয়েছে। এই দেবু সম্পর্কে লেখক লিখছেন—জমিদারকে, ধনী মহাজনকে সে ঘৃণা করে। তাহাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে অন্যায়ের সন্ধান করা যেন তাহার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এর কারণ একবার বাল্যকালে জমিদারবাবুরা বাকী খাজনার দায়ে তার বাবাকে সমস্ত দিন কাছারিতে আটক রেখেছিল। সেই থেকে 'জমিদার অত্যাচারী'—এ ধারণা এক বিন্দু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই সামন্ত-তান্ত্রিক অত্যাচারের রূপ বর্ণনা তারাশঙ্কর যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব ভিত্তিক করে তুলতে পেরেছেন। কারণ সর্বত্রই যেখানে প্রজার অধিকারের প্রশ্ন আলোচিত সেগুলো বিভিন্ন জমিদারি আইনের কথা। একদিকে যেমন রাঢ়ভূমের দৈনন্দিন জীবনধারা, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রাত্যহিক সমস্যা, অভাব অভিযোগ, কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির লীলা উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছে অন্যদিকে গ্রামীণ জমিদারীব্যবস্থা সাধারণ মানুষের উপর কিরূপ নির্যাতন চালায় সেই চিত্রও ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে সামন্ততান্ত্রিকতার আভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং জমিদারি চরিত্রের ভালমন্দ, অভিজাত, অনভিজাত দুই দিক।

তারাশঙ্করের এইজাতীয় উপন্যাস অর্থাৎ যেখানে সামন্তপ্রথার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে—তাতে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত জমির মালিকানা ও প্রজার অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের সংঘাত ও জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। জমির ভুমিসংক্রান্ত মালিকানা সম্পর্কিত বিভিন্ন সময়ে যেসকল বিভিন্ন আইন প্রবর্তিত বা পরিশোধিত হয়েছিল—তা থেকে বোঝা যায় সব আইনেরই লক্ষ্য যদিও প্রজা বা চাষীর মঙ্গল কিংবা জমির উন্নতি বিধান—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেসকল আইন জমিদারের প্রতাপ ও মুনাফাই বৃদ্ধি করেছে—প্রজাদের অধিকার বা দাবী স্বীকৃত হয় নি। গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামে জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমে সেই সকল ভূমিসংস্কারের প্রহসনের নানান দিক দিয়ে সমালোচনা হয়েছে।

আমরা জানি ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নূতন জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল—এবং সেই জমিদারশ্রেণী তৈরী করলেন জোতদার, তালুকদার, পত্তনিদার[১] ও মহাজনগোষ্ঠীকে। এঁরাই হলেন জমিদার ও প্রজার মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী। এই মধ্যসম্প্রদায়রা প্রায়ই জমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করতেন না—চাষীদের মধ্যে জমি ভাগ করে তাদের দিয়ে চাষ করাতেন। এরাই ভাগচাষী বা বর্গাদার নামে পরিচিত। এবং উৎপন্ন ফসলের একটা মোটা অংশ এরা পত্তনিদারদের দিতে বাধ্য ছিলেন—সে ফসল উৎপন্ন হোক বা না হোক। এবং সে দাবী মেটাতে না পারলে তালুকদার মহাজন পত্তনিদার গোষ্ঠীর অত্যাচারে ভাগচাষীরা হত অত্যাচারিত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ভারতের নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ আকারে দেখা দেয়। বাংলাদেশের ভাগচাষীদের এই বিদ্রোহ ১৯০৭ সালের বাগের-হাটের কৃষক সংগ্রাম নামে পরিচিত। মধ্যস্বত্বাধিকারীদের দাবী মেনে চাষ করার বিরুদ্ধে তারা ধর্মঘট করে।

ভারতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৫৩-এর ভূসম্পত্তি অধিকার আইন ও ১৯৫৫-এর ভুমিসংস্কার আইনের দ্বারা জমিদারি প্রথা রহিত ও ভাগচাষীদের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ চাষী বা রায়তেরা সোজাসুজি সরকারের তহবিলেই খাজনা দেবে। জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের নয় এবং জমিদার, তালুকদার, মহাজন প্রভৃতি সকলের সম্পত্তি সরকারের খাসদখলে

১। অনেকে নিজ হস্তে চাষ না করে প্রজা পত্তন করে খাজনা আদায় করার জন্য অথবা প্রজাপত্তন করে জমি হাসিল করাবার জন্যেও মধ্যস্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে জমি নিতে পারেন। জমি নেবার উদ্দেশ্য থাকে প্রজা পত্তন করা নিজে চাষ করা নয়। এদেরই নাম পত্তনিদার। পত্তনি দেওয়া- ইজারা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আসে। এই ভূমিসংস্কার আইন ও ভূসম্পত্তির অধিকার আইনের দ্বারাই বাংলা-দেশে জমিদারি প্রথার প্রকৃত বিলোপ হয়—যদিও ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশান থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এনকোয়ারী কমিটি পর্যন্ত সকলেই জমিদারি প্রথা বিলোপের জন্য সমমত প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৫০ সালে বর্গাদার বা ভাগচাষীদের অধিকার সম্পর্কে প্রথমে একটি অস্থায়ী বর্গাদার আইন রচিত হয় পরে ১৯৫৫ সালে সেই আইন পুনঃ কিছু-কিছু পারিবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে প্রস্তাবিত হয়। এক আইনে বর্গা বা ভাগ চাষ প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে। এবং ঐ প্রথা অনুসারে ভাগে বিলি জমির উৎপন্ন ফসলের ভাগ সম্বন্ধে এবং বর্গাদারের উচ্ছেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে এই আইনে উপযুক্ত রূপ বিধান করা হয়েছে।

ভূসম্পত্তির অধিকার (জমিদারি দখল) আইনের উদ্দেশ্য জমির মালিকরা কেবলমাত্র খাজনার অধিকারী হবেন না। তাঁদের স্বয়ং চাষআবাদ করতে হবে। এবং তা না করলে বর্গা বা প্রজা দ্বারা করানোকেও স্বহস্তে চাষের সামিল ধরা হবে। এবং যাঁরা কৃষিকার্য করবেন তাদেরই আবাদি জমির মালিকানা থাকবে তবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিকানা। ভূমিহীন কৃষক ও কৃষিকার্য উদ্দেশ্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে জমি বণ্টন করাই এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল যাতে অনাবাদী জমি পতিত অবস্থায় না থাকে। এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। দেশে বর্গাদারদের অধিকার নিয়ে তেভাগা আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় সরকার প্রথমে সাময়িকভাবে বর্গাদারী আইন পাস করেন তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য। পরে সেটি ভূমিসংস্কার আইনে পরিচিত হয়।

তারাশঙ্করের গণদেবতায় যে সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় সে ভূমিসংস্কার আইন তৈরী হবার পূর্বাবস্থা। জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্কহেতু তখন গোমস্তা। জমিদারের প্রয়োজনের দাবী মেটানোর দায়িত্ব তার উপর অর্পিত। বর্গাদারী আইন প্রণয়নের পূর্বে জমিদার নিজের ইচ্ছামত বর্গাদার বা ভাগ-চাষীদের উচ্ছেদ করতে পারতেন। ঐ আইনের ফলে উচ্ছেদ করতে হলে যুক্তিসঙ্গত কারণের উপর নির্ভর করতে হবে।

গণদেবতার জমিদার-প্রজা বিরোধের একটি চিত্র তারাশঙ্কর এঁকেছেন। গ্রামে প্রজাসমিতি রয়েছে। জগন তার প্রেসিডেণ্ট। হরেন সেক্রেটারী। নায়ক দেবুকে প্রজাসমিতির প্রসিডেণ্ট করার ইচ্ছা সকলের। অন্যদিকে শ্রীহরি ওরফে ছিরে পাল, একে মহাজন, তারপর হল গোমস্তা। অতএব গ্রামের

সর্বনাশের আর বাকী নেই। জমিদার টাকা আদায়ের সর্তে তাকে গোমস্তাগিরি দিয়েছে। অতএব যেন তেন প্রকারেণ টাকা আদায় করাই ছিরে পালের লক্ষ্য। সে এখন বাকী খাজনার দায়ে নালিশের সুযোগ নিয়ে লোকের জমি নিলামে তুলে আপন প্রাপ্য সুদে আসলে আদায় করছে। এইভাবেই প্রজা গণেশ পালের জোত নিলাম হয়েছে। তারিণীর বাস্তুভিটাটুকু গিয়েছে। পাতু মুচির দেবোত্তর চাকরান জমি[১] উচ্ছেদ হয়েছে—অনিরুদ্ধের জমিও নিলামে চড়েছে। এর সবই গিয়েছে শ্রীহরির কবলে—কারণ তার টাকা আছে।

তারাশঙ্কর যে সময়কার কথা লিখছেন তখন সরকারী জরিপ আইন অনুসারে সেটেলমেন্টের[২] কাজ শুরু হয়েছে। সেইভাবে বহু দেবত্র সম্পত্তিঘটিত প্রজা-জমিদার সমস্যার চিত্র আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গণদেবতার দ্বিতীয়ার্ধ পঞ্চগ্রামে।

কিন্তু জমিদারের এই শোষণ স্পৃহাকে বৃদ্ধি করার জন্য সরকারী আইনই কি মুখ্যতঃ দায়ী নয়? দেবুর চিন্তাসূত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সে দিকটির প্রতিও আলোকপাত করেছেন।

টাকা থাকা পাপ নয় বে-আইনী নয়। কারণ বিপদের সময় মহাজনের কাছ থেকে টাকা পেয়ে খাতক উপকৃত হয়। পরে পরিশোধের সময় সে সুদে-আসলে তার পরিমাণ দেখে ভীত হয়, কিন্তু তার জন্য কোর্ট-ফি দিতে হয়। ইউনিয়নকে দিতে হয় চৌকিদারী ট্যাক্স। অতএব "সুদ শ্রীহরি ছাড়ে কি করিয়া?" (এই প্রসঙ্গে জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারেরও সমতুল্য মত প্রকাশিত। এ বিষয়টি পরে আলোচ্য।)

এই প্রসঙ্গে দেবুর মনে পড়ে বাল্যকালের স্মৃতি—কঙ্কনাবাবুদের দ্বারা কিভাবে তার পিতৃপুরুষের জমিজমা স্থাবর অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি এমন কি বাস্তু-ভিটা পর্যন্ত ক্রোক হয়ে গেছে। অতএব খাতকের পক্ষই দেবুকে মেনে নিতে হয়। যদিও শ্রীহরি প্রজাদের দাবীকে স্বীকার করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে প্রজাদের যে-কোনও জমি মোকররী জমা[৩]। আসলে এ জমির দলিল ১২৭০

১। চাকরান জমি - বেতনের পরিবর্তে প্রদত্ত জমি।

২। সেটলমেন্ট—বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী এই শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৩। জমা মোকররী—যে খাজনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ খাজনার চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট।

যথা :— (ক) প্রজাপত্তন করে গভর্নমেন্টের রাজস্ব নির্ধারণ।

(খ) জমিদার এবং প্রজার মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করতঃ খাজনা ধার্য করান।

(গ) নিষ্পত্তিতে জঙ্গলা বা নূতন চড়া ভূমিতে প্রজা বন্দোবস্ত।

সালে তাতে তামাম জমায় বৃদ্ধি করা আছে। একটি জমাও মোকররী দাঁড়াবে না। জমিদার বৃদ্ধির দাবী করবে, হয়তো হাঙ্গামা বাধাবে ওরা। মামলা হবে, কিন্তু আইনে জমিদারের প্রাপ্য সে পাবেই। আর যখন আইনসম্মত তখন আর তার অপরাধ কোথায়। পঞ্চাশ বছরে ফসলের দাম অন্ততঃ তিনগুণ বেড়েছে। অতএব সেই লভ্যাংশ জমিদার পাবে না? অকাট্য যুক্তি। অতএব যখন আইনসম্মত তখন ইহাই ন্যায়। ইহাই যদি ন্যায় তবে সংসারে অন্যায়টা কি।

শ্রীহরির হিসাব অনুসারে কালটা ১৯১৩ বা তার কমবেশি হতে পারে। চাষের জমি ও চাষীদের নিয়ে বাংলাদেশে বর্তমান আন্দোলনের সূত্রপাত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে। এতে ভারতবাসীর আইন সভায় প্রবেশাধিকার ও কর্মক্ষমতার বৃদ্ধি পাবে স্থির ছিল এবং আশা ছিল চাষীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় অবশ্য যদি তারা একজোট হতে পারে তবে তাদের ভোট উপেক্ষা করা বেশীর ভাগ সভ্যপদপ্রার্থীর পক্ষে সম্ভব হবে না। ফলে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। কিন্তু তখন জমিদাররাও সভাসমিতি করে প্রমাণ করতে লাগলেন যে জমিদাররাই চাষীদের প্রকৃত নেতা—অতএব তাদের স্বার্থ ও প্রজাস্বার্থ একই এবং চাষীরা যেন দুষ্ট লোকের কথায় কান না দেয়। কিন্তু বহু জনদরদী ও রায়ত-হিতৈষী ব্যক্তি প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে চাষীর দুঃখের মূল হল জমিদার। জমির সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই—অথচ তারাই জমির প্রকৃত মালিক এবং জমির খাজনা ও মুনাফাভোগী—অর্থাৎ জমিতে যাহার পড়ে না চরণ তারে মহাজন কয়।

তারা সেই মালিকানার জোরে রায়তের খাজনা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। রায়ত ইচ্ছামত তার জমি বিক্রি করতে পারে না জমিদারকে না দিয়ে। নইলে জমি থেকে উচ্ছেদ। নিজের জমির গাছ রায়ত নিজে কেটে নিতে পারবে না। ভেঙ্গে পড়া গাছের উপরও তাদের অধিকার নেই (তুলনীয় অভাগীর স্বর্গ গল্প) তারও মালিক জমিদার। নিজের জমিতে রায়ত পাকা বাড়ী করতে পারবে না, পুকুর কাটতে পারবে না। এসব আইনী অত্যাচার ছাড়াও বে আইনী অত্যাচারও বহু চলত। সেই কারণে রায়ত-হিতৈষীরা সভা করে আইনসভায় রায়তের হিতাকাঙ্ক্ষীদের প্রতিনিধি করে পাঠানোর জন্য আন্দোলন করতে শুরু করলেন। প্রমথ চৌধুরী যে বলেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের সঙ্গে নয়—হওয়া উচিত ছিল প্রজাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এইরকমভাবে বক্তৃতা সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সুধী ব্যক্তিরা প্রজাস্বার্থে

বাণী প্রচার করতে থাকেন। ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আইনসভার সঙ্গে অসহযোগ করে ফলে চাষী ও চাষের জমি নিয়ে কোনও কথা ওঠে নি।

এই অসহযোগের ব্যর্থতার পর পরবর্তী নির্বাচনে স্বরাজ্য দল আইনসভায় প্রবেশাধিকার লাভ করল। ১৯২৮ সালে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বাংলা পরিষদে বাংলার প্রজা ও জমিদার সম্পর্কিত ১৮০৫ সালের আইনকে পরিবর্তিত করে এক নূতন আইন পাশ হল। এতে প্রজারা জমিতে পাকা বাড়ী করা, পুকুর খোঁড়া এবং গাছ কাটা এবং গাছ নেবার অধিকার লাভ করল। চাষীর অধিকার বৃদ্ধি করাই এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল যদিও জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতা এতে হ্রাস পেল না। এবং চাষীর জমির দান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নজরের ব্যাপারটা বহাল রইল। তবে ও বিষয়ে সরকার হলেন জমিদারের তহশীলদার। অর্থাৎ নজরের টাকা রেজিস্ট্রী আফিসে জমা না দিলে বিক্রির দলিল রেজিস্টী হবে না। তবে এই আইনে জমিদার প্রজাদের খেয়ালখুশিমত উচ্ছেদ করার অধিকার থেকে কিছুটা বঞ্চিত হল। তবে কংগ্রেস বাংলার চাষীদের কাজে শ্রদ্ধার আসন পায় নি, কারণ তাদের ধারণা হয়েছিল কংগ্রেস প্রকারান্তরে জমিদারকেই সমর্থন করেছে এবং এখনও সে ধারণা বজায় আছে। ১৮৮৫ সালের টেনেন্সি আইনের দফাগুলি, ১৯২৮ ও ১৯৩৮-এ প্রায় সবগুলিই সংশোধিত ও পূরণ হয়েছে। চায়ের মজলিশে সেকথা আলোচনা করে জগন বলেছে—প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনে সে স্বত্ব হবে প্রজার। জমিদারের বিষদাঁত এইবার ভাঙ্গিল। প্রজাদের চোখে কত স্বপ্ন!

কিন্তু ১৯১৯-এর আগেই বাংলাদেশের নানাস্থানে জমিদার বিরোধী কৃষক আন্দোলন প্রকাশ্যে রূপ নিতে আরম্ভ করেছে দেখে ব্রিটিশ সরকার আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বা টেনেন্সি এ্যাকট এর সংশোধন করে জমিদারদের কৃষকগণের কাছ থেকে ইচ্ছামত খাজনা আদায়—বিভিন্ন কর সংগ্রহের অধিকার দান করল যাতে করে জমিদাররা ব্রিটিশ সরকারের হাতে থাকে এবং প্রয়োজনে তাদের অর্থ সাহায্য করে। (পরে অবশ্য বাংলাদেশের জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন ঘনিয়ে ওঠায় তারা স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে সরে আসে।) এই অধিকার লাভ করে বাংলাদেশের দুই-শত জন জমিদার (বর্ধমান, কাশিমবাজার, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি সহ) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের যুক্ত কৃতজ্ঞতাপত্র প্রেরণ করেন। সেযুগের বা

বাংলাদেশের আইনসভার জনৈক ব্রিটিশ সদস্য এই নূতন সংশোধনী আইনটিকে সরকার পক্ষ থেকে জমিদারদের উৎকোচ দান বলে উল্লেখ করেন।

নিজ স্বার্থরক্ষায় বাংলাদেশের জমিদাররা বিভিন্ন সময়ে দরিদ্র প্রজার বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ সরকারকে মদদ দিয়ে দেশদ্রোহিতা করে নানাভাবে তাঁদের নেকনজরে পড়েছেন এবং 'বাবু' 'রাজা' ইত্যাদি খেতাব লাভ করেছেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসে আছে। নীলদর্পণে দীনবন্ধু মিত্র চাষীদের উপর ইংরেজদের পীড়নের যে মর্মান্তিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা আংশিকভাবে সফলতা লাভ করেছে—বলা যায় কারণ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহু স্বার্থান্বেষী জমিদার—যাদের চরিত্র ঐ বিশ্বাসঘাতিনী—পদীময়গনীর মতই ছিল।

দীনবন্ধু প্রজাহিতৈষী এক ধনী পরিবার গোলোক বসু ও তাঁর পুত্র নবীন-মাধবের চরিত্র এঁকে আদর্শবাদকেই বড় করেছেন। ঐ সকল বিভীষণ স্বরূপ জমিদারদের চিত্র তুলে ধরে তাঁর বাস্তবজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশ ঘটান নি।

গণদেবতায় তারাশঙ্করের লেখার মধ্যে তৎকালীন অর্থাৎ কংগ্রেস কমিটি ও প্রজাসমিতি প্রতিষ্ঠা, প্রজাবিদ্রোহ ও তার নায়ক হিসাবে দেবু সেযুগের একটা রাজনৈতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছে।

প্রজাদের জমির গাছ কাটার অধিকার ছিল না এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। জমির গাছ জমিদারের সম্পত্তি। এই ব্যাপারটি নিয়ে রাজা-প্রজার বিরোধ লেগেই থাকত। তারই একটা রসগ্রাহী চিত্র এঁকেছেন গণদেবতায় শ্রীহরির গাছ কাটার ঘটনা নিয়ে।

ছিরু পাল লেঠেল নিয়ে এসে গাছ কাটছে—গ্রামের মধ্যে তাই নিয়ে দাঙ্গার সূত্রপাত। ছিরু পাল জমিদারের গোমস্তা। সেই অধিকারে সে লাঠিয়াল মারফৎ দেবু, জগন, হরেন ও অনিরুদ্ধের গাছ কাটবার ব্যবস্থা করেছে। গাছগুলি জমি-দারের পতিত ভূমির উপর আছে। এই সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন—"পূর্বকালে চাষী প্রজারা এমনই ভাবে গাছ লাগাইত, ভোগদখল করিত জমিদার আপত্তি করিত না। প্রয়োজন হইলে প্রজাকে দুইটা মিষ্টিকথা বলিয়া জমিদার ফলও পাড়িত, ডালও কাটিত। কিন্তু এমনভাবে সমূলে উচ্ছেদ কখনও করিত না। করিলে বহু পূর্বকালে একশো বছর পূর্বে জমিদার প্রজায় দাঙ্গা বাধিত। পঞ্চাশ বৎসর পরে সে যুগ পালটাইয়া ছিল। তখন প্রজা জমিদারের হাতে-পায়ে ধরিত। ঘরে বসিয়া গাছের মমতায় কাঁদিত।"

গণদেবতায় এই গাছ কাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেবু আহত হল ঠিকই কিন্তু জিত হল তারই, সকলের গাছ কাটা গেলেও দেবুর গাছ রক্ষা পেল তারপর

পুলিসী তদন্তের শুরু। দাশজী জমিদারের সদর কর্মচারী, ভূতপূর্ব গোমস্তা প্রজাস্বত্ব আইনে, ফৌজদারী আইনে সে সাধারণ উকীল মোক্তার অপেক্ষাও বিজ্ঞ। মামলা হলেও যাদের টাকা আছে তাদেরই জিত হয়। অতএব প্রজাপক্ষ চিরকালই হারে আর জমিদারের জয় হয়।

গণদেবতায় বর্তমান জমিদার প্রসঙ্গে বলেছেন জমিদার বয়সে নবীন। একালের বাংলাদেশের জমিদারদের ছেলে। ইংরাজী লেখাপড়া জমিদারি খুব পছন্দ করে না। বার কয়েক ব্যবসা করিবার চেষ্টা করিয়া লোকসান দিয়া অগত্যা জমিদারিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। জমিদারির মধ্যে আইন অনুযায়ী চলিবার প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা তাহার আছে। সেকালের জমিদারের মত জোর জবরদস্তির ধারা সে মোটেই পছন্দ করেনা। সেকালের জমিদারের মত ব্যক্তিত্বও তাহার নাই।

এই বিবরণ থেকে পূর্বতন জমিদারশ্রেণীর থেকে আধুনিককালের ক্রমক্ষীয়-মাণ সামন্ততন্ত্রের পার্থক্যের একটা ইঙ্গিত ফুটে ওঠে, তা হল কেবল সম্পত্তি অর্থ-প্রতিপত্তিই নয় কালবৈগুণ্যে একালের জমিদার ব্যক্তিত্বহীন ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন এবং দুর্বল চরিত্র। তবে শিক্ষিত অতএব কিছুটা উদারহৃদয় অন্ততঃ আইনভীরু। এতকাল ইতিহাসে জমিদারের যে প্রজাপীড়নের নজির পাওয়া যায় তা এক হিসাবে সবল বা শক্তিমানেরই পরিচয়। তাই একালের জমিদার অত্যাচারী নন কারণ তারাও দুর্বল।

১৭৯৩ সালের পর বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থার যে বিভিন্ন আইন রচিত হয়েছিল তার মধ্যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জরিপ আইনের উল্লেখ আছে গণদেবতায়। এই আইন প্রবর্তনের মূলে প্রধান কারণ ছিল জমির সীমানা সহবন্দ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মামলা-মোকদ্দমা। প্রতিটি টুকরো জমি, তার বিবরণ ও তার অধিকারিত্ব নির্ধারণের জন্যই এই আইন। জমির দুর্ভোগ কেবল একালে নয় মধ্যযুগেও ছিল। মুকুন্দরামের রচনা থেকে জানা যায় (রাধা-কমল মুখোপাধ্যায়ের বিশাল বাংলা দ্রষ্টব্য) যে তদানীন্তন পাঠান ডিহিদারের ভূমির খাজনা আদায় করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রজার খাজনার নিরিখ ঠিক করে দিত তাতে পল্লীসমাজের পুরাতন সমূহ দায়িত্ব লোপ পেল ও পঞ্চায়েত শাসন বিনষ্ট হল। পতিত জমিকে কর্ষিত ভূমির অন্তর্ভুক্ত করে, খাজনার হার অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে এবং মাপজোক সংক্রান্ত অনেক প্রকার প্রতারণা করে তারা মহাজনের কবলে পড়তে বাধ্য হল, (খিলভূমি লেখে লাল ইত্যাদি)।

এই মহাজনেরা ছিল সাধারণতঃ বণিক সম্প্রদায়। এরা কৃষক জাতির যম-

স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। কৃষকগণ যাতে পালিয়েও না বাঁচে তার জন্য গ্রামের চারধারে চৌকিদার নিযুক্ত হল। এইভাবে বাংলার কৃষকসমাজ ঘোর দারিদ্র্য ও নির্যাতনের ভারে পুরাতন সমূহতন্ত্র হারিয়ে ফেলল।

ভূমিব্যবস্থায় খাজনা আদায়ের এই অসঙ্গতি বোধ হয় জরিপ আইনের আগে পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে, চলে আসছিল।

কিন্তু গণদেবতায় সমস্যাটা সীমানা সমস্যা নয়, জরিপ আইন প্রবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা, অর্থাৎ ১৮৭৫ এর জরিপ আইনের জের যখন গ্রামাঞ্চলে এসে পড়ল তখন প্রজাদের জীবনে নূতন সমস্যা দেখা দিল। জরিপের পর হাকিমের ব্যবস্থামত প্রজাদের খরচের অংশ দিতে হবে, না দিলে অস্থাবর ক্রোক হবে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে। তারপরও আছে জমিদারের বিভিন্ন হারে খাজনা বৃদ্ধির দাবী। লাখেরাজ[১] বা দেবত্র সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হবে নতুবা তার বিনিময়ে যে পরিমাণ সেস লাগবে তা অনেকেরই আয়ত্তের বাইরে।

গণদেবতায় গাছকাটার পর জমিদারি অত্যাচারের আর এক দৃষ্টান্ত পুকুরের মাছ নিয়ে বিবাদ। এই সব বিভিন্ন অধিকারের দাবী নিয়েই দেবু জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের নেতৃত্ব দিয়েছে।

জমিদারের খাসপুকুরের মাছ তিনি নিজেই ইচ্ছামত জল বার করে দিয়ে ধরাবেন। প্রজাদের পানীয় জলের প্রয়োজনের তিনি ধার ধারেন না।

১৯২৮-এর আগে জমিতে পুকুর কাটার অধিকার প্রজার হয় নি। তবে ১৯২৮-এর আইনেও জমিদারের জমির খাজনা বৃদ্ধির অধিকার বলবৎ রইল। এই সকল আইনগত সত্যের ভিত্তিতেই গণদেবতার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ছবি তারাশঙ্কর এঁকেছেন।

এ বিষয়ে তারাশঙ্কর লিখছেন গভর্নমেণ্ট সার্ভে হওয়ার ফলে এ দেশে জমিদারদের সার্বজনীন পর্বের মত খাজনা বৃদ্ধির একটা সাধারণ উপলক্ষ্য উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামের উদীয়মান জমিদার শ্রীহরিও শস্যের মূলবৃদ্ধির দাবিতে খাজনা-বৃদ্ধির দাবী করতে চায়। শ্রীহরি চাষীর ছেলে। জমিদার হয়ে আজ সে চাষীর দুঃখ ভুলতে বসেছে। প্রাজারা কিন্তু সহজে জমিদারের খাজনাবৃদ্ধি— মেনে নিতে পারেন নি—মানা সম্ভবও ছিল না। কারণ তারা মনে করে পুরুষানুক্রমে যে জমিকে তারা উর্বরা ও শস্যশ্যামলা করে চলেছে সে জমিতে তাদেরই অধিকার। সে জমির শস্য তাদের। এই নিয়ে প্রজাদের জল্পনা-কল্পনা চলে। যুগে যুগে প্রজা ধর্মঘট হয়। কতলোক বিক্ষোভ জানাতে

১। লাখেরাজ সম্পত্তি—নিষ্কর সম্পত্তি

গিয়ে ভিটামাটি হারায়, সর্বস্বান্ত হয়। তবু তাদের অবুঝ মন বোঝে না এবং জমির উপর প্রজার অধিকারও স্বীকৃতি পায় না। কোনও সরকারী আইনই এযাবৎ জমির অধিকারের সীমানা নির্দিষ্ট করতে পারে নি।

গণদেবতার শেষ অংশে সেই বহুকালের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ পুনরায় ঘনিয়ে ওঠে—তার নায়ক দেবু স্বয়ং। আর তার কল্পনালোকে, তারই বুকের স্পন্দনের মধ্যে এক বিপ্লবী যতীন অনুভব করেছে নূতন কালের নূতন মহাগ্রাম রচনার ইঙ্গিত। এই শৃঙ্খলাহীন যুগে, ভাঙ্গাগড়ার আসরের মধ্যে শ্রীহরিপাল, কঙ্কণাবাবু, থানার জমাদার সকলেয় রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করে নূতনকাল সার্থক হয়ে উঠবে, এই আশা ও বিশ্বাস নিয়েই গণদেবতার কাহিনীর ইতি।

পঞ্চগ্রামে প্রথম দিকে গণদেবতার বিষয়গত ধারাবাহিকতা রক্ষিত, তাই সেখানেও সরকারের বিভিন্ন ভূমিসংস্কার আইন, জমিদারি প্রথা ও অধিকারের প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। গল্পের জটিলতা সৃষ্টি এই পঞ্চগ্রামের জমিদার-প্রজা সম্পর্ক নিয়েই হয়েছে।

মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, বালিয়াড়া, দেখুরিয়া কুসুমপুর ও কঙ্কণা এই নিয়ে পঞ্চগ্রাম। এর প্রতিটি গ্রামের উৎপত্তি ও জমিদারির পৃথক পৃথক ইতিহাস আছে। তার মধ্যে কুসুমপুরের জমিদার এখনও মিঞাসাহেবরা যদিও তাদের আগের অবস্থা আর নেই। তবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সে গ্রামে ছিল না। কুসুমপুরের জমিদারদের প্রদত্ত লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তর জমি ব্রাহ্মণরা একই সঙ্গে ভোগ করত। দোল দুর্গোৎসব বা অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সকল প্রজাই সমবেত হত জমিদারের সেরেস্তায় হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজাই একসঙ্গে খাজনা দিত—আবার অজন্মার বছরে খাজনা ও সুদের অভিযোগ নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াত।

কিন্তু সেই গ্রামেও খাজনা বৃদ্ধির ধুঁয়া উঠেছে সেই গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী দৌলত সেখ দেবুকে যুক্তি দেখায় মিনিস্টার আমাকে বললেন সরকারী আইনে যখন জমিদার বৃদ্ধি পাবার হকদার হইছে তখন ঠেকাবে কে?

অতএব উভয়পক্ষের হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেলাই ভাল কারণ প্রজা বিক্ষোভের কোনও ফল নাই।

সেই প্রবীণ দৌলত সেখের মুখেই শোনা যায় কঙ্কণার মুখুর্জা বাবুদের পুরানো ইতিহাস, ব্যবসায়ী মুখুর্জারা রায়বাবুদের বাড়ুজ্জা বাবুদের কেমন সালাম ঠুকত। অথচ লাখ টাকা রোজগার করে তারাই শেষে মুলুকের সেরা আদমি হল। তখন নিজেরা তক্তপোশে বসত। চেয়ারে রায়বাবুদের বসতে দিত।—

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গ্রামের কেবল নয় সমগ্র জমিদার সম্প্রদায়েরই উত্থানপতনের একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যেমন শিবকালীপুরের বেলাতেও দেখা যায়—চৌধুরীরা একপুরুষ আগেও জমিদার ছিল কিন্তু এখন চাষীতে পরিণত। অন্যদিকে হরি পাল মহাজন থেকে গোমস্তা, গোমস্তা থেকে পত্তনীদার চাষী, পত্তনীদের চাষী থেকে পরে জমিদার হল। দেবুর ভাষায় "সে এখন সমস্ত গ্রামেরই শাসনকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির স্বপক্ষে দৌলত সেখের অভিমতের সঙ্গে চৌধুরী-মশায়ের মতৈক্য দেখা যায়। তাঁর মনে হয়েছে সেকালের ধর্মঘটের সংগে এখনকার প্রজা ধর্মঘটের কত না তফাৎ। সেকালে প্রজারা জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বা অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে ধর্মঘট করত। কিন্তু ফসলের দাম বৃদ্ধির দাবী তাঁর মতে অন্যায্য নয়। তাঁর বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী একটা বৃদ্ধি জমিদারের প্রাপ্য হয়েছে। "আইনে বিশ বছর অন্তর জমিদারের শস্য মূল্যের বৃদ্ধির অনুপাতে একটা বৃদ্ধি পাইবার অধিকার আছে। অবশ্য পরিমাণ মত দাবী হওয়া দরকার।" তবে প্রজারা একেবারেই দেবে না—এ কথা বলাও সঙ্গত নয়। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বারিক চৌধুরীর মনে হয়েছে দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে ঔচিত্যবোধের কোনও প্রশ্ন নেই। কারণ একালে প্রজাদের যে অবস্থা তাদের ক্ষুধার অন্ন পর্যন্ত যেখানে জোটে না সেখানে সামান্য দাবীও তারা পূরণ করতে অক্ষম। এবং এই সমস্ত ঘটেছে মহাজনদের—শোষণের ফলে—জমিদার ও প্রজার মধ্যবর্তী স্বত্বভোগী এই মহাজনশ্রেণী যারা মহাজন থেকে ক্রমশঃ জমিদার হয়ে ওঠে। হরি ঘোষের খাজনা বৃদ্ধির মূলে কি জমিদারি অত্যাচার না মহাজনী শোষণ? দ্বারিকা চৌধুরীর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়তো তারাশঙ্করেরই মনে মনে ছিল। আসল জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্কে অনেকটা দূরত্ব থাকত।

কিন্তু ঐ মহাজনও গোমস্তা পত্তনিদার এবং গ্রামের মধ্যে প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। জমিদারের ইচ্ছাকেই শুধু তারা কার্যকরী করে না অনেক সময়েই ব্যক্তিগত স্বার্থকেই কাজে লাগায়। এবং অত্যাচারটা আসে এদের তরফ হতেই বেশী।

অবশ্য জমিদারশ্রেণীর উদ্ভবেরও কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই যার ফলে জমিদারী আভিজাত্য বংশানুক্রমে সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে। ক্ষমতা অর্থকৌলীন্যই যেখানে জমিদারি প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি—সেখানে জমিদারের চরিত্রে কোনও মহত্ত্ব আশা করাই অন্যায়। এবং পরিপূর্ণভাবে জমিদারিপ্রথা কায়েম হবার পিছনের ইতিহাস অর্থাৎ ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে এই

ভাবেই জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। সামান্য চাষী বা জোতদার থেকে মহাজন, ব্যবসায়ী যে কেউই জমিদার হয়ে বসতে পারে। যেমন হয়েছে কঙ্কণার বাবুরা, শিবকালীপুরের হরি ঘোষ।

পঞ্চগ্রামে জমিদারের প্রজাকে বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে যে সরকারী আইনের কড়াকড়ি হয়েছে—সে সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছেন যে প্রজারা বুঝতে পারে না—তাদের হাড়ির হাল দেখেও—জমিদার কোন হিসেবে তাদের ওপর খাজনা বৃদ্ধির দাবী করে। প্রজার কাছে জমিদারি অত্যাচারেরই আর এক রূপ। তাই তারা সংঘবদ্ধ হয়েছে এই দাবী পূরণের বিরুদ্ধে। অথচ জমিদারের পক্ষেও যুক্তি আছে। সে হল জমিতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ময়ুরাক্ষীর বাঁধের দ্বারা বন্যা রোধ ও জমিতে জলসেচনের সুবিধা করেই উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এই বাঁধ জমিদারদের চেষ্টাতেই গঠিত। কিন্তু প্রজারা জানে তাঁরাই বাঁধ তৈরী করেছে এমন কি বহু চাষী প্রজাকে ধরে এনে মজুরের কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। অবশ্য ইদানিং প্রজার ওপর গায়ের জোর খাটানোর আইন নেই। তাই জমিদাররা মুচী বাউরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রজাদের দিয়ে বেগার খাটানোর ব্যবস্থা বলবৎ রাখছে। তাদের মজুরিকে জমিদাররা তাদের বসতবাটির খাজনা হিসাবে দেখিয়েছে সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অব রাইটাস্। ভিটার খাজনা বৎসরে তিনটি নজর—তাঁর একটি বাঁধ অপরটি চণ্ডীমণ্ডপ এবং তৃতীয়টি জমিদারের নিজের বাড়ীর জন্য।

অতএব কেবল সোজাসুজি পীড়ন নয় আইনের ফাঁকগুলিকেও যে জমিদার-শ্রেণী স্বার্থ সাধক ও প্রজাশোষণের বিভিন্ন উপায় দিয়ে পূরণ করে নিয়েছে। যার ফলে সমস্ত আইন ব্যাপারটাই একটা প্রহসনে দাঁড়িয়ে গেছে এবং প্রজার অধিকার ও অভাব কোনভাবেই স্বীকৃত বা লাঘব হয় নি জমিদারের ক্ষমতাই শুধু নানাভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সামন্তপ্রথার এই দিকটি তারাশঙ্করের লেখনীতে চমৎকার ভাবে আলোচিত হয়েছে। এবং তারই অনিবার্য ফলরূপে জমিদার-প্রজা সংঘর্ষ যে অবশ্যম্ভাবী সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। তবে পঞ্চগ্রামে এই প্রজা বিক্ষোভের ফল অনিশ্চিত এবং পরিণামে প্রজাদের পক্ষেই অমঙ্গলকারক। উপন্যাসে এই-জাতীয় প্রশ্নে অনেকের চিত্ত দ্বিধাগ্রস্তরূপে দেখানো হলেও পঞ্চগ্রামের শেষ পর্যায়ে এই বিক্ষোভ সম্পূর্ণ নিস্ফল মনে হয় না এবং বাস্তব জীবনেও আমরা দেশের ইতিহাসে এই সামন্ত প্রজা সংঘর্ষের নজীর দেখেছি সারা ভারতবর্ষের বিক্ষিপ্ত ঘটনা-বলীতে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৬-এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় সংঘটিত যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে তারও মূলভিত্তি ছিল এই

জাতীয় সংঘর্ষ অর্থাৎ জমিদারের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের প্রথম সূচনা যার পরিণতি আজকের জমিদারি বিলোপ বা উচ্ছেদের পথকে মসৃণ করেছে। কিন্তু জমিদারি প্রথা ভেঙ্গে পড়লেও এবং আইনতঃ উচ্ছেদ হলেও কি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে? সেই রক্তধারা বণিক ও মালিক জীবনের মধ্যে দিয়ে শোষণ চালিয়ে চলেছে। কাজেই শোষণ আজও শেষ হয় নি।

কেবল বাংলাদেশ নয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত দুর্ভিক্ষ সারা ভারতের নানা প্রদেশেও সংঘটিত হয়। এই সকল দুর্ভিক্ষের কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যের অভাব ছিল না—ছিল বিভিন্ন চক্রান্ত। করবৃদ্ধি, দারিদ্র্য এবং অন্যায় শোষণ। তার দ্বারাই দেশের মধ্যে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এবং এই সকল দুর্ভিক্ষের ফলে যে কৃষক বিদ্রোহের আগুন দিকে দিকে জ্বলে উঠেছিল তার মধ্যে ছিল মাদ্রাজের রুম্পা বিদ্রোহ, উড়িষ্যার খোন্দ বিদ্রোহ (১৮৬২-৯৪), কেওঞ্জর বিদ্রোহ (১৮৯১), মোপলাচাষীর সংগ্রাম (১৮৭৩-৯৬), ছোটনাগপুরের কোল বিদ্রোহ (১৮৫৭-১৯০০), মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৫-১৯০০), সারা উত্তর ভারতব্যাপী ওয়াহাবি বিদ্রোহ। এবং তারই প্রবাহে বাংলা-আসামের নানা অঞ্চলে বিভিন্ন বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। বাংলাদেশের নীল বিদ্রোহ (১৮৬০-৬১), সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে মহাজনী শোষণ ও জমিদারী উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। এরও আগে ১৮৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল পরগনা ও বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল কৃষকদের ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা যায়। প্রথমে এই বিদ্রোহ মহাজন ও জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপে দেখা যায়, পরে অবশ্য তা সাঁওতাল জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে যে সাঁওতাল বিদ্রোহের উল্লেখ আছে তা বীরভূমে সংঘটিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ সেই ইতিহাস বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহ। এর নায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রাক্তন জমিদার সোমেশ্বর চক্রবর্তী। রামেশ্বরের পিতা যার নাম সাঁওতালরা আদর করে দিয়েছিল রাঙাঠাকুর। রায়হাটের প্রাচীন জমিদার বংশের সঙ্গে তাঁদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলেও জমিদারের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের বিদ্রোহী করে তোলার নেতৃত্ব তিনিই লিখেছিলেন। সে বহুকালের ইতিহাস। তবুও এখনও সাঁওতালরা সে কথা ভোলে নি। রাঙাঠাকুরের নাতি রাঙাবাবু তরুণ অহিনের মধ্যে তারা সেই পরমপ্রিয় মানুষটির সন্ধান পেয়েছে। অহিনও তাদের ভালবাসার মধ্যে নিজেকে ফেলেছে হারিয়ে। তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িত হয়ে জমিদার ইন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে তাদের মাতিয়ে তুলেছে।

প্রাচীন জমিদার বংশগুলি ক্রমশঃ বহুধা বিভক্ত হয়ে পূর্বগৌরব ও সম্পদ হারায় ঠিকই কিন্তু তাঁদের দম্ভ ও অহমিকা হ্রাস পায় না এবং বিভিন্ন শরিক ও প্রতিবেশী জমিদারদের মধ্যে বিরোধ ও দলাদলি লেগেই থাকে। কোনও কিছু উপলক্ষ্য করে মাঝে মাঝে সে বিরোধ আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। তারই একটি নিখুঁৎ চিত্ররূপ 'কালিন্দী'। দুরন্ত নদীর বুকে নতুন জেগে ওঠা চর নিয়েই বিভিন্ন শরিকের মধ্যে বিরোধের প্রথম সূত্রপাত। এ চর কার ? প্রত্যেক জমিদারেরই দাবী চর তার সীমানায় উঠেছে অতএব এ চরের উপর তারই অধিকার।

এই অভিশপ্ত চরই সমগ্র কাহিনীর পটভূমি বা কেন্দ্রভূমিও বলা চলে। এই চরকে কেন্দ্র করে কেবল জমিদারে জমিদারে সংঘর্ষ নয় জমিদার-প্রজা এবং কল মালিকের সঙ্গে জমিদারের সংঘাতের চিত্র দেখানো হয়েছে। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রামেশ্বর চক্রবর্তীর বর্তমান জীবন সমগ্র কাহিনীতে ধূসর পূর্বইতিহাসের রহস্যময় রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছে মাত্র; এবং সেই সঙ্গে রায়বংশের সঙ্গে চক্রবর্তী বংশের নুতন সম্পর্কের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেছে। মহীন অহীনের প্রতি ইন্দ্র রায়ের দুর্বলতার মূল কারণ রাধারাণীকে কেন্দ্র করেই। রামেশ্বরের মানসিক ব্যাধির মূল কারণ সেও ঐ রাধারাণী। মহীনের কারাবাসের কারণও রাধারাণীর সূত্র ধরেই। কিন্তু সেটিই কাহিনীর একমাত্র বক্তব্য নয়। কারণ 'কালিন্দী' উপন্যাসে চরকে কেন্দ্র করে জমিদারি চরিত্রের বিভিন্ন দিকই বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রায়হাটের জমিদারদের বহুবিভক্ত জমিদারি ও তাদের বর্তমান আয়ের একটি সুস্পষ্ট হিসাব তারাশঙ্কর দিয়েছেন। "রায় বংশের বর্তমানে একশত পাঁচজন শরিক, বাকী খাজনার মোকদ্দমায় জমিদার পক্ষীয়গণের নাম লিখিতে তিনপৃষ্ঠা কাগজ পূর্ণ হইয়া যায়।"

এই বংশেরই অন্যতম শরিক হরিশ রায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন "সমগ্র রায় সেজতরফের এক আনা অংশের অর্থাৎ ষোল আনা সম্পত্তির এক পয়সা রকমের মালিক হলেন হরিশ রায়।" এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্করেরই সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার গল্প মনে পড়ে।

হরিশ রায়ের চরিত্রে প্রতিফলিত ভাঙনোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের বিশেষ চেহারা নিয়ে তারাশঙ্কর যেন একটু শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন। "এই এক পয়সা পরিমাপ জমিদারির অংশ লইয়া ভদ্রলোক অহরহই ব্যস্ত এবং কাজ লইয়া মাথা তাঁহার তুলিবারও অবসর থাকে না। তিনি কাগজের পর কাগজ তৈয়ারী করিয়া চলিয়াছেন। জমিদারির এককণা জমি যদি কেহ আত্মসাতের চেষ্টা করে তবে তাঁহার আয়নার মত কাগজে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবেই।" এই সম্পর্কে

হরিশ রায়ের গর্বিত উক্তি—"নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকে নক্সা, জমাবন্দী জরিপ, খতিয়ান, জমাওয়াশীল বাঁকি সব আমার কাছে। কি বলব, পয়সা তেমন নাই হাতে তা নইলে, চাক চান্দী লাগিয়ে দিতাম আমি।" জমিদারী কাজে ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দ গুলির সুষ্ঠু ব্যবহার তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন।

সামগ্রিক আয়ের হিসাব দিতে গিয়ে লেখক বলছেন—"আয়ের দিক দিয়া বাৎসরিক পাঁচশত টাকার আয় বড় কাহারও নাই। কেবল ছোটবাড়ী আজ তিন-পুরুষ ধরিয়া এক সন্তানের বিশেষত্বের কল্যাণে এখনও উহারই মধ্যে সমৃদ্ধিপন্ন। ইন্দ্রচন্দ্র রায়ের বাৎসরিক আয় দেড় হাজার হইতে দুই হাজার হইবে।"

রামেশ্বর চক্রবর্তী অপেক্ষা ইন্দ্র রায়ের আয় কম হলেও জমিদারি মেজাজ ও প্রতাপ তাঁর দোর্দণ্ড। তার কারণ অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী রামেশ্বরের অসুস্থতা। ইন্দ্র-রায়ের চরিত্রে জমিদারসুলভ দাম্ভিকতা ও প্রভুত্ব পরায়ণতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। অপর দিকে রামেশ্বরের দুই পুত্র অহীন্দ্র ও মহীন্দ্রকে তারাশঙ্কর বিপরীত ধর্মী উপাদানে গড়েছেন। মহীন্দ্রের তেজস্বিতা, ক্রোধপরায়ণতা, ক্ষমতা-লোভ জমিদারি নীলরক্তের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। মা সুনীতির ( সুনীতির সঙ্গে ধাত্রীদেবতার জ্যোতির্ময়ী চরিত্রের সাদৃশ্য এবং শিবনাথে অহীন্দ্রের সাদৃশ্য লক্ষনীয় ) আদর্শবাদ এবং নির্বিবাদী মনোভাব তাকে স্পর্শ বা বিচলিত তো করেই না উপরন্তু আভিজাত্যের অহমিকায় মায়ের সম্পর্কে সে অবজ্ঞাসূচক মনোভাব প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না—যখন সে নায়েব মজুমদারকে বলে—"ভয়টা তাঁর ( সুনীতির ) খুবই বেশী। জমিদারী ব্যাপারটাই হল ওর কথা বাপেদের তিন-পুরুষ হল চাকরে।"

কালিন্দীর চর দখল নিয়ে ইন্দ্র রায়ের অনুগৃহীত ব্যক্তি ননী পালকে মহীন হত্যা করল। সাময়িক উত্তেজনা বশে। কিন্তু এর মূলে কি কেবলই বিমাতার প্রতি বা বংশের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত ছিল? মামলায় সরকারী উকিলের যুক্তির মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর অতি সহজেই সে প্রশ্নের সমাধান করেছেন। সরকারী উকিল অতি সহজেই বিচারক ও জুরীগণের কাছে প্রমাণ করলেন যে, হত্যাকাণ্ড—মায়ের অপমানে আহত পুত্রের সাময়িক ক্রোধ ও উত্তেজনা বশতঃ ঘটে নি—এর পেছনে সুচিরস্থায়ী জমিদারি দম্ভই প্রকাশিত—জমিদার ও প্রজার মধ্যে চিরকালের বিরোধ একটি ছুতায় আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র। উদ্ধত জমিদারপুত্র এই তেজস্বী প্রজাটিকে, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবেই হত্যা করেছে। সরকারী উকিলের প্রমাণ মেনে নিয়ে মূর্তিমান উগ্রতার মত পিঙ্গল চক্ষু মহীন্দ্র যখন বলে উঠল "হ্যাঁ, উদ্ধত প্রজা হিসাবেই তাকে আমি গুলি

করে মেরেছি।" তখন সরকারী উকিল মন্তব্য করল "দেখুন দেখুন আসামীর মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখুন প্রাচীন আমলের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জলন্ত নিদর্শণ।"

কথাটা মিথ্যা নয়। তবে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব কেবল প্রাচীনকালে কেন আধুনিক কালেও একইভাবে বিদ্যমান। নানাবিধ শোষণ কার্যের মধ্য দিয়ে সে অত্যাচার প্রকাশ পেয়েছে। হত্যাকাণ্ড তো প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইন্দ্র রায়ের গোপন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রের অত্যাচারের আর এক দিক তারাশঙ্কর বর্তমান উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

জমিদার ইন্দ্ররায় মোটা সেলামী ও খাজনার বিনিময়ে চরবিলি ও সেখানে প্রজা কবুলতি করতে দৃঢ় সংকল্প। প্রজাদের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে যে ধরনের জালজুয়াচুরি ও অত্যাচার চলত ইন্দ্র রায়, মজুমদার, শ্রীরাম, নবীন বাগ্‌দী এদের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর তারই দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সেইসঙ্গে সহজ সরল দরিদ্র চাষী ও প্রজারা চিরকাল কি ভাবে উলুখড়ের মত রাজায় রাজায় বিরোধের শিকার হয় তারও চমৎকার নজীর রেখেছেন। জমিদাররা অজ্ঞমুর্খ প্রজাদের কাছ থেকে টিপসই দিয়ে তাদের কাছ থেকে মোটা খাজনার বন্দোবস্ত করে তবেই জমিতে কবুলতি দেয় এবং মোটা মুনাফা জমিদারের ঘরে আসে, তারই দৃষ্টান্ত সাঁওতাল প্রজা রংলাল প্রভৃতি। জমি বাবদ টিপসই দিয়ে বেশী টাকা লিখিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলে তাদের সঙ্গে। কমল মাঝির নাতনীর কাছে যখন জমিদারের এই কারচুপি ধরা পড়ে যায়—তখন ইন্দ্র রায় হেসে ব্যাপারটাকে লঘু করে দেবার চেষ্টা করেন।

প্রজারা সকলেই ভাগচাষী। ভাগের জমিকে শ্রমজলে তারা শস্যশ্যামলা করে তোলে। কিন্তু সেই কয় পুরুষের মাটি থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে জমিদারের ন্যায়বোধে বাধে না। প্রজাদের মধ্যে জমিবিলির নামে জমিদার যে নিজের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখে—প্রজা বা ভূমির স্বার্থ নয়—তার ইঙ্গিত কালিন্দীতে আছে।

কেবল বহুধা বিভক্ত হওয়ার জন্যই নয় এই শোষণনীতির জন্যই অধিকাংশ জমিদার প্রজার কাছে শত্রু স্থানীয় হয়ে উঠত—অবশ্য তাদের সেই চেতনা জাগ্রত করার জন্য কিছু নেতৃত্বেরও প্রয়োজন ছিল।

যে, স্নেহ ভালবাসায় সরল চাষীদের হৃদয় জয় করে তাদের আপনার হয়ে উঠত, তাকেই তারা দেবতার স্থানে বসাত। অহীন্দ্র প্রজার কাছে সেই দেবতুল্য মানুষ। চর চক্রবর্তীদের সীমানায় নয় জেনেও তারা বলে রাঙাবাবুকেই তারা

খাজনা দেবে, রাঙ্গাবাবুই তাদের জমিদার, অথচ এই সরল যুক্তি বাস্তবে কোনও মূল্য পায় না, এইখানেই ট্রাজেডি। আইনের কাছে আবেগের কোনও দাম নেই। জমিতে যে ফসল ফলায় জমি তার নয় জমি জমিদারের—তাও সেই জমিদারের নয় —যে প্রজার সুখদুঃখের ভাগীদার হয়। অত্যাচার এবং শোষণই হয়তো জমিদারিত্বের অন্যতম সংজ্ঞা। অথবা জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে হয়তো প্রজার কল্যাণ বা প্রজাস্বার্থ দেখা সম্ভব নয়, তাই যারা জমিদার তারা হয় শোষক। আর যারা প্রজা হিতৈষী—তারা জমিদারবংশে জন্মালেও খাঁটি জমিদার হতে পারে না—যেমন হতে পারে নি ধাত্রীদেবতার শিবনাথ, তেমনি কালিন্দীর অহীন্দ্র। অথবা তারই পিতামহ সোমেশ্বর চক্রবর্তী। সে ছিল বিদ্রোহের নায়ক।

কালিন্দীতে কেবল সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়, শরিকী বিরোধ, জমিদার-প্রজা সংঘর্ষ, জমিদার চরিত্র এবং জমিদারি শোষণের চিত্রই অঙ্কিত হয় নি—এখানে আধুনিক কালের আর এক বাস্তব সত্য প্রতিফলিত সে হল বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগে মহাজনী বা ব্যবসায়ী অর্থাৎ বণিকতন্ত্রের সূচনা।

কালিন্দীর চরে চিনির কল বসানো—এই নিয়ে যে শরিকী লড়াই দেখা দিল তারই সুযোগে কিভাবে পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীরা আপন আপন সুবিধা করে নিয়েছে তার দৃষ্টান্ত এ কাহিনীতে রয়েছে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ক্রমে ভেঙে পড়েছে। বণিকের কাছে জমি বিলি করে বা জমি পত্তনি দিয়ে জমিদাররা ক্রমশঃ সহরমুখী হতে থাকে। এইভাবেই দলাদলির ফলে সামন্ততন্ত্র ক্রমশঃ বণিকতন্ত্রের কাছে নিজেদের বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কালিন্দীর চর স্বার্থের প্রয়োজনে প্রজাদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করার চেষ্টায় যে রক্তাক্ত ইতিহাস গড়ে উঠেছিল—তার চরম পরিণতি ঘটল চিনির কলের মালিকদের জোর জবরদস্তি করে চর দখল করার ঘটনায়। মামলায় জমিদার পক্ষের পরাজয় ঘটল। কলের মালিক মোটর লাঙল চালিয়ে চর দখল করল। কলওয়ালা বিমলবাবু। তারা হালে বন্দোবস্ত করা চাষীদের জমি পর্যন্ত দখল করে নিচ্ছে। ইন্দ্র রায় শেষবারের মত চাষীদের সমবেত হবার জন্য ডাক দিলেন জমি দখলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। কিন্তু নির্বোধ চাষীরা ইতিপূর্বেই নায়েব মজুমদারের খপ্পরে পড়ে শেষ সম্বল পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। চরের জমি বন্দোবস্ত করে দেবার নাম করে সেলামী বাবদ তাদের বাপৌতী সম্পত্তি বন্ধক নিয়ে দলিল করে নিয়েছিল মজুমদার। বলেছিল চরের জমি বন্দোবস্ত হয়ে গেলে এ দলিল ফেরত দিয়ে চরের জমি বন্ধক দিয়ে দলিল করে দিতে

হবে। কিন্তু এখন নতুন দলিলে সই করিয়ে নিয়ে বলেছে—বন্ধক নয় জমি বিক্রি হয়ে গেল—এ দলিল কবলা দলিল[১]। সে দলিল রেজেস্ট্রীও হয়ে গেছে নইলে সাবেক বন্ধকী দলিল তারা ফেরত পেত না।

ইন্দ্র রায় বুদ্ধ আক্রোশে ফু'সতে লাগলেন। কারণ প্রথমেই যখন ইন্দ্র সাঁওতাল প্রজাদের টিপছাপ দিয়ে কবুলতি লিখে দিতে বলেছিলেন, তারা রাজী হয়নি। কালিন্দীর চরকে তারা ইন্দ্র রায়ের জমিদারী বলে মানতে চায় নি—তাই কিস্তি কিস্তি খাজনা দিয়ে কবুলতি[২] লিখে দিতে তারা স্বীকৃত নয়। তাদের মতে চর রাঙাবাবুর অর্থাৎ চক্রবর্তীদের। অতএব তার খাজনা তাদেরই দেবে।

তাই আজ এই নির্বোধ অথচ কূটমতি অপদার্থ চাষীগুলোর ওপর ইন্দ্র রায়ের ক্রোধের সীমা রইল না। লেখকের মন্তব্য "তাঁহার জমিদার-মন হতভাগ্যের নিরুপায় দিকটা দেখিতে পাইল না।"

সেই শোষণমূলক সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দিকে দিকে যে নতুন সমাজব্যবস্থার আদর্শ জেগে উঠছে—রুশ দেশ তার জন্মভূমি। আধুনিক কালের জমিদারতনয়—অহীন্দ্রও সেই শোষণহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে। উমার মুখ দিয়ে অহীন্দ্রের আদর্শ তারাশঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় এক জায়গায় ব্যক্ত করেছেন। সুনীতির প্রশ্নের উত্তরে উমা বলেছে—

"এরা চায় মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনও ভেদ থাকবে না। জমি ধন সব সমানভাবে ভাগ করে নেবে। সেইজন্যে তারা বিপ্লব করে এ রাজত্ব উল্‌টে দিতে চায়।"

উমা অহীন্দ্রের একটি বিশেষ অভিব্যক্তিকে সেদিন অকপটে প্রকাশ করে ফেলেছিল। তার কথায় বলা যায় সাঁওতালদের চরের জমি কেড়ে নেওয়ার পর তারা একদিন ভোর রাত্রে চর থেকে উঠে চলে গেল। "তিনি [অহীন্দ্র] বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন। সেদিন আমায় বলেছিলেন—এ পাপ আমাদের পাপ। পুরুষ পুরুষ ধরে এই পাপ আমাদের জমা হয়ে আসছে। কলের মালিক একা এর জন্য দায়ী নয়। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে।" [সাম্প্রতিক উপন্যাস বিমল মিত্রের আসামী হাজিরের নায়ক সদানন্দ চরিত্রের সঙ্গে এর ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়] সুতরাং দেখা যায় 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী' ও

১। কবলা-দলিল—বিক্রয়পত্র বা খরিদ বিক্রয়ের দলিল

২। কবুলতি—প্রজা পাট্টার অনুরূপ সর্তে যে কাগজে লিখিয়া জমিদারের নিকট খাজনা দিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

ধাত্রীদেবতায় একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অপরদিকে তার বিরুদ্ধে সঞ্চিত গণবিক্ষোভ ও ব্যক্তি বিক্ষোভ প্রবলতর হয়ে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের সম্ভাবনাময়তাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। শুধু জমিদারি চরিত্র ও শোষণ নীতির চেহারা নয়—বিভিন্ন ভূমি সংস্কার ও প্রজা স্বত্বাধিকার আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনাও তিনি করেছেন এবং সেই সঙ্গে শোষিত মানুষের নবজাগ্রত চেতনা ও তার জয়যাত্রা সামন্ততন্ত্রের যে অবক্ষয়কে অবধারিত করে তুলেছে, তারও স্পষ্ট আভাস তিনি রেখেছেন। এই হিসাবে তারাশঙ্করের উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের একালের রূপই প্রতিফলিত আমরা বলতে পারি।

উপন্যাসের মত, বিভিন্ন ছোটগল্পেও তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। গল্পসঙ্কলনের অন্তর্গত রায়বাড়ি ও জলসাঘর, সাড়ে-সাত-গণ্ডার জমিদার ইত্যাদি অপর ছোটগল্পে নিঃস্বসার সামন্ততন্ত্রের গর্বোদ্ধত আচরণের পিছনে যে সুগভীর বিষাদ বাষ্প জমে থাকে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন তারাশঙ্কর। বহুধাবিভক্ত, প্রায় অবলুপ্ত জমিদারদের মধ্যে বর্তমানে যে কি অন্তঃসলিলা বেদনা ধারা প্রবাহিত-বাইরের জাঁকজমকে অন্দরের দৈন্য চাপা দেবার চেষ্টা করেও তার দীনতা চেপে রাখা যায় না। অবশ্য বাইরেও আর সে জাঁকজমকের ঔজ্জ্বল্য নাই। সবই বিবর্ণ, মলিন রং চটা। কারণ অর্থাভাব, ধূলিমলিন পুরানো জাজিম, তাকিয়া আর ঝাড়লণ্ঠনে রিক্ততা আরও যেন প্রকট হয়ে ওঠে। শূন্যগর্ভ জমিদার যখন প্রাচীন ঐতিহ্যের মলিন জীর্ণ অবশিষ্ট বস্তুসম্পদ দিয়ে পুরানো ঠাঁট বজায় রাখার চেষ্টা করেন তখন বর্তমানের অভাবটা যেন আরও বেশী করে চোখে পড়ে।

রায়বাড়ি জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপের কাহিনী জলসাঘর তারই বিলীয়মানতার সাক্ষী। এই দুই গল্পে সামন্ততন্ত্রের সেকালের গৌরবময় অধ্যায় ও একালের অবক্ষয়ের চিত্র পাশাপাশি ফুটে উঠেছে।

রায়বাড়ি গল্পের রাবণেশ্বর রায় রায়বংশের চতুর্থপুরুষ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বা আদিপুরুষ ভুবনেশ্বর রায়। রায়বংশের একটি ধারাবাহিক পরিচয় দিতে গিয়ে জলসাঘরে তারাশঙ্কর লিখেছেন "তিনপুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন সঞ্চয়, চতুর্থপুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠপুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ, সপ্তমপুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণ সমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন।"

এ কেবল রায়বংশ নয়—সকল সামন্তবংশেরই ক্রমপরিণতির চিত্র। বাকী

রাজস্বের দায়ে জমিদারির মামলা প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত উঠত। এবং প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে সমস্ত ভূসম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়তেন জমিদাররা। কেবল বাড়িঘর ও লাখেরাজের কায়েমী বন্দোবস্তটুকু[১] ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। অর্থ ও প্রতিপত্তি হারিয়ে কেবলমাত্র পুরানো স্মৃতি ও আভিজাত্যের মোহকে আঁকড়ে থাকার যে কি বেদনা—আইনতঃ, জমিদারি উচ্ছেদের আগেকার জমিদার শ্রেণীর শোচনীয় অবক্ষয়ে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। তবু জীর্ণ ফাটলধরা রায়বাড়ির নাম এখনও 'রাজবাড়ী'। শ্রীহীন বিশ্বম্ভর এখনও রায় হুজুর।

জলসাঘরের প্রথম গল্প রায়বাড়ীতে সেকালের দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার রাবণেশ্বর রায়ের জমিদারি শাসনের ইতিহাস বর্ণিত। সময়টা সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকাল। অর্থাৎ বিদ্রোহের আগুন নেবে নি তখনও। দেশে দুর্ধর্ষ মানুষের তখনও উত্তেজনার শেষ হয় নি। দেশে রাবণেশ্বরের মত প্রতাপশালী ভূস্বামীদের প্রাধান্য তখনও সর্বজন স্বীকৃত। বিশেষ ভূখণ্ডের অধিকার নিয়ে জমিদারে জমিদারে লড়াইও ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। তবে ক্ষুদ্র ভুস্বামীরা পরিণামে বৃহৎ জমিদারের কাছে হার মানেন। ছত্রিশখানি গ্রামসমন্বিত হুন্দা শ্যামপুর বিভিন্ন জমিদারের মধ্যে হাত বদল হয়ে শেষ পর্যন্ত কিভাবে রাবণেশ্বর রায়ের হস্তগত হল এবং তার থেকেই বিরোধ। রায়বাড়ীর ট্রাজিডিও সেই সঙ্গেই নেমে এল। হুন্দা শ্যামপুরের শেষ জমিদার আক্রোশ বশতঃ রাবণেশ্বর রায়কে ডেকে পত্তনি বিলিই[২] করলেন। রায় তাঁর ইষ্টদেবী কালীমাতার সেবায়েত স্বরূপে সম্পত্তি পত্তনি গ্রহণ করলেন।

কিন্তু সেই হুন্দা শ্যামপুরের লোকেরা তাদের আক্রোশ মেটানোর জন্য গোমস্তাকে পুড়িয়ে মারায় জমিদার চরম প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলেন, গৃহিণী ব্রজরানী নিষেধ করলে তার উত্তরে রায় বলেন—"গিন্নী, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। শ্যামপুরের প্রজারা আমার মাথায় পা দিয়েছে।"

গৃহিণী উত্তরে বলেন—"আমার বাবাও তো জমিদারি শাসন করেন।"

হেসে রায় কর্তা বলেন "বৈষ্ণবী মতে। কিন্তু আমরা শাক্ত গিন্নী। তোমার বাপেদের সঙ্গে আমাদের মতে মিলবে না। দেখলে তো সেপাই হাঙ্গামা কোম্পানী কেমন করে শাসন করলে।"

রায়কর্তার পুরুষোচিত দৈহিক গঠন তাঁর প্রচণ্ড আত্মাভিমান এবং দুর্বার

১। কায়েমী বন্দোবস্ত—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

২। পত্তনি বিলি—প্রজা বন্দোবস্ত

প্রতিশোধ পরায়ণতা যেমন জমিদার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অন্যদিকে রায়-বাড়ীর ঐশ্বর্য, আড়ম্বর ভোগ, সচ্ছলতা, প্রকাণ্ড প্রাসাদের আভিজাত্য, চকমিলানো মজলিসঘরের বিলাস বাহুল্য—সেকালের সামন্তশ্রেণীর প্রভাব ও প্রতাপ এবং শৌখীন মেজাজের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

রায়বংশের প্রতি কেবল রায়বাড়ীরই যে মমতা তা নয়—সমস্ত প্রজারা সকলেই চেয়েছে রায়বংশ অক্ষুণ্ণ থাকুক। স্ত্রীপুত্র বিরহিত রায়কর্তার শূন্যজীবন তাদেরই সদিচ্ছায় তাই আবার পূর্ণ হতে পেরেছিল পুনর্বিবাহ ও বংশরক্ষার মাধ্যমে। রায় পরিবারের ঔদার্য ও মহত্ত্ব তাঁদের আরও প্রভাবশালী করে তুলেছিল। অত্যাচারের সময় যিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য —আবার মুহূর্তের বৈরাগ্যের ফলে তিনি সেই প্রজাদেরই ক্ষতিপূরণের জন্য সমস্ত সঞ্চিত ভাণ্ডার উজার করে দিতে উদ্যত হয়েছেন। অত্যাচার এবং দাক্ষিণ্য, শোষণ এবং ক্ষমা সেকালের বহু জমিদার চরিত্রই এই দুই বিরোধী গুণের সমন্বয়ে প্রজাদের কাছে যুগপৎ ভীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। রাবণেশ্বর চরিত্রে তারাশঙ্কর জমিদার চরিত্রের সেই মহামহিম প্রতাপান্বিত রূপ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কিন্তু তার পরেই জলসাঘরে আর এক হৃত গৌরব জমিদার চরিত্র তার যথার্থ বাস্তব-চেহারা নিয়ে ধরা দিয়েছে। রায়বংশের শেষ প্রদীপ বিশ্বম্ভর রায়। শেষ—কারণ বিশ্বম্ভর রায়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলেই লোকান্তরিত। সেই প্রকাণ্ড জীর্ণ প্রাসাদে তিনি শুধু একা নন—অন্তরে ও বাহিরে সম্পূর্ণ নিঃস্ব। ধন জন সব গিয়েছে। আছে শুধু শূন্য জীর্ণ কঙ্কালসার প্রাসাদ। রুদ্ধদুয়ার জলসাঘর, লোহার সিন্দুকে মৃতা স্ত্রীর অলঙ্কারের বাক্স—তাতে অবশিষ্ট আছে কেবলমাত্র সাতপুরুষের বধূবরণের মাঙ্গলিক সামগ্রী—একটি সিঁথি—আর কয়েকখানি মোহর। তার কয়েকখানি রায়গিন্নীর আশীর্বাদের মোহর, অন্যগুলি মহাল থেকে প্রাপ্ত নজরানার মোহর—সেগুলি রায়গিন্নীকে উপহার দিয়েছিলেন।

আর আছে এই বংশের অতীতের শৌর্য-বীর্যের সাক্ষী তুফান আর ছোটগিন্নী। রায়বাবুর বড় আদরের ঘোড়া আর হাতী।

তারাশঙ্কর উদীয়মান ধনীপরিবার গাঙ্গুলীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন সোনার দেউলের। রায়বংশের সঙ্গে গাঙ্গুলীদের তুলনা করতে গিয়ে লেখক বলেন—"তাঁহারা ( গাঙ্গুলীরা ) সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হস্তিনীর খাতির বেশী" অর্থাৎ অর্থ-কৌলীন্য না থাকলেও প্রাচীনের একটা ঐতিহ্য আছে—বিলীয়মান রায়বংশ

আজও সেই ঐতিহ্যের সাক্ষী। প্রজাদের কাছে তাঁদের এখনও রাজার সম্মান— গাঙ্গুলীরা তাতে বঞ্চিত—তাই মনে মনে তাঁরা সেই আক্রোশে ফুঁসতে থাকে। জলসাঘর গল্পে নবীনের সঙ্গে প্রাচীনের সেই দ্বন্দ্বটি চমৎকার ব্যঞ্জনা পেয়েছে তারাশঙ্করের লেখনীতে। নূতন ধনী মহিম গাঙ্গুলী, নতশির রায়বাবুর মাথা আরও একটু হেঁট করার অভিপ্রায়ে ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করল যাতে জমিদারি ঠাঁট বজায় রাখতে গিয়ে রায়বাবুর নিঃস্বতা প্রকাশ পায় এবং সেই সঙ্গে গাঙ্গুলীদের প্রভাব ও ধনগৌরবের প্রচার হয়। অথচ এককালে এই গাঙ্গুলীরা কি ছিল তার ইতিহাস বিবৃত করে তারাশঙ্কর লিখেছেন—

"গাঙ্গুলী বংশ চিরদিন রায়দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করিয়াছে। মহিমের পিতা জনার্দন পর্যন্ত রায়বাড়ির কর্তাকে বলিত হুজুর।"

কিন্তু সেই পুরানো সম্বোধন সংশোধন করে মহিম গাঙ্গুলী 'ঠাকুর্দা' বলে রায়বাবুকে অন্তরঙ্গ করার চেষ্টা করে। তার মুখে এই নতুন সম্বোধন স্পর্ধার মত শোনায়। অর্থাৎ ধনগৌরবে সে যে শ্রীভ্রষ্ট রায়বাবু অপেক্ষা হীন নয় সেই ভাবটিই প্রকাশ পায়।

মহিম গাঙ্গুলীর নতুন ঐশ্বর্যের ঔজ্জ্বল্য অন্নপ্রাশন উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাপারেই অত্যুগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বসেছিল নাচগানের আসর। সেই আসরের উপযুক্ত রূপলাবণ্যের দীপ্তি নিয়ে পশ্চিমা বাঈজীও উপস্থিত। কিন্তু অনুপস্থিত কেবল বিশ্বম্ভর রায়। ফলে মহিমের ঐশ্বর্যে বিলাসের সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হতে বসেছে। কারণ এ সবের পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রায়বাবুদের উপর টেক্কা দেওয়া তবু মহিম গাঙ্গুলী হাল ছাড়ে নি। রায়বাবুকে পরাস্ত করার অভিলাষে পশ্চিমা বাঈজীকে রাজবাড়ীর পথ দেখিয়ে দিল।

মহিম জানত বিশ্বম্ভরের রক্তে আছে চিরকালের জমিদারসুলভ বাঈজীর নেশা যদিও তার উপযুক্ত ইনাম দেবার ক্ষমতা আজ তাঁর নেই। হৃতসর্বস্ব বিশ্বম্ভরের এই অসহায় অবস্থাটাই হবে মহিম গাঙ্গুলীর উপভোগের বিষয় কারণ সেখানেই তার জিৎ। হলও ঠিক তাই। রূপবতী বাঈজীদের বিশ্বম্ভর ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। ঐশ্বর্যাভিমান না থাকলেও আত্মাভিমানশূন্য হতে পারেন নি বিশ্বম্ভর। তাই তাঁরই নির্দেশে দীর্ঘদিন পর পুরানো জলসাঘরের দ্বার খুলে সেখানে নাচের আসর বসল। বহু প্রাচীন ধূলিমলিন জাজিম তাকিয়া ফরাস বিছানো হল। ঝাড়লণ্ঠনে বাতি জ্বলল। রায়বাড়ীর ভৃত্য অনন্ত তকমা আঁটা উর্দি পেটি পাগড়ি পরে শরবতের পাত্র নিয়ে প্রস্তুত হল সেই সঙ্গে হুইস্কিরও ব্যবস্থা আছে।

রায়বাড়ীতে জলসাঘর জমজমাট। বাঈজীদ্বয় পিয়ারী বাঈ ও কৃষ্ণা বাঈয়ের সঙ্গীতলহরী জলসাঘরকে সরগরম করে তুলেছে। সঙ্গীতমুগ্ধ অজগরের মত বিশ্বম্ভর গান শুনছেন। আসরে অন্যেরাও নীরব। কেবল মহিম গাঙ্গুলী ছাড়া। তার কাটা কাটা মন্তব্য, শ্লেষাত্মক সমালোচনা, ধনের অহঙ্কার, নানাভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু তাতে রাজবাড়ীর রায়বাবুর প্রতি বাঈজীদের সম্ভ্রমবোধ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ তারা মানুষ চেনে। জানে মরাহাতী লাখ টাকা।

অন্যদিকে বাঈজীদ্বয়ের মধ্যে বিশ্বম্ভর দেখতে পান অতীত দিনের ছবি। ফুলের স্তবকের মত সুন্দর সেই চন্দ্রা আর জোহরা বাঈকে তাঁর মনে পড়ে যায়। তাঁর যৌবনে দেখা সেই দুই সুন্দরী বাঈজী।

জলসাঘরের চার দেয়ালে প্রলম্বিত রয়েছে—সারি সারি তাঁর পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন ভঙ্গির প্রতিকৃতি। এইসব দেখতে দেখতে ক্রমশঃ বিশ্বম্ভরের রক্তে জমিদারী নেশা ধরে যায়। সুরার উগ্রতা ও বাঈজীদের সঙ্গীতোন্মত্ততায় রায়বাবুর স্তিমিত রক্তস্রোতে হঠাৎ উন্মাদনা আসে এবং সেই মুহূর্তে তাঁর অতীতের নিত্যসহচর, যৌবনের সঙ্গী তুফানকে মনে পড়ে।

তুফানকে তিনি সাজিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। রায়বংশের শেষ সম্বল সেই মোহর আর সিঁথি বাঈজীর ইনাম দিতেই ফুরিয়ে গেল, কিন্তু তাতে রায়বাবু দমে যান নি—কারণ বাঈজীর কাছে রায়বংশের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় নি—মহিম গাঙ্গুলীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে।

আত্মতৃপ্তির প্রচণ্ড উল্লাসে সেদিন রায়বাবুর যৌবনের দিন যেন ফিরে আসে, তাঁর নীলরক্তে মাতন জাগে—তিনি তুফানের পিঠে চাবুক মেরে ছুটলেন দূরদিগন্তে যেমন আগেকার দিনে তিনি বা তাঁর পূর্বপুরুষেরা মহাল দেখতে যেতেন। বৃদ্ধ তুফানেরও রক্তে যেন জোয়ার আসে। প্রভুর উৎসাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেও ছোটে। কিন্তু হঠাৎ প্রভুর চলার বেগ থেমে যায় সেখানে—যেখানে শোনা গেল প্রজারা বলছে, রায়বাবুদের আমলে তারা সুখী ছিল। মহিম গাঙ্গুলী জমিদারি কেনার পর থেকে খাজনা দিয়ে আর লাভ কিছু থাকে না।

রায়বাবু চমকিত হয়ে চিনতে পারলেন—এ তিনি কোথায় এসে পড়েছেন এ যে তাঁর হারানো লাট, কীর্তি হাট ?

রায়বাবু লজ্জিত হয়ে ঘোড়া ফেরালেন, তিনি কিছুক্ষণের জন্য বর্তমানকে বিস্মৃত হয়েছিলেন সেই লজ্জা। ক্লান্ত শ্রান্ত রক্তাক্ত দেহে রায়বাবুকে নিয়ে ফিরে এল তুফান। জলসাঘর তখন নির্জন পরিত্যক্ত। তবু ঝাড়বাতির সব বাতিগুলো

তখনও নেভে নি। তারা যেন রায়বংশেরই শেষ প্রতীক। রায়বাবু জলসাঘরের সেই অতীতের মোহময় পরিবেশে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না।

পূর্বপুরুষদের ঐশ্বর্য বিলাসের অসংখ্য স্মৃতিবিজড়িত জলসাঘরে তাঁকেও সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রায়বাবু তাই লোকজনদের চীৎকার করে ডেকে ঐ জলসাঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে বলেন।

এইভাবে রাবণেশ্বর রায় যে জলসাঘরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—বিশ্বম্ভরের আমলে তা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল, সেইসঙ্গে এক প্রাচীন বংশের ঐতিহ্যেরও যবনিকা পড়ল।

তারাশঙ্করের জমিদার সংক্রান্ত বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত। এই বিষয়ক অন্যান্য গল্পের মধ্যে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যায় 'সাড়ে-সাতগণ্ডার জমিদার' গল্পটি। জমিদার চরিত্রের আরও বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে—যথা 'পুত্রেষ্টি' গল্পে পুত্র কামনায় জমিদারের অন্ধ যুক্তিহীন মনোবিকার, 'কুলীনের মেয়ে' গল্পের জমিদার পিতার খেয়ালীপনা ও অদূর-দর্শিতার শোচনীয় পরিণাম, 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়' জমিদার শাসিত গ্রামীণ জীবনের ছকে বাঁধা আনুগত্য থেকে মুক্তিলাভ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে শহরের যন্ত্র সভ্যতার প্রতি উন্মুখ হওয়ার ইচ্ছা—তার মধ্যেও নিহিত আছে জমিদারের দীর্ঘদিনের অবিচার ও শোষণের ইঙ্গিত এবং তারই বিরুদ্ধে কৃষাণের পুঞ্জীভূত অভিমান।

'হাঁসুলীবাঁকে'র করালীর এই শহরমুখিতা 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের কথা মনে করায়। সেখানেও গৃহস্থ চাষী নিঃস্ব হয়ে মজুরে পরিণত হয়েছে। শ্রমজীবীরা চাষবাস ছেড়ে শহরের কলকারখানার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। জমিদাররাও শহরমুখী হয়েছে, যেমন 'পঞ্চগ্রামের' জমিদার ঃ (কালান্তরের গুণীবাবু)। এইভাবে গ্রামীণ সমাজের কর্ণধার সামন্ততন্ত্রের উপর বণিকতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করছে।

'সাড়ে-সাতগণ্ডার জমিদার' গল্পের জমিদার চরিত্র যেন বিশ্বম্ভর রায়ের শেষ পরিণাম। নিঃস্ব উপাধিমাত্র সর্বস্ব—জমিদারের লুপ্ত সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্য তাঁর প্রাণপণ প্রয়াস শ্রদ্ধার পরিবর্তে হাস্যরস ও পরিণামে করুণ রস সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা' গল্পে ঠিক অনুরূপ চরিত্র আমরা দেখেছিলাম।

জমিদারী উচ্ছেদের পূর্বাহ্নে একালের নামমাত্র জমিদারদের হতশ্রী ফুটিয়ে তোলাই এই ধরনের গল্পের উদ্দেশ্য। প্রজাদের শাসন করার পদ্ধতিতে জমিদারের মেজাজ কিংবা প্রাক্তনদের ঐতিহ্য রক্ষা করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত প্রহসনে পরিণত হয়। কারণ প্রজারা জানে কতকগুলি দলিলপত্র ছাড়া এই জমিদারের

সিন্দুক শূন্যেগর্ভ। তাঁর তেজ ঢোঁড়া সাপের পক্ষে গোখরো সাপের অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। তাই প্রজারা আড়ালে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক নামকরণ করেছে 'কাগজেবাবু'।

প্রজাদের অবাধ্যতা, সমধর্মী জমিদারদের অনুকম্পা ও অবজ্ঞা মিশ্রিত বিদ্রূপোক্তি এসবের মর্ম তিনি যেন বুঝেও বোঝেন না। এও এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা যদিও তার মূলে এক গভীর দুঃখবোধ কার্যকরী। তাই শেষ পর্যন্ত ভাগিনেয়ের কথায় তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়। তিনি যে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন, তাঁর প্রকৃত অবস্থা যে কারোর অজানা নেই, এ সত্য যেদিন তাঁর কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হল সেদিনই জমিদারবাবু জমিদারির আদায় তহশিলের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করে কাশীবাসের প্রার্থনা জানালেন।

দুর্ধর্ষ ব্যক্তিরাই সে যুগে অত্যাচারী জমিদারের দুষ্টকর্ম সাধনের হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হত। শত্রুপক্ষের ধ্বংস সাধনের জন্য লুঠতরাজ অগ্নিসংযোগ হরণ ইত্যাদি কার্য জমিদাররা এদের সাহায্যেই নিষ্পন্ন করতেন। জমিদারি শাসনের এ ও এক দিক এবং দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তারাশঙ্করের 'ব্যাঘ্রচর্ম' গল্পে। 'ব্যাঘ্র-চর্ম' গল্পের রতন বাগদীর সঙ্গে মিল আছে, 'রায়বাড়ী' গল্পের কালী বাগদীর। কিংবা জোড়াদীঘির উদয়াস্তের (প্র-না-বি) জহিরুল্লা চরিত্রের।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'কীর্তিহাটের কড়চার' ভূমিকায় প্রকাশক লিখেছেন—"প্রায় দুশো বছর সময়ের পৃষ্ঠপটে, জমিদারি-প্রথার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এর কাহিনীতে একটি বংশের সাতপুরুষের ইতিহাস বিধৃত। তারাশঙ্কর নিজে জমিদারবংশের সন্তান, তিনি যেখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে অঞ্চলে ছোট বড় বহু জমিদারের বাস, 'সাড়ে-সাত গণ্ডার জমিদার' থেকে বিত্তশালী বড় বড় জমিদার অনেককেই উনি দেখেছেন। বিত্ত-হীন জমিদারদের ঐতিহ্যসর্বস্ব জীবনের পুরাতন মহিমাকে আঁকড়ে থাকার যে সকরুণ প্রয়াস প্রথম জীবনে বোধ করি এই মানসিকতাই ওঁকে বিচলিত করেছিল বেশী। জমিদারিপ্রথার কুফল প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা হয়েছে কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে ভাল কথাও কিছু বলবার আছে।...এই শ্রেণীটিকে সর্বাঙ্গীণভাবে দেখার সুযোগ ওঁর ঘটেছিল। লেখকের একাধিক বিখ্যাত রচনায় তার পরিচয় আছে। কিন্তু সবই প্রায় খণ্ড পরিচয়। বোধ করি সর্বশেষ প্রয়াস হিসেবেএই বিপুলাকার গ্রন্থটিতে তিনি একটি বংশের উত্থানপতনের সামগ্রিক ইতিহাসে তার একটা সর্বাঙ্গীণ চিত্র দেবারই চেষ্টা করেছেন—এবং তা সার্থকও হয়েছে।"

অর্থাৎ প্রকাশকের নিবেদন অনুসারে বলা যেতে পারে কীর্তিহাটের কড়চা

তারাশঙ্করের জমিদারী প্রথার একটি পূর্ণাঙ্গ মহৎ বিশ্লেষণ। চারখণ্ডে সম্পূর্ণ এই বিশাল ও অনন্য গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে তারাশঙ্করের সামন্তচিন্তা পর্বের ছেদ টানা যেতে পারে।

এই গ্রন্থের আরম্ভ কাল ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর। কীর্তিহাটের জমিদার-পুত্র, বিখ্যাত রায়কুঠির বর্তমান মালিক সুরেশ্বর রায়ের কাহিনী দিয়ে আদিপর্বের সূত্রপাত। তার নিজের আঁকা তৈলচিত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বপুরুষের ইতিহাসের অবতারণা। রায়বংশের আদিপুরুষ কুড়ারাম ভট্টাচার্য। তাঁর বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনাবহুল কাহিনী থেকে এই উপন্যাসের কথারম্ভ। কোম্পানীর আমলে পারমানেণ্ট সেট্‌ল-মেণ্টের সময় থেকে জমিদারি লাভের সূত্রে গোমস্তা কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পুত্র কি ভাবে হলেন জমিদার সোমেশ্বর রায়—রায়বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা জমিদার—তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

সোমেশ্বর থেকে সুরেশ্বর—সাতপুরুষের ব্যবধান সেই সঙ্গে ঘটেছে সামন্ত-তন্ত্রের বিবর্তনও। সোমেশ্বর রায় কোম্পানীর আমলের জমিদার। আর সুরেশ্বরের আমল স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ যুগ থেকে স্বাধীনতা উত্তরকাল। এই সময় বিভিন্ন ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়নের ফলে জমিদারদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সীমিত হয়ে গিয়েছে। ১৯৫৩ সালেই ভূসম্পত্তি অধিকার আইন (এস্টেটস্ একুইজিসান এ্যাক্ট)-এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে জমিদারিপ্রথা চিরতরে রহিত করে দেশের ভূমি-সংক্রান্ত আইনের এক নব অধ্যায়ের সূচনা করা হয়েছে। এই আইনের দ্বারা গভর্নমেণ্ট ও জমিস্থ খাস রায়তশ্রেণীর মধ্যবর্তী জমিদার, পত্তনিদার ইত্যাদি সকল স্তরের খাজনা প্রাপকদিগের জমিসংক্রান্ত সমুদয় স্বত্ব সরকার অধিকার করে নিয়েছেন। এই আইনের ফলে সরকারের নিকটতম ব্যক্তি হলেন জমিস্থ রায়ত-শ্রেণী এবং তাঁরাই সরকারকে রেভেনিউ বা রাজস্ব দেবেন।

১৭৯৯ সালে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কাছ থেকে কালীমায়ের নামে জমিদারি স্বত্ব লাভ করার পর সুরেশ্বর পর্যন্ত সাতপুরুষের ইতিহাস রায়বংশের বিভিন্ন জমিদারের চিঠিপত্র ও কড়চা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমান নায়ক সুরেশ্বরই সেই কড়চার ভাষ্যকার। সুলতার কাছে রায়বাড়ীর জবানবন্দি দিতে বসেছে সুরেশ্বর।

১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর—জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ হবার পর এই শেষ রাত্রি। অর্থাৎ জমিদার হিসাবে সুরেশ্বরের পরিচিতিরও যেন ইতি এইখানেই। তাই এই দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করতে চেয়েছে শেষ জমিদার হিসাবে তার জবানবন্দি শেষ করে। অর্থাৎ বর্ণনা করতে চেয়েছে রায়বংশের উত্থান

পতনের ধারাবাহিক ইতিহাস। সুরেশ্বরের জবানীতে, তারাশঙ্কর লিখছেন—"পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আগে থেকে জমি নিয়ে আইন বদলাতে বদলাতে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে মহাভারত হয়ে উঠেছে। বেঙ্গল টেনেন্সী এ্যাক্টের আয়তন দেখলে চমকে উঠতে হয়। আইন, ষষ্ঠ আইন, সপ্তম আইন, অষ্টম আইন, এসব, সেকালের। তখন প্রজাকে এনে আটক করে কয়েদ করে খাজনা আদায় করতে পারত জমিদারেরা। তারপর মাঠে ধান ক্রোক করে আদায় করতে পারত খাজনা। সেই আমলে সোমেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায় জমিদারি করে গেছেন তারপর ওসব আইনের অষ্টম আইন বাদে সব উঠে গেছে। জমিদার প্রজার মধ্যে সরকারের চোখে ভেদ নেই।"

লক্ষ্যণীয় পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের ফলে নূতন জমিদারি লাভের পর থেকে কি ভাবে জমিদারির পূর্ণ প্রভাব ও পরে ক্রমশঃ তার অবলুপ্তি ঘনিয়ে এসেছে—কীর্তিহাটের কড়চার বিশাল আয়তনের মধ্যে রায়বংশের বহু সন্তানসন্ততি ও শাখা-প্রশাখা বিস্তারের ঘটনায় তার কাহিনী বর্ণনা করেছেন—জমিদারি কিভাবে বিভিন্ন শরিকানায় বিভক্ত হয়। একদিকে জ্ঞাতিদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ বঞ্চনা ইত্যাদি জমিদারিকে বহু বিভক্ত করে, অন্য দিকে আছে নব নব সরকারী আইনের বিধিনিষেধ। এর উৎস হল জমিদারের প্রজাশোষণ বন্ধ ও প্রজার অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা।

কিন্তু 'কীর্তিহাটের কড়চায়' শুধু জমিদার-প্রজা সম্পর্ক নয়—লেখক তারাশঙ্কর জমিদারদের ভালমন্দ সব দিক তন্ন তন্ন করে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন—তা হল বিষয় থাকলেই ব্যভিচার থাকবে। এ কেবল রায়-বংশের নয়—তাঁর মতে সমস্ত ক্ষমতাশীল জমিদারবংশেরই ধর্ম। সোমেশ্বর থেকে সুরেশ্বর কেউ-ইএর ব্যতিক্রম নয়।

সোমেশ্বর থেকে সুরেশ্বর পর্যন্ত সমগ্র রায়বংশের ইতিহাসে একদিকে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়কার জমিদারের উগ্র ইংরেজভক্তির নজীর আছে—আবার অন্য দিকে নীলকর বিদ্রোহে জমিদারদের ইংরেজ বিদ্রোহী ভূমিকাও ছিল। প্রজাশোষণ, প্রজাপালন দুই ইতিহাসই সমান উপস্থিত। রাজভক্তির পরাকাষ্ঠাও যেমন অনেকে দেখিয়েছেন—আবার স্বদেশী বিপ্লবী হয়ে উঠেছেন এই বংশেরই সন্তান—ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে। মারণাস্ত্র সংগ্রহ করেছেন, জেল খেটেছেন—ফাঁসী গিয়েছেন। জমিদারী অর্জনের প্রয়াসও যত তীব্র ছিল—আবার নতুন আইনে জমিদারি হারিয়ে—সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশে যাবার আকাঙ্ক্ষা দেখা গেছে রায়-বংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। রায়বংশের চরিত্রে নানাবিধ মহৎগুণ—বিদ্যা,

বুদ্ধি, শিল্প, সাহিত্য, দানশীলতা প্রভৃতির সঙ্গে মিশে আছে ভোগবিলাস, খুন নরহত্যা, ব্যভিচার। সুরেশ্বর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে সরকারের কাছ থেকে 'কম্পেনসেশন' না নিয়ে, কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে নিজস্ব জমিদারির অংশ দান করে দিতে। একদিকে শিল্পপ্রতিভা, স্বদেশপ্রেম, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সত্ত্বেও, রায়বংশের স্বভাবসিদ্ধ লালসা প্রবৃত্তি সুরেশ্বরেরও ছিল সহজাত। সোমেশ্বর বীরেশ্বর, দেবেশ্বর, যোগেশ্বর প্রভৃতি সকলের মত সুরেশ্বরও নারীঘটিত অপরাধে অপরাধী। ঘরে সতীসাধ্বী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এ'রা অন্য নারীর প্রতি আসক্ত ছিলেন— এবং জমিদারশ্রেণীর মত রায়বংশেরও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই নারী ও মদ্য পানাসক্তি। সোমেশ্বরের যোগিনী মনোহরা, বীরেশ্বরের সোফিয়া বাঈজী, দেবেশ্বরের ভায়োলেট, যোগেশ্বরের চন্দ্রিকা এবং সুরেশ্বরের ছিল কুইনী। লেখকের মতে এই পাপাচার ছিল রায়বংশের রক্তের মধ্যে নিহিত।

এইভাবে কীর্তিহাটের কড়চার লেখক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় জমিদারি প্রথার বিবর্তন ও জমিদার চরিত্রের সামগ্রিক রূপায়ণ করতে পেরেছেন এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই কাহিনীর যবনিকাপাত হয়েছে সুরেশ্বরের লোকান্তরের সঙ্গে। ১৯৫৭ সাল। সুরেশ্বরের জমিদারি সৎকার্যে দানের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছে। তার পুত্র মানবেশ্বর এখন সাধারণ মানুষরূপেই পরিচিত হবে—আর জমিদাররূপে নয়। জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের দরুন সুরেশ্বরের মনে প্রাথমিকভাবে বেদনাবোধ জন্মেছিল ঠিকই– কিন্তু পরমুহূর্তে সে ভেবে স্বস্তি বোধ করেছিল যে কোনও শ্রেষ্ঠ পুরুষই জমিদারবংশ থেকে উদ্ভূত হতে পারেন না—বিশেষতঃ আধুনিক যুগে এমন কোনও নজীর নেই। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী দৈবাৎ জমিদারবংশীয় হয়ে জন্মে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সাধারণ স্তর থেকেই অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব সম্ভব—এই আশা ও বিশ্বাস ছিল সুরেশ্বরের।

এইভাবেই সম্ভবতঃ লেখক জমিদারিপ্রথা বিলোপের বেদনাকে সহজেই সহিষ্ণু করে তুলেছেন। কারণ তিনি নিজেও ছিলেন জমিদার।

# প্রমথনাথ বিশী

একালের বাংলাসাহিত্যে সামন্ততন্ত্রের দ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে—কোনও কোন লেখক সামন্ততন্ত্রের সেকালের চেহারা তুলে ধরেছেন আর কেউ এঁকেছেন একালের জমিদারের রূপ।

অবশ্য সেকাল ও একাল বলতে কেবলমাত্র সেকালের সাহিত্যে সামন্ততন্ত্রের প্রতিফলন অথবা একালের সাহিত্যে তার চেহারা বোঝায় না। সেই সঙ্গে বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর যেসব রদবদল বা বিবর্তন ঘটেছে তারও রেখাচিত্র অঙ্কন বোঝায়। এই বিবর্তন একদিনে আসে নি—এসেছে কালে কালে বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে এবং আইনের প্রবর্তনে। অতএব এ বিবর্তন সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক।

বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন কবি লেখক নাট্যকার সেই ঐতিহাসিক সত্য কিভাবে এবং কতটুকু তাঁদের সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছেন—এই প্রবন্ধগ্রন্থে সেই হল আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। তবে বিভিন্ন সময়ের নানান বিক্ষিপ্ত রচনা থেকে সামন্ততন্ত্রের যে চেহারা ও তার বিবর্তনের রূপ সংগৃহীত হয়েছে—তা হয়তো সর্বত্র ধারাবাহিক বা কালানুক্রমিক নয়। কারণ একটি বিশেষ যুগে দাঁড়িয়েও সব লেখক সমকালীন বিষয় নিয়ে লেখেন নি—অতীত চারণামাত্র করেছেন। তবে যেখানে যেখানে সে চেহারা ফুটে উঠেছে যদিও তা প্রায়ই আংশিক তথাপি এই গ্রন্থে তা এমনভাবে সঙ্কলন করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে তার মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পায়। আলোচনার দিক থেকে অবশ্যই ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে কারণ লেখকদের রচনা তালিকা যথাসাধ্য কালানুসারে সাজানো হয়েছে।

তবে এ কথা ঠিক একদিন বাংলাদেশের জমিদারশ্রেণী, বাঙালী সমাজজীবনের কেন্দ্রস্থল ছিলেন—তাঁরাই ছিলেন গ্রামীণ জীবনের মাথা, গ্রামে তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অবিসংবাদিত ছিল—এক কথায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। তাঁদের দানশীলতা এবং শোষণ দুই-ই ছিল বিপুল। তাঁদের দাক্ষিণ্যে যেমন জলাশয়, পথঘাট, দেবালয়, দেউল, বিদ্যায়তন গড়ে উঠত, তাঁদের দোল দুর্গোৎসব বারমাসের তের পার্বণ গ্রামবাংলার বিশেষ সম্পদ ছিল, অপরদিকে তাঁদের শোষণে কত মানুষের যে ভিটামাটি উচ্ছেদ হত তারও সংখ্যা নেই।

আবার জমিদারের অন্তঃপুরের বিলাসবহুল উচ্ছৃঙ্খলতা কিভাবে দাম্পত্য-জীবনে ফাটল ধরাত—অথবা ঐশ্বর্যবিলাসের কারণে স্খলিত চরিত্র জমিদারপুত্রের লাম্পট্য, কিংবা অহমিকা বোধে দুই জমিদারের ক্ষমতার লড়াই যে তখনকার নিত্যকার বিষয় ছিল এইসব গল্পে সেইসব সত্যেরই ইঙ্গিত।

বাংলাসাহিত্যের লেখকেরা সামন্তদের এই চারিত্রিক ও পারিবারিক দিকটির প্রতি কমবেশী সকলেই আলোকপাত করতে পেরেছেন। ফলে সব গল্প উপন্যাসের জমিদারদের চরিত্র ও অন্তঃপুরের চেহারায় মোটামুটি একটা সাদৃশ্য রয়ে গেছে। জমিদারদের প্রাসাদবাড়ীর বর্ণনা প্রায় প্রথাসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলামের সমালোচনা করতে গিয়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী অনেকটা এই কথাই বলেছেন—

"জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনের সঙ্গে বড়বাড়ীর চেহারায় অনেকটা মিল পেয়েছিলুম। সেকালের বনেদী বড় মানুষের সব বাড়ীই বোধ হয় মোটামুটি এক ছাঁচে ঢালা ছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর বর্ণনা থেকে শুরু করে তারাশঙ্করের জমিদার বাটির বর্ণনা একই ধাঁচের। "রায়বাড়ী গল্পে" জমিদার বাটীর বিশদ বর্ণনা আছে। তার চেয়ে আরও পরিস্ফুট বর্ণনা "জলসাঘরে"। প্রথমটিতে ক্ষমতাসীন জমিদারের জাঁকজমকপূর্ণ সর্বদা ব্যবহৃত প্রাসাদের উজ্জ্বল রূপ আর 'জলসাঘরে' স্মৃতি ভারাক্রান্ত অতীতের সাক্ষীর মত কঙ্কালসার বিরাট রাজবাড়ী। দীর্ঘ দুই বছর পরে বিশ্বম্ভর রায় উপর থেকে নীচে নেমে আসছেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে জমিদার প্রাসাদের একটি সামগ্রিক রূপ যা অতীতে একদিন ধনজন বিলাস প্রাচুর্যে সরগরম ছিল তা একটু একটু করে পাঠকের সামনে তিনি মেলে ধরেছেন। প্রাসাদের প্রতিটি অলিন্দ, প্রতিটি স্তম্ভ, প্রতিটি মর্মর মূর্তি, প্রতিটি কক্ষ, তার তোষাখানা খাজাঞ্চিখানা কাছারিঘর, তার আস্তাবল তার দেউড়ি তার বিভিন্ন মহল যেন কিছুক্ষণের জন্য অতীতের প্রতিধ্বনিময় হয়ে উঠেছে—বিশ্বম্ভর রায়ের স্মৃতি রোমন্থনে। বাদুড়, চামচিকা, ধূলিমলিন জাজিম, ফরাস তাকিয়া ও তার পুরানো পচা গন্ধে কিংবা স্বল্পোজ্জ্বল ঝাড়লণ্ঠনের অস্পষ্টতায় পুরানো দিনের ধূসর মহিমা তাই জলসাঘরের বাঈজী যে বলেছিল—এ ঘরে সে আলো (মহিম গাঙ্গুলীর প্রস্তাবিত পেট্রোম্যাক্স)—মানায় কি? কথাটি নিছক মর্মান্তিক সত্য। গণদেবতায়, একদা জমিদার চৌধুরীদের বাড়ীর বর্ণনাও প্রায় অনুরূপ। চৌধুরীদের মজাদীঘির পাড়ে বসে দেবুর মনেও ঠিক অনুরূপ ভাব সৃষ্টি হয়।

তারাশঙ্করের পর জমিদার সম্পর্কিত বিশাল বর্ণনা যে গ্রন্থটিতে পাওয়া যায় তার নাম জোড়াদীঘির উদয়াস্ত। রচয়িতা প্রমথনাথ বিশী।

জোড়াদীঘির উদয়াস্ত এক জমিদার বংশের উত্থানপতনের কাহিনী। যদিও এই চৌধুরী বংশকে বরেন্দ্রভূমের বিশেষ এক জোড়াদীঘির জমিদাররূপে দেখানো হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই চৌধুরীবংশ সর্বকালের জমিদার চরিত্রের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে।

জমিদার যে শোষণ করেন, অত্যাচার করেন এ কোনও বিশেষ জমিদারের চরিত্রধর্ম নয়—যেকোনও জমিদারবংশের উদ্ভবের মূলেই নিহিত রয়েছে ডাকাতি, লুণ্ঠন, শোষণ ও অত্যাচারের ইতিহাস। এক এক বংশ সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে জমিদারি কবলিত করার জন্য বিভিন্ন অসাধু উপায় অবলম্বন করতেন এবং তারাই পরে জমিদার, রাজা ইত্যাদি নামে পরিচিত হতেন। তখন অবশ্য অনেকেই দানশীলতা ও সৎকার্যের দ্বারা সেই পাপলব্ধ ধনের প্রায়শ্চিত্ত করতেন।

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের আদি ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক যে সময়কার বর্ণনা দিয়েছেন তা যথার্থ ঐতিহাসিক। উত্তরবঙ্গের এই ডাকাত জমিদারদের কাহিনীর পূর্বসূচনা অনেক আগেই বঙ্কিম করে রেখেছেন তাঁর দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে। দেবী চৌধুরাণী ওরফে প্রফুল্লর শ্বশুর হরবল্লভ রায় যখন দেবী চৌধুরাণীর নাম শুনলেন তিনি ভীত হয়েছিলেন। এই ডাকাতের দলকে ধরার জন্য ইংরেজ সিপাহীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গে অর্থাৎ দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেবী চৌধুরাণী নামটিকে এবং তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রংপুর জেলার Statistical Account-এর উল্লেখ করে লেখেন—"খাঁটি বাঙালীরাও ডাকাতি করিত। চলনবিলের ধারে একটি গ্রামের এক বিখ্যাত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশের পূর্বপুরুষেরা নৌকাযোগে ডাকাতি করিতে করিতে যে নিজের নূতন জামাইকে হত্যা করেন এবং তাহার অনুতাপে ঐ পাপ ব্যবসা ছাড়িয়া দেন, তাহার কথা রাজসাহী পাবনা জেলায় লোকপ্রসিদ্ধ।"

প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ও জোড়াদীঘির উদয়াস্তের প্রথমভাগে চলনবিলের সেই মর্মান্তিক ডাকাতির কাহিনীর উল্লেখ করেছেন এবং সেই ব্রাহ্মণবংশই হল তাঁর বর্ণিত বিষয় জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার। সম্ভবতঃ রংপুর জেলার Statistical Account এর ওপর বঙ্কিমের মত তিনিও কিছুটা নির্ভর করেছেন কারণ

উক্ত গ্রন্থে দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। বিবৃতিটি হল—We catch a glimpse from the Lieutenants' report of a female dacoit by name Devi Chaudhurani also in league with (Bhawani) Pathak. She lived in boats had a large force of barkandazes in her pay and committed dacoities on her own account besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title of Chaudhurani would imply that she was a Zamindar, probably a petty one else she need not have lived in boats for fear of capture.

এদিকে বরেন্দ্রভূমেরই অন্যতম জমিদার কল্পিত চরিত্র হরবল্লভ পুত্রবধূ প্রফুল্লকে বিতাড়িত করবার সময় যে বলেছিল—"ডাকাতি করিয়া খাইবি"—প্রফুল্ল চরিত্রে সেই অমূল্য উপদেশকে চৌধুরীবংশের ডাকাতির ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক ভবানী পাঠকের সূত্রে আশ্চর্য সফলভাবে গ্রথিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রে। যার ফলে কাল্পনিক চরিত্র প্রফুল্ল ডাকাতদলের নেত্রী দেবী চৌধুরাণীরূপে সুন্দর ও বিশ্বাস-যোগ্য হয়ে উঠেছে।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র দেবীরাণীর ডাকাতির কাহিনীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত কাহিনীর গতি নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু প্রমথ বিশী চৌধুরীদের ডাকাতির কাহিনীকে কিংবদন্তীরূপে উপস্থিত করেছেন তাঁর বর্ণিত বিষয় তার পরবর্তী কাহিনী।

প্রমথনাথ বিশীর বিপুলকায় উপন্যাস জোড়াদীঘির উদয়াস্ত তিনটি ভাগে লেখা। প্রথম ভাগ জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, দ্বিতীয় ভাগ চলনবিল, তৃতীয় ভাগ অশ্বত্থের অভিশাপ।

জোড়াদীঘির চৌধুরীবংশের উদ্ভব ও সমৃদ্ধির ইতিহাসের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে প্রমথ বিশী লিখেছেন—

"আধুনিক জমিদারদের অধিকাংশের গোড়াপত্তন মুসলমান রাজত্বের শেষে ও কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভের অরাজকতার গোধূলিলগ্নে। সে সময় এদের পূর্ব-পুরুষেরা কেহ চুরি করিয়াছে, কেহ ডাকাতি করিয়াছে, কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, কেহ কৃতঘ্নতা করিয়াছে—সকলেই নিরীহ প্রতিবেশীকে জোর করিয়া ঠেলিয়া কোণঠাসা করিয়া তার সর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছে। সাংসারিক উন্নতির মইখানার নীচের কয়েকটা ধাপ জঘন্য পঙ্কিল। একদিন সকলকেই সেখানে বিচরণ করিতে হইয়াছে। তারপর উঁচুতে উঠিয়া হাত পা ধুইয়া সকলে

সম্ভ্রান্ত হইয়াছেন। তখন সকলে মিলিয়া একযোগে সেই কলঙ্কময় প্রাচীন দলিলখানাকে সাংসারিক রাজসূয় যজ্ঞে আহুতি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।...... আমার কাহিনীর নায়ক পরিবারের ইতিহাস বাংলার সমস্ত জমিদারের ইতিহাসস্বরূপ।"

এই প্রসঙ্গে ১৮৭২ সালের রচনা রেভাঃ লালবিহারী দের লেখা ইংরেজী ভাষায় Bengal peasant life......নামক গ্রন্থটির উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী প্রস্তাবিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস প্রতিযোগিতায় লালবিহারী দে মহাশয় ঐ গ্রন্থটি লিখে পুরস্কৃত হন। গ্রন্থটি যদিও ইংরেজীতে লিখিত এবং গোবিন্দ সামন্ত নামে বিশেষ এক রায়তের জীবন কাহিনী তথাপি তাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন বাংলাদেশের কৃষিজীবীদের জীবন ও পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা, জমিদার মহাজন প্রভৃতি শ্রেণী কৃষকদের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক এবং গ্রামবাংলার সমাজচিত্র তারই বাস্তবধর্মী চিত্র গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। 'মহাজন', 'জমিদারের সম্মুখে' (Before the Zamindar) ও 'কাঞ্চনপুরের জমিদার' (Zamindar of Kanchanpur) এই অধ্যায়গুলিতে অত্যাচারী জমিদারের চরিত্রচিত্রণে লালবিহারী দে যে স্পষ্টতা ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। কারণ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জীকে উৎসর্গ করলেও জমিদারের স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা ভীরুতা প্রকাশ করেন নি। গোবিন্দ সামন্তর জীবনে কাঞ্চনপুরের জমিদার জয়চাঁদ রায় চৌধুরীর প্রজাপীড়নের অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে অবশ্য শেষে তিনি মন্তব্য রেখেছেন—"I beg the reader not to run away with the idea that all Zamindars of Bengal are like Jayachand Roy Chaudhuri of Kanchanpur. Amongst landholders as amongst every class of men there are black sheep as well as white."

তিনি আরও কৈফিয়ৎ দিয়ে বলেছেন—"Before this story is wound-up I hope to present to the reader the picture of a just, humane and philanthropic Zamindar—the father of his people.

But the lines of our hero had fallen on unpleasant places, and it was his fate—so Govinda Samanta expressed himself—to have his homestead in the Zamindari of a man who was a Bengal tiger in human shape."

এই জয়চাঁদ, বর্ধমানের মহারাজাদের পত্তনিদার থেকে ক্ষমতাবলে কেমনভাবে

কাঞ্চনপুরের জমিদাররূপে খ্যাত হলেন তার বর্ণনা দিয়ে শেষে লেখক তাঁর অত্যাচার ও প্রজাপীড়নের নজির তুলে ধরে বলেছেন—

"And many were the raiyats who were ruined by his oppression. By forgery, by Chicanery, by all sorts of fraud—for Jaychand stuck at nothing—he deprived many a poor man of his lakhraj, and though by religion a Hindu, he did not hesitate to rob many a poor Brhahmanah of his Brahmotra. He was the object of universal dread"

গোবিন্দ সামন্তর মা সুন্দরীর মুখ দিয়ে এই স্বরূপ আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রজাদের চোখে জমিদার একটি ভীতির পাত্র। তার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা এক মারাত্মক অপরাধ। কারণ তারা সবকিছুই করতে পারে "The Zamindar can ruin us, can seize the crop in the field on pretence of arrears of rent, can carry away our cattle, can sell our houses, can imprison us, can kill us.

অতএব যতই অন্যায় হোক জমিদারের চাহিদা প্রজা মেটাতে বাধ্য। খাজনা দেব না—এ কথা বলা তার সাজে না। বললে বিপদ ঘটে। জমিদার আবার একা নন। ঘিরে থাকে মোসাহেব গোমস্তা প্রভৃতি। মহাজনশ্রেণী চড়াসুদে ধার দেয় ঠিকই কিন্তু সময়ে তারাই জমিদারের অত্যাচার থেকে প্রজাদের বাঁচাতে পারে ঋণ দিয়ে। গোবিন্দের বেলায় সে কথা লেখক লিখছেন যে "সব মহাজনই খারাপ হয় না—অন্ততঃ জমিদারের চেয়ে মহাজন ভাল।"

অবশ্য সেই সঙ্গে লালবিহারী দে এ কথাও বলেছেন সব জমিদারই অত্যাচারী ছিল না। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি প্রমাণও দিয়েছেন। তাঁর মতে বর্ধমান জেলার দুর্গানগরের জমিদার নবকৃষ্ণ ব্যানার্জী এর ব্যতিক্রম ছিলেন। নবকৃষ্ণের পিতা ছিলেন অশিক্ষিত ও প্রাচীনপন্থী সেইজন্য অন্য সাধারণ জমিদারের মত তিনিও প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না বা নীলকরদের অত্যাচার প্রতিহত করার কোনও চেষ্টা করেন নি।

শিক্ষাদীক্ষা যে জমিদারি চরিত্রে অনেকটা সহায়ক হয়েছিল নবকৃষ্ণ তার প্রমাণ। তাঁকে তাঁর প্রজারা রামের সঙ্গে তুলনা করত। নবকৃষ্ণ ইংরাজী শিক্ষালাভ করে কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন এবং অত্যাচারী জমিদারদের পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে প্রচার করতে থাকেন। তিনি

অত্যাচারীদের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, এবং নিজের জমিদারি এলাকাতে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে আবওয়াব সেলামী প্রভৃতি অন্যায়ভাবে আদায়কে বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। তাঁর সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—

"Navakrishna was, it thus appears, one of those few Zamindars who knew duties attached to their station, who were actuated by public spirit, Who were inspired by liberal and patriotic sentiments, who had sympathy with the downtrodd n raiyots and who were honourable in all their actions. The number of such Zamindars was very few in those days."

নীলকর অত্যাচারের সময় তিনি প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অথচ বহু জমিদার সে সময় প্রজাদের নীলচাষে নানাভাবে বাধ্য করেন।

লালবিহারী দের 'গোবিন্দ সামন্ত' বা 'Bengal peasant life' গ্রন্থটি যদিও ইংরেজী ভাষায় লিখিত কিন্তু জমিদারের অত্যাচারী চেহারার যে স্বরূপ শতবর্ষ আগে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, বাঙালীর লেখা বলেই এই প্রসঙ্গে তা আলোচিত হল।

"জোড়াদীঘির উদয়াস্ত"ও সেই জমিদারি চেহারার বিস্তৃত প্রকাশ। এখানে জমিদারের উত্থানপতন, বিলাস-ব্যসন, হিংস্রতা, স্বার্থপরতা, আত্মকলহ, প্রচণ্ড দম্ভ, দুই জমিদারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা—বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে, সেই এক-একটি ইন্দ্রপতনের দীর্ঘশ্বাসও এই কাহিনীর পরিমণ্ডলকে ভারাতুর করে তুলেছে।

জোড়াদীঘির চৌধুরীরা কবে থেকে ডাকাতির ব্যবসা ত্যাগ করল তার প্রচলিত একটি কাহিনী লেখক বর্ণনা করেছেন—"সে এক বিরাট ব্যক্তিগত আঘাত। শোনা যায় বজরায় পিতার হাতে মেয়ে জামাইয়ের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পরে চৌধুরীরা ঐ ব্যবসা ছাড়েন। কিন্তু এর পর ডাকাতবৃত্তি ছেড়ে যখন তারা জমিদারিতে মন দিল তখন সেই দুঃসাহসী অত্যাচারী মনোবৃত্তি গঠনমূলক কাজে আত্মপ্রকাশ করল।"

সমৃদ্ধশালী নগর পত্তন, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার, পরিখা, দুর্গ, সৈন্য প্রভৃতি নগর রক্ষার সুরক্ষিত ব্যবস্থা, বিরাট বিরাট প্রাসাদ সর্বোপরি বর্গীর উৎপাতের সময় মুর্শিদাবাদের নবাবের সঙ্গে মিতালী বশতঃ নবাবকে নাটোর দুর্গে আশ্রয় দেন।

১। আবওয়াব—রাজস্ব ব্যতীত রাজা বা জমিদার গৃহীত বিবিধ কর। অতিরিক্ত কর।

এর পর বড়ল নদীতে জিনিসপত্র বোঝাই নৌকা চৌধুরীদের ভয়ে চলতে পারত না—চৌধুরীরা ব্যবসায়ী নৌকা আক্রমণ করে জিনিসপত্র কেড়ে নিত। আর মাঝি-মাল্লাদের দিয়ে কাজ করিয়ে বেগারের দালান তৈরী করত। সেই দালান আজও অক্ষত থেকে সেকালের জমিদারের অত্যাচারের সাক্ষীরূপে বিরাজমান।

নাটোরের আদিপুরুষের ইতিবৃত্ত প্রায় চতুর্দশ থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত এক-টানাভাবে বলে গেছেন লেখক। এই নাটোরেরই এককালীন দেওয়ান দয়ারাম রায় ভূষণার দুর্দান্ত সীতারামকে পরাজিত করেছিলেন। জমিদার সীতারামের কাহিনী নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম' উপন্যাস রচনা করেছেন।

নাটোরের জমিদারির ইতিহাস সম্পর্কে লেখক যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে অনুমান করা যায় যে যাঁরা একদিন ঐশ্বর্য প্রতিপত্তিতে ও ভূখণ্ড বিস্তারে রাজা নামে পরিগণিত হতেন—তাঁরা কালক্রমে ক্ষমতা ও সম্পত্তি হারিয়ে ক্ষুদ্র ভূস্বামী বা জমিদারে পরিণত হন।

সামান্য মহাজন বা পত্তানদার থেকে উন্নতির দ্বারাও জমিদার হতে পারে অথবা বৃহৎ ভূম্যধিপতি থেকেও অবনতির ফলে জমিদার তৈরী হতে পারে। অতএব 'জমিদার' শব্দটি বা জমিদারশ্রেণীর যে কোনও সুস্পষ্ট বা স্থায়ী সংজ্ঞা নেই, এটি একটি পরিবর্তনশীল বিষয়—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজা বাদশার আমল থেকেই এর রূপ বদল হয়ে আসছে, সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। জমিদার কথাটিও যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ বহন করত তার অধিকারের সীমাও তেমনি বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হতো। বিভিন্ন যুগের ইতিহাস থেকে সে কথা অনায়াসে অনুমান করা যায়। তবে ইংরেজ আমলেই প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারের অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট হল এবং একটি স্থায়ী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে পর্যন্ত জমিদারের যে চেহারা সাহিত্যে তার প্রতি-ফলনকেই আমরা সামন্ততন্ত্রের 'সেকাল' মনে করি আর তার পরবর্তীকাল থেকে জমিদারি বিলোপ পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রের যে স্বরূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত তাকেই তার 'একাল' বলে চিহ্নিত করা যায়।

সেই ব্যাপারে হয়তো বিভিন্ন যুগের লেখক বা তাঁদের রচনাকৃতির কালানু-ক্রমিক পারম্পর্য নাও থাকতে পারে অর্থাৎ অনুজ লেখকও সেকালের রূপ ফোটাতে পারেন—আর অগ্রজও পারেন সামন্ততন্ত্রের একালের ক্ষয়িষ্ণুতার চেহারা ফোটাতে। আবার কেউ হয়তো ঘটালেন সেকাল ও একালের সমন্বয়—একই গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের বংশাবলীর বিবরণের মাধ্যমে।

প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁর 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসটিকে প্রায় ইতিহাসভিত্তিক বলেই বর্ণনা করেছেন। বিশেষ কোনও চৌধুরীবংশের উদয়াস্ত বর্ণিত হলেও সে চৌধুরী পরিবার চিরকালের জমিদারি বংশের প্রতীক হয়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা যায় প্রমথ বিশী যে কালের ছবি এতে এঁকেছেন তা একাল-সেকালকে একসঙ্গে গ্রথিত করে রয়েছে। তাঁরই ভাষায় বলা যেতে পারে—"প্রায় দুশ বছরের পরিবেশে রচিত এই কাহিনীতে পলাশীর যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত দুস্তর কালকে স্পর্শ করবার চেষ্টা হয়েছে।"

কোম্পানীর শাসনে যে জমিদারগণের উদয়—দেশ ভাগাভাগিতে তাদেরই অস্ত। তিনি আরও বলেছেন—"চৌধুরী পরিবারের জমিদার সেই দেড়শ বছর ধরে একই ছাঁচে জীবনযাপন করে এসেছে। মৃত্যু এসে বাম হাতে এক কর্তাকে সরিয়ে দিয়ে ডান হাতে অপর কর্তাকে গদিতে বসিয়ে দিয়েছে, সর্বজয়ী মৃত্যুও এখানে যেন অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হয়েছে।"

তবে সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে যে একটা চিরন্তন দিক আছে তা হল নৈতিক অধঃপতন ও অত্যাচারের দিক।

সে সম্পর্কেও প্রমথ বিশী বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত নাটোরের বর্ণনায় বলেছেন—

"আজ সে নাটোর নাই। কিন্তু নাটোরের দোষ কি। বোধ করি সে বাংলা-দেশও নাই। নাটোরের রাজারা ম্লান। পুরাতন পরিখাত্রয়ের মধ্যে একটা মাত্র আছে—তাহার প্রশ্বসিত বিষ বাষ্প ঘরে ঘরে ব্যাধি বিস্তার করিয়া ফেরে....ব্যাধি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, কদাচার, অত্যাচারে নাটোরের বায়ুমণ্ডল ম্লান।"

সেই নাটোর থেকে ছয় ক্রোশ পূর্বে জোড়াদীঘি গ্রাম।

চৌধুরী বাড়ীর বর্ণনা শুরুতেই জমিদার কাছারীর কাজীর বিচারের একটা দৃশ্য দেখানো হয়েছে। জমিদারের কাছারী কেবল জমিদারি কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নয়—সেখানে ফৌজদারী ব্যাপারও চলে। চোরের দণ্ডও সেখানে নির্ধারিত হয় কর্মচারীদের খুশী মত। চুরির প্রমাণ দেখতে যাওয়া এ ক্ষেত্রে বাতুলতা—প্রমাণ দর্শানোর প্রসঙ্গ উঠলে লেখক ভট্টাচার্যের মুখ দিয়ে যে কথা বলিয়েছিলেন তা জমিদারের শাসনব্যবস্থার একটি চমৎকার নজীর। ভট্টাচার্য বলেছেন—"প্রমাণ আবার কি! জমিদারির কাছারী শেষে কি কোম্পানীর আদালত হয়ে উঠবে না কি?"

তখন কোম্পানীর আমল। তাই কোম্পানীর আমলের দৃষ্টান্ত তুলে কথা বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন—"ন্যায়বিচারের পক্ষে প্রমাণের মত এমন গুরুতর

বাধা অল্পই আছে। শাসকের উদ্যত দণ্ডকে প্রমাণ বাঁচাইয়া প্রয়োগ করিতে হইলে রাজ্যশাসন অসম্ভব হইয়া পড়ে।"

প্রাচীন বাঙালী জমিদাররা যে কি বিশাল ব্যক্তিত্বশালী শক্তিমান কূটনীতিক ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, তাঁদের ভয়ে সমস্ত লোক থরহরি কম্পিত ছিল, মধ্যম শরিক উদয়নারায়ণের চরিত্রে প্রমথনাথ তা প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন।

এই উদয়নারায়ণের ও তস্য পৌত্র দর্পনারায়ণের জীবন কাহিনী বর্ণনাই কেবল লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—সেই সঙ্গে চৌধুরীবংশের উত্থানপতনও দেখানো হয়েছে।

উদয়নারায়ণের সময় জমিদারির বৃদ্ধি দর্পনারায়ণের সময় ক্ষয়।

চৌধুরী বাড়ীর লাঠিয়াল সর্দার, দোলদুর্গোৎসবের ঘটনা, সুদীর্ঘ খাদ্যতালিকার কথা সেকালে জনশ্রুতির মত ছিল।

এর পরবর্তীকালে অর্থাৎ জমিদার দর্পনারায়ণের আমল সম্পর্কে লেখক যে ধারণা দিয়েছেন—তা পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকাল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড-কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে অর্থাৎ জমিদারের সঙ্গে রাজস্ব সম্পর্কে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

জমিদারদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হল। প্রতি জেলায় জজ কালেক্টার প্রভৃতি পৃথক ভাবে নিযুক্ত হল। ভারতের শাসনকর্তা হিসাবে একে-একে বিভিন্ন বড়লাটের আগমন ঘটল।

লেখক লিখছেন—"বড়লাট ওয়েলেসলির রাজনীতির বেড়াজালে দেশীয় সামন্তরাজ্যের রুই কাৎলা একে-একে ধরা পড়িতে লাগিল।"

তিনি আরও লিখেছেন—"এই সময়ে রাজা জমিদারদের বিচারশক্তি শাসন-ক্ষমতা অপহৃত হল—প্রজার পক্ষে গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্য গতি রহিল না। (অবশ্য এর পরেও অনেক জমিদার শাসন ও বিচার ক্ষমতা ব্যবহার করিত, এখনও করে।)"

উদয়নারায়ণের জমিদারির মধ্যে রক্তদহের জমিদারিটা ছিল যেন একটা উদ্ধৃত প্রক্ষেপের মত। তাই রক্তদহেয় অভিভাবকহীনা জমিদার ইন্দ্রানীর সঙ্গে পৌত্র দর্পনারায়ণের বিবাহ দিয়ে সেই জমিদারি অধিকৃত করার ইচ্ছা উদয়নারায়ণের জেগে উঠেছিল কিন্তু সে ইচ্ছায় বাদ সাধল নিয়তি। দর্পনারায়ণের বিবাহ হল এক অজ্ঞাত কুলশীলা কন্যার সঙ্গে, সেও এক দৈবচক্র।

ফলে যে জমিদারির উপর অনায়াস আধিপত্য করা যেত সে জমিদারির সঙ্গে শত্রু সম্পর্ক গড়ে উঠল। রক্তদহের রক্তকমল ইন্দ্রানী প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইয়ে নামল জমিদার দর্পনারায়ণের সঙ্গে। উদ্দেশ্য অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া। এ

কেবল যে ইন্দ্রানী দর্পনারায়ণের সংঘাত তা নয় এ জমিদারে জমিদারে চিরকালীন সংঘাত।

আর অন্যদিকে বনমালাকে বিবাহ করার প্রায়শ্চিত্ত দর্পনারায়ণকে করতে হয়েছে জমিদারিচ্যুত হয়ে।

রক্তদহের জমিদার ইন্দ্রানী স্বেচ্ছায় পরন্তপ রায়ের মত লম্পট জমিদারের কাছে আত্মসমর্পণ করল, সে দর্পনারায়ণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তো বটেই, সেই সঙ্গে নিজ জমিদারি দম্ভ প্রকাশ করার জন্যও।

দর্পনারায়ণ বনমালাকে নিয়ে বজরায় বিলের ওপর দিনাতিপাত করেন। ক্রমে টাকা পয়সা ফুরিয়ে এলে আলিবর্দি সাহস দেয়, বলে—"ভাবনা কি জমিদারি তো আছে।" তখনকার দিনে জমিদারের আয় নিতান্ত কম ছিল না। বিশেষতঃ চৌধুরীদের আমলে চরবুইমারী তাঁদের জমিদারীর অন্তর্গত একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে পরিণত হয়।

তখন সদাশয় জমিদারদের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক ভালই ছিল বিশেষতঃ শক্তিমান জমিদারকে সকলে একই সঙ্গে ভয় ও ভক্তি করত। বিশেষতঃ জমিদারদের লাঠির জোরের কথা তাদের মনে আছে। এই চরবুইমারী গ্রামখানি দর্পনারায়ণের পিতা কন্দর্পনারায়ণ, লাঠির জোরে দখল করেছিলেন। অতএব তাঁর পুত্র সেখানে গিয়েছে কাজেই প্রজাদের খুশী হবার কথা। সেই জমিদার-প্রজার সাক্ষাৎ সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী এক বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

"সেকালে জমিদার গ্রামে আসিলে প্রজারা খুশী হইত, গ্রামের প্রধানরা প্রচুর পরিমাণে নজর লইয়া বজরায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত লোক ঘাটে আসিয়া ভিড় করিল। সকলেই সাধ্যমত কিছু ভেট আনিয়াছে।"

এই ভেটেরও বিস্তৃত বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। প্রজারা দর্পনারায়ণকে তাদের জমিদাররূপে চরবুইমারীতেই বসবাস করতে অনুরোধ করে। দর্পনারায়ণ পিতামহ উদয়নারায়ণের ভয়ে প্রথমটা ইতস্ততঃ করতে থাকে।

বদর গ্রামের তহশীলদার, তহশীলদারই জমিদারকে প্রজাদের তরফে খাজনা দেয়।

বদর পৌষ কিস্তির খাজনা এবার দর্পনারায়ণকে দিয়ে তার হিসাব বুড়ো জমিদারের কাছারীতে দিয়ে আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।

গ্রামের মধ্যে জমিদারের আগমন যে প্রজাদের জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে ওঠে তারই দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখক বলেছেন—"বিকালের দিকে প্রজারা গ্রামে ফিরিয়া

গেল। তারা জমিদারকে রাখিতে পারিল না বটে, কিন্তু আজকার দিনটা তাদের একটা স্মরণীয় তারিখ হইয়া রহিল।"

এই ঘটনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারি দেখা উপলক্ষে পদ্মা-নদীতে বজরায় বাসের যেন কিছুটা সাদৃশ্য দেখা দেয়। পদ্মানদীতে থাকাকালীন জমিদারি দেখা উপলক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের তথা সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। সাধারণতঃ সহৃদয় জমিদাররাই মাঝে-মাঝে গ্রামে যেতেন প্রজাদের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতে। অনেকে অবশ্য যেতেন অর্থ আদায়ের জন্য।

তবে উদ্দেশ্য যাই হোক জমিদারিতে প্রজাদের মাঝখানে স্বয়ং জমিদারের আগমন কেবলমাত্র প্রজাদের জীবনেরই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না—জমিদারদের সঙ্গে জমিদারির এই সংযোগসূত্র রক্ষা অপরিহার্য ছিল—এবং সেই যোগসূত্র ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাবার ফলেই জমিদারি প্রথার ক্রমশঃ বিলোপ সূচিত হতে থাকে। আসল জমিদারের জায়গায় গোমস্তা মহাজন পত্তনিদারদের প্রাধান্য দেখা দেয়। এবং এরাই জমিদার ও প্রজার মাধ্যম মধ্যস্বত্বভোগী স্তরের সৃষ্টি করে। জমিদারিপ্রথার প্রহসন সেইখানেই—"মাটিতে যাদের পড়ে না চরণ তারে মহাজন কয়।"

"জোড়াদীঘির উদয়াস্তের" এই অংশে জমিদারেব পদার্পণ নিয়ে প্রজাদের এত আনন্দ ও উৎসবের কারণ হল জমিদারকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার আনন্দ।

এই সুযোগে প্রজাদের সুখদুঃখের সঙ্গে যেমন জমিদার পরিচিত হন—সেই সঙ্গে জমিদারদের ভালমন্দের প্রতিও প্রজারা মনোযোগী হয়। নিঃসম্বল জমিদার-নন্দন দর্পনারায়ণকে প্রজারাই সেদিন নানাভাবে সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জমিদার-প্রজায় বিরোধের সম্পর্কও যেমন সত্য ছিল—আবার জমিদারের অনুগত প্রজারও সে যুগে অভাব ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সেই একই মন্তব্য করতে হয় যে—জমিদার মাত্রেই অসৎ ও অত্যাচারী নয়. অন্ততঃ জমিদারি স্থাপনের মূলে যত অত্যাচার ও কলঙ্কের ইতিহাস থাকুক না কেন—ব্যক্তিগতভাবে বহু জমিদার সৎকার্য এবং প্রজানুরঞ্জকতার দ্বারা সে কলঙ্ক অপনোদন করে প্রজাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হতে পেরেছেন।

জোড়াদীঘির উদয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, রক্তদহের ইন্দ্রাণী আদর্শ জমিদারের প্রতিভূ। অপরদিকে পরন্তপ রায়, বেণীমাধব রায় প্রভৃতি অত্যাচারী দুশ্চরিত্র জমিদারের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছে।

জমিদারশ্রেণীর এই বিপরীত ধর্মী চরিত্র প্রায় সকল উপন্যাসেই পাশাপাশি বিদ্যমান থেকে সামন্ত চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপে ফটিয়ে তুলতে পেরেছে।

বিলের জলস্রোত রুখতে গিয়ে জমিদার দর্পনারায়ণ বানের মুখে ভেসে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জোড়াদীঘির জমিদারবংশের ভাঙন ধরল। এর পরের ইতিহাস 'অশ্বত্থের অভিশাপ।' সমগ্র জমিদারি দশানি ছ-আনিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ছ-আনির জমিদার হলেন নিত্য নারায়ণ আর দশানির জমিদার কীর্তিনারায়ণ।

অশ্বত্থের অভিশাপ অংশে বহুশরিক বিভক্ত গ্রামত্যাগী জমিদারদের জমিদারির রূপ ফুটানো হয়েছে, একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের কর্তনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ইতিমধ্যে কালচক্র ঘুরে গেছে। জমিদারদের আর সে প্রভাব বা প্রতাপ নেই। তা ছাড়া শহরমুখী হবার ফলে তাঁরা গ্রামের প্রাত উদাসীন হয়ে পড়েছেন। গ্রামের মধ্যে তাঁদের কর্মচারীরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে জমিদারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন।

জমিদার টাকা চেয়ে পাঠালে তাঁরা সোজাসুজি জানিয়ে দেন দেশের অবস্থা খারাপ, অতএব ফসল ভাল হয়নি। জমিদাররা গ্রামে না আসার ফলেই মধ্যস্বত্বরাই প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন।

জমিদার হঠাৎ আসবেন এই সংবাদ পৌঁছালে জমারনাবিশ, শুমার নবিশ প্রভৃতি আমলাদের মধ্যে কি হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং কিরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি হয় তার একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। মিথ্যা সংবাদ দিয়ে ম্যালেরিয়ার ভয় দেখিয়ে জমিদারবাবুকে গ্রামে আসা থেকে নিরস্ত করার জন্য। কর্মচারীদের পত্র রচনার হাস্যকর প্রয়াস একটা বাস্তব—সত্যকেই প্রকাশ করে। নিজ স্বার্থে আঘাত লাগার ভয়েই এইসব ষড়যন্ত্র। এরাই প্রজা ও জমিদারের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রধান অন্তরায় হয়ে থাকত। কিন্তু প্রজারা যে নিজেদের মধ্যে জমিদারকে পেলে খুশী হত এবং তাদের ভালবাসাও ছিল তার প্রতি এমন কি পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্র কর্মচারীরাও যে জমিদারকে পেয়ে খুশী হত তার পরিচয় লেখক দিয়েছেন নবীননারায়ণের গ্রামে পদার্পণের ঘটনা থেকে। তার কারণ স্বয়ং জমিদারের কাছে খাজনা মাপ হত। বাকী পাওনা ও বকশিশও লাভ করত।

তবে সব জমিদারই নবীননারায়ণের মত হয় না। গ্রামের জমিদার সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত কমই দেখা যায়। গ্রাম ছেড়ে যারা শহরে যেত—তারাও আবার সঙ্গ দোষে ও বিলাসব্যসনে উচ্ছৃঙ্খল ও অধঃপতিত হত। সেই সম্পর্কে প্রমথ বিশী লিখেছেন—

"গ্রামে থাকিলে, লেখাপড়া না শিখিয়া জাল জুয়াচুরিতে পারদর্শী হইয়া অত্যাচারী, দুর্দান্ত জমিদার হইয়া উঠিত আর শহরে গিয়া পড়িলে নৈশ

অত্যাচারের ফলে অল্পদিনেই লিভার পাকিয়া চৌত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাহাকে সাধনোচিতধামে যাইতে হইত।" আসল কথা শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষার আলোক যাঁরা পেয়েছেন—তাঁরা গ্রামে বা শহরে যেখানেই থাকুক না কেন—চিরন্তন জমিদারবংশের প্রভাব থেকে তাঁরা সহজেই নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেন। নবীননারায়ণ সেই চিরন্তন জমিদার বংশের একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তার লেখাপড়ার খেয়াল সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—

"জোড়াদীঘির জমিদারবংশের ঘাড়ে কালে কালে অনেক প্রকার ভূত ভর করিয়াছে—ওই একটি আধুনিক ব্যতীত। জোড়াদীঘির জমিদারদের মধ্যে সেই প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিল এবং শত্রু মিত্রকে চমৎকৃত করিয়া সগৌরবে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।"

কিন্তু শহরে না থাকলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আবার শহরে বাস করায় অভ্যস্ত হলে গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশঃ শিথিল হয় এবং আন্তরিকতাও হ্রাস পায়।

সেই সঙ্গে জমিদারের অনুপস্থিতির সুযোগে নায়েব গোমস্তরা যেমন প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, নবীননারায়ণের গ্রামে পদার্পণের ঘটনায় সেই চিত্রই বিবৃত।

ঘটনার গতি ও লক্ষ্য অবশ্য বহু পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ কাটার অভিযোগের প্রতি নিবদ্ধ। কিন্তু এই গাছ কাটা উপলক্ষে বিভিন্ন চরিত্র ও জমিদারি কার্যবিধির চেহারা এক সঙ্গে ফুটে উঠেছে।

নবীননারায়ণ প্রজাদের মঙ্গলার্থেই বহু প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষটি উন্মূলিত করতে উৎসুক। গাছটির জন্য তিন বিঘা জমি অনাবাদী পড়ে আছে। তাতে প্রজা এবং জমিদার উভয়েরই ক্ষতি। শিক্ষিত জমিদার হিসাবে নবীননারায়ণ যেমন কুসংস্কারমুক্ত, অন্যদিকে তেমনি জমিদারের আয়বৃদ্ধি সম্পর্কে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত উপায় অন্বেষণে তিনি সচেষ্ট। কারণ তিনি আধুনিক যুবক বিশেষতঃ অর্থনীতির এম-এ। তিনি জানেন—"দেশের জনবৃদ্ধির তাল খাদ্যবৃদ্ধির তালকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। দেশের পক্ষে ইহা একটি গুরুতর সমস্যা।"

তাই শুধু ঐ গাছটা নয়—জমিদারির মধ্যে যত গাছ ও জঙ্গল আছে সব কেটে পরিষ্কার করে খাস পতিতগুলিকে হলযোগ্য করে প্রজার আয়ও করে দিতে হবে। এই তাঁর একমাত্র পরিকল্পনা সেই উপলক্ষেই তাঁর গ্রামে আসা।

অতএব নবীননারায়ণ এখানে কেবলমাত্র জমিদার নন—সেই সঙ্গে তিনি গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাও নিয়ে এসেছেন। জানি না হয়তো সব জমিদারের এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে এখনও গ্রামগুলি জমিদারদের দ্বারা শাসিত হতে পারত কিনা।

পতিত ও অনাবাদী জমিতে ফসল উৎপন্ন হলে প্রজার আয় বাড়বে, জমিদারের খাজনা বাড়বে, ফলে সকল পক্ষেরই মঙ্গল।

এই প্রসঙ্গে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উল্লেখ করে বলা যেতে পারে এই ব্যবস্থায় জমিদারদের যখন চাষের জমির মালিক করা হল তখন উদ্দেশ্য ছিল জমিদাররা নিজেদের জমি থেকে যত বেশি সম্ভব উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করবেন —ফলে চাষের জমি গুলির উন্নতি হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১ নং কানুনে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই আস্থা প্রকাশ করেছেন যে এর ফলে জমিদাররা "Will exert themselves in the cultivation of their lands upon the certainty that they will enjoy exclusively the fruits of their own good management and industry."

অবশ্য জমিদাররা যে এ বিষয়ে মোটেই তৎপর নন সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শেষ পর্যন্ত ১৭৮৯ সালে এই মত প্রকাশ করেন যে—"If a review of the Zamindars of Bengal were made, it would be found that very few are duly qualified for thc management of their hereditary lands and that in general they are ill educated for this task, ignorant of the common forms of business."

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থনে যেমন বহু যুক্তি দেখানো হয়েছিল, তেমনি ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পর জমিদারি উচ্ছেদ করা হল।

এই বিষয়ে ভারতের নানাস্থানে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল—ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

বর্তমান আলোচনার কিছুটা পরিপোষণের জন্য জমিদারি উচ্ছেদ ও ভূমি-সংস্কার বিষয়ক যাবতীয় পক্ষীয় ও বিপক্ষীয় মতবাদ সংকলিত করে দেখানো যায় জমিদারি উচ্ছেদের সমর্থনের দিকটাই ছিল বিশেষ শক্তিশালী। ইংরেজরা যে ব্যবস্থার প্রবর্তন করল ভারত সরকার প্রথমেই তা উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হলেন—কারণ তাঁদের ধারণা হল জমিদারি উচ্ছেদ ভিন্ন ভূমির উন্নতি সম্ভব নয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার জমিদারি উচ্ছেদের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। এই উদ্দেশ্যে আগেই কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই জমিদারিপ্রথা বিভিন্ন প্রদেশে নানাভাবে বিদ্যমান ছিল।

জমিদারি উচ্ছেদের সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি ছিল ছিল এই যে (১) জমিদাররা এক ধরনের পরগাছা এবং তারা তাদের আয়ত্তাধীন জমির উন্নতির জন্য কোনও চেষ্টাই করে নি। জমির যদি কিছু উন্নতি হয়ে থাকে সে হল জমির প্রকৃত চাষীদের চেষ্টার ফল—অথচ জমিদারের অনুমতি ছাড়া তাঁদের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। অতএব জমিদারকে সরিয়ে দিলে তবেই জমির উন্নতি, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি, এবং বিভিন্ন ভূমিসংস্কার করা সম্ভব। এই যুক্তির অনেকখানিই সত্য ছিল। যদিও কতকগুলি ব্যাপার জমিদারেরও ক্ষমতা বহির্ভূত ছিল, যেগুলি ইচ্ছা করলেই সে অতিক্রম করতে পারত না।

দ্বিতীয়তঃ এ কথা মনে করা হয় যে জমিদারি উচ্ছেদের ফলে জমির খাজনা থেকে বিভিন্ন প্রদেশের ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। কারণ এই অংশটি প্রজাদের কাছ থেকে জমিদাররা সংগ্রহ করতেন, এখন সেটা সরকারী তহবিলে জমা পড়বে। কথাটা যে যথার্থ তা উচ্ছেদের পর প্রমাণিত হয়েছে। এই বাড়তি কর থেকে ক্ষতি-পূরণ দিয়েও প্রজা ও কৃষকের উন্নতির জন্য ব্যয় করা চলে।

তৃতীয়তঃ জমিদারি উচ্ছেদ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নয় রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রয়োজনীয় ছিল। জমি যারা চাষ করে তারাই নির্বাচকমণ্ডলীর একটি বিরাট অংশ অধিকার করে আছে এবং নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য তারা জমি-দারের উপরই সমস্ত নিন্দা ও অসন্তোষের ভার চাপায় কাজেই গণতান্ত্রিক দিক থেকেও অধিকাংশেরই মতামতকে এ ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অপর দিকে জমির চাষীরা ভবিষ্যতেও কোনও রকম ভূমিসংস্কার ব্যাপারে জমিদারকে সাহায্য করবে না বলে ঠিক করা হয়েছে কারণ তাদের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এবং ভূমি চাষী ও সরকারের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপও ভূমি-সংস্কারের একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।

জমিদারি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মতামত ঃ—জমিদারি অধিকার ও উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি অবশ্যই খুব দুর্বল ছিল। এর প্রথম কথা ছিল এর ফলে বহুসংখ্যক লোক যেমন জমিদার, জিলাদার কারিণদাস প্রভৃতি এরা সব বেকার হয়ে পড়বে এবং সম্পূর্ণভাবে জমিদারি আয়ের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা খুবই দুর্গতি ভোগ করবে। অবশ্য এর বিরুদ্ধে বলা হয় যে, কোনও না কোনও পরিবর্তন হলেই কিছু না কিছু কষ্টভোগ করতে হয় বা স্থানচ্যুত হতে হয়। জমিদারদের কষ্ট হলেও উচ্ছেদের ফলে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। জমিদারদের কারিণ-দাসরা প্রাথমিকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়লেও কিছুকাল পরে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজনে তারা আবার পুনর্নিযুক্ত হতে পারে।

জমিদারদের ক্ষেত্রেও সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে এবং অনেকে আবার তাঁদের জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থাও করে নিয়েছেন।

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে অপর যুক্তি হল কৃষকেরাও একভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতীতে জমিদার কৃষকদের নানাবিধ সামাজিক ও অন্য প্রয়োজনে ধার দিত এবং কর আদায়ের ব্যাপারে জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে আদায়ের ব্যাপারে অনেক সময়ই বিচার-বিবেচনা করতেন বা সময় দিতেন। কেবলমাত্র জমিদারি উচ্ছেদের মাধ্যমে ভূমিসংস্কার সম্ভব নয় এবং জমিদারী উচ্ছেদের প্রচেষ্টা এভাবে চলতে থাকলে দেশের উপকার না হয়ে বরং তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে।

তবে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না হলেও অবনতি অন্ততঃ হয় নি। জমিদারি উচ্ছেদ না হলে ব্যাপকভাবে ভূমিসংস্কার সম্ভব হত না। এখুনি না হলেও আশা করা যায় জমির উৎপাদন এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে একদিন সারাদেশ আর্থিক দিক দিয়ে বিশেষ লাভবান হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেসব জায়গায় ছিল যেমন বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ, এবং জায়গীরদারী ব্যবস্থা যেমন রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র—এই সকল অঞ্চলে যেসব জায়গা টেম্পোরারী সেট্‌লড ছিল—সেখান থেকে সহজে জমিদারি উচ্ছেদ সম্ভবপর ছিল।

মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদের জন্যও সর্বত্র আইন প্রচলিত হল। এই উপায়ে মধ্যস্বত্বভোগীকে উচ্ছেদ করা হল। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রজারা চিরস্থায়ী এবং হস্তান্তর- যোগ্য অধিকার লাভ করল।

পতিত জমি, জঙ্গল ও আবাদী জমি মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে সরকারের পরিচালনাধীন হল।

জমিদারি উচ্ছেদের পর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ করদানের পরিবর্তে রায়তেরা জমিদারির অধিকার হল।

নির্দিষ্ট অর্থদানের বিনিময়ে অধিকারহীন প্রজারও অধিকার জন্মাবে এবং এরা সবাই হবে রাষ্ট্রের প্রজা।

ভূমিসংস্কারের পিছনে যে মূল উদ্দেশ্য ছিল তা হল (১) জমির উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। (২) সামাজিক সুবিচারের ওপর equalitarian society প্রতিষ্ঠা করা।

এই উদ্দেশ্যেই জমিদারি বিলোপ, জমিচাষী ও রাজ্যের অন্তর্বতী মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের উচ্ছেদ, জমির অধিকারের পাকাপাকি বন্দোবস্ত, প্রজার করের সীমা

বেঁধে দেওয়া এবং জমির মালিকদের দ্বারা প্রজা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।

কিন্তু জমির প্রকৃত চাষীদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা সফল হতে পারে নি। পশ্চিমবঙ্গে ২.৭ লক্ষ একর কৃষি জমি সরকার নিয়েছে এবং বর্গাদারদের দ্বারা (Share Croppers বা ভাগচাষী) কিংবা ভূমিহীন শ্রমিকদের দ্বারা বার্ষিক ভিত্তিতে চুক্তি করা হয়েছে।

ভূমিসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জমির বর্তমান অধিকারের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ অর্থাৎ প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি রাখাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত প্রজা এবং উপপ্রজা (Sub-tenant) খাস সরকারের অধীনে আনা হয়েছে। মধ্যস্বত্বভোগীরা বিলুপ্ত হয়েছে। অন্য দেশে প্রজা জমিদারের অধিকার প্রশ্নে একটা অনিশ্চয়তা থেকে গেছে। জমি থেকে প্রজা উচ্ছেদের ব্যাপারও অমীমাংসিত থেকে গেছে।

১৯৬৬ সালে ল্যাণ্ড রিফর্ম সেমিনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিয়েছে—

(১) জমিদারের ব্যক্তিগত স্বার্থে, প্রজাদের স্বার্থের প্রতি হস্তক্ষেপ থেকে প্রজাদের রক্ষা বা প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা (২) নির্দিষ্ট পরিমাণ কর ধার্য করা (৩) সরকারের প্রতি বিভিন্ন রকম দাবী জানাবার অধিকার প্রদান। (৪) প্রজাদের অধিকারের উত্তরাধিকারত্ব স্বীকার। (৫) প্রজাদের উক্ত অধিকার ত্রয়ের বিকল্প সুযোগ দান।

এ ছাড়াও শ্রেষ্ঠ চাষী হিসাবে পুরস্কার লাভের যোগ্যতা স্বীকৃত হবে অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জমির মালিক নিজে চাষ করবে বলে জমির অধিকার ফিরিয়ে নিতে পারবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় জমির আইনসঙ্গত অধিকার নিয়েই মাথা ঘামানো হয়েছে কিন্তু জমির ব্যবহার বা কৃষির যোগ্যতাকে এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে যদিও এখন ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত—অল্প সময়ে অধিকতর ফলনশীলতা (খাদ্য এবং অর্থ বিষয়ে) এবং সেই সঙ্গে প্রজাদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে একদিন যেমন জমির উন্নতির আশায় জমিদারদের পত্তন করা হয়েছিল পরে সেই উন্নতির আশা অন্তর্হিত হবার ফলেই আবার ভূমির উন্নতির জন্য জমিদারি উচ্ছেদের চেষ্টা

করা হল। ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ভূমিসংস্কার আইন থেকে শুরু করে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ভূমিসংক্রান্ত আইনের বহুরকম সংশোধন করা গেলেও এবং এ সকলের মাধ্যমে জমিদারিতে মধ্যস্বত্বপ্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হলেও প্রজাদের অবস্থার উন্নতি আজও ঘটে নি। জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের পরবর্তী অবস্থার চিত্র তারাশঙ্কর নানাভাবে এঁকেছেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সে বিষয় আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি।

প্রমথনাথ বিশী "জোড়াদীঘির উদয়াস্তে" সেই ভাঙ্গনের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। কয়েক পুরুষে জমিদারিব্যবস্থার যে রূপান্তর ঘটল তারই ক্রম ইতিহাস। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার থেকে ক্রমশঃ বহু বিভক্ত শরিকী লড়াই—পরস্পরের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ সাধনের চেষ্টা—ভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীন নবগঠিত জমিদার সম্প্রদায়—ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কে মহাকাব্যিক বিশালতা দান করেছেন।

কিন্তু এই জমিদারি লড়াই সৃষ্টিতে গ্রামের মোড়ল, মহাজনদের প্ররোচনাই যে বেশি থাকে, দশানি ছ-আনির জমিদারদের মধ্যে বিরোধের মূলে যে প্রধানতঃ তারাই, সে কথা এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ আদালতের মধ্যেকার দুর্নীতির উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাজনদের অবস্থা কিরূপ সে সম্পর্কে লেখক লিখছেন—"আয় কমিয়াছে, ব্যয় বাড়িয়াছে, অনেক খাজনা বাকি পড়িয়াছে এবং মহাজনের দেনা বেশ ভারী রকম জমিয়া উঠিয়াছে।" তার ফলস্বরূপ দেখা গেল—তাদেরই উস্কানীতে উভয় জমিদারের প্রজাদের অজান্তে তাঁদের উপর একই সঙ্গে উৎপীড়ন শুরু হল। ফলে কীর্তিনারায়ণ ও নবীননারায়ণের মধ্যে যে আপস প্রস্তাব হয়েছিল তা ভেঙ্গে গেল।

এইভাবে লেখক রাজা-জমিদারের দোষ অনেক পরিমাণে লাঘব করে দিয়েছেন —তাঁর মতে "লোকে রাজা-জমিদারকে পরপীড়ক বলে—কিন্তু ইহাদের উপরেও একটা চক্রান্ত ও চাপ বর্তমান, তাহারই গুরুতর ভার পড়িতেছে নিম্নবর্তীদের উপরে। সংসারে সকলেই পীড়িত, প্রধানতমও পীড়িত—দীনতমও পীড়িত। অনন্ত পীড়ন-চক্র সংসারে নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে। মাঝখানের একটা গ্রন্থিকে অকারণ দোষ দিয়া কি লাভ।"

পূর্বে উল্লিখিত জমিদারিপ্রথা সম্পর্কে লেখক প্রমথনাথ বিশীর একটি সুদীর্ঘ অভিমত—এই অধ্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে। জমিদারে জমিদারে—শরিকি লড়াই যে কালক্রমে প্রজাস্বার্থের সূত্র ধরে সমস্ত গ্রামের বিরোধে পরিণত হয়—তারই চিত্র এঁকেছেন তিনি "অশ্বত্থের অভিশাপ" অংশে, দশানি ছ-আনি জমিদারের বিরোধের বর্ণনা করে। এই প্রসঙ্গে জমিদার ও পল্লীবাংলার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন—"এক সময়ে গ্রামের জমিদার ছিলেন গ্রাম-

জীবনের নায়ক। সুকারণেই হোক আর কুকারণেই হোক, আর অকারণেই হোক গ্রামের লোকে জমিদারকেই অনুসরণ করিত। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলার পল্লী নদীমাতৃক ও জমিদার পিতৃক। নদী মরিয়া জমিদার ধ্বংস হইয়া বাংলার পল্লী এখন অনাথ।"

কিন্তু পরক্ষণেই লেখক বলেছেন—"জমিদারদের পক্ষসমর্থন আমার উদ্দেশ্য নয়। কি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা শিল্পীর উদ্দেশ্য—কি হইতে পারিত বা কি হওয়া উচিত ছিল—তত্ত্বজ্ঞ তাহা বিচার করিবেন।"

অতএব শিল্পী হিসাবে তাঁর বক্তব্য হল "বাংলার পল্লী কোন কোন অবস্থার সোপান অতিক্রম করিয়া বর্তমান দুর্দশায় আসিয়া সমুপস্থিত—তাহাই লিখিতে বসিয়াছি—একটি জমিদারবংশকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত জমিদারদের চিত্র আঁকিতে বসিয়াছি—তদাধিক কোন অভিপ্রায় বা জমিদারগণের সমর্থনের কোন উদ্দেশ্য আমার নাই। বিশেষ—জমিদারদের ধ্বংসের মূলে তাহাদের দুর্বুদ্ধি।"

"তাহারা নিজেরাও ধ্বংস হইল, গ্রামগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করিয়া গেল।" —জমিদার শ্রেণীর নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধই যে তাদের পতনের মূল—বলা বাহুল্য প্রমথ বিশীর অভিমত ছিল এই।

এদিকে নবীননারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণের এই দুই চরিত্রের মধ্যেও বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে। দুইজনেই জমিদার হলেও কিন্তু কীর্তিনারায়ণের জমিদারি সত্ত্বার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। তিনি সমাজের অঙ্গমাত্র। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগ নামেমাত্র।

কিন্তু নবীননারায়ণের মধ্যে জমিদারি রক্তধারার সঙ্গে মিশেছে মনুষ্যত্ব-বোধ। গ্রামের প্রতি আকর্ষণ তীব্রতর হয়েছে বহুদিন শহর বাসের ফলে।

আদালতের জজসাহেবের আচরণে জমিদারি প্রথার প্রতি উপেক্ষার মনোভাব ফুটে উঠেছে। নবীননারায়ণ স্বয়ং জামিন হতে চাইলে জজ সাহেব তীব্র আপত্তি জানালেন। এ সম্পর্কে লেখক যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তা হল—"জজ সাহেব ছোঁয়াটে কম্যুনিস্ট। জমিদারির প্রতি তাঁহার ঘোরতর অনাস্থা। নগদ টাকা ছাড়া তিনি আর কিছু বোঝেন না।"

প্রকৃতপক্ষে জমিদারের প্রতি এই ধরনের অনাস্থা কেবল জজ সাহেবের একার নয় বা নূতন নয় এ সকল সমাজেরই মনোভাবের প্রতীক।

নবীননারায়ণের সুদীর্ঘ স্বগত চিন্তার মধ্য দিয়ে তারই একটি ধারা বিবরণী দিয়েছেন অর্থাৎ শরিকী বিবাদ বিসংবাদের মধ্য দিয়েই যে একদিন জমিদারি আপনা থেকেই বিলুপ্ত হবে তা নবীননারায়ণ অনুভব করেন। অনুভব করেন, একদিন লাঠিবাজী ও লুঠতরাজ দিয়ে যে জমিদারির পত্তন হয়েছিল আবার

দাঙ্গাবাজীর মধ্য দিয়েই তার ধ্বংস হবে। সাধারণ লোকের ধারণা এ ছিল অশ্বত্থের অভিশাপ। কিন্তু বস্তুতঃ এ ছিল কালচক্রের অনিবার্য পরিণতি।

এ সম্পর্কে লেখক যা লিখেছেন তা কিছুটা থিয়োরি ধরনের হলেও প্রাসঙ্গিক-ভাবে তার উল্লেখ করা যেতে পারে—"এমনি করতে করতে তবে একদিন মুক্তি—যখন জোড়াদীঘির এক বিঘা জমিও আর থাকবে না। যে পথে এই জমিদারি অর্জিত সেই পথ ধরেই তার বিসর্জন হবে।...জমিদারির বিষবাষ্প প্রশ্বাসী কলকারখানা নয়—এ একটা সজীব, সক্রিয়, সচল বস্তু প্রায় রক্তমাংসের পদার্থ।... কিন্তু আর অনেকদিন নয়—দেশময় এই প্রথার বিসর্জনের বাজনা ধ্বনিত হচ্ছে। শীঘ্রই বাংলার জমিদারিপ্রথা অতলে তলিয়ে দিয়ে ভূতপূর্ব জমিদার-গণের বিসর্জিত প্রতি শূন্য মণ্ডপে এসে বসবে।"

এই ভূতপূর্ব জমিদার বলতে লেখক হয়তো তাদেরই ইঙ্গিত করেছেন—যাঁরা একদিন সমৃদ্ধ চাষী বা প্রকৃত জমির মালিক ছিলেন।

বর্গাদারদের হয়তো সেই পর্যায়ে ফেলা যায় না—তবে অন্ততঃ জমির সঙ্গে জমির মালিকের বন্ধনের ইঙ্গিত এতে আছে—অর্থাৎ লাঙল যার জমি তার. এ যেন তারই পূর্বাভাষ।

কীর্তিনারায়ণ থাকেন গ্রামে, আর নবীননারায়ণ থাকেন শহরে। দুজনেই অতীত স্মৃতিমন্থন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

কারণ লেখকের মতে—"দারিদ্র্যের চেয়েও অধিকতর শোচনীয় অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি।"

এই দীর্ঘশ্বাস কেবল নবীননারায়ণ বা কীর্তিনারায়ণের নয়—সমস্ত সামন্ত শ্রেণীরই মর্মকথা। লেখক তারাশঙ্কর এই নৈরাশ্যের দিকটিকেই উজ্জ্বল করে তুলেছেন তাঁর অনেকগুলি গল্প উপন্যাসে সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

জমিদারিপ্রথার শেষ পরিণাম জনতার মধ্যে বিলীন হওয়া। জমিদার যে বৃহৎ জনসম্প্রদায়েরই একটি অংশমাত্র—এ কথা প্রমাণিত হয় যখন কৃষকের লাঙ্গলের ফালে বিগত যুগের জমিদারের অস্থিপঞ্জর আবিষ্কৃত হয়। জমিদারতন্ত্র তখন জীবাশ্মের মতই অতীতের সাক্ষী হয়ে থাকে। জমিদারের পক্ষে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের সামিল হওয়া—এই হল স্বাভাবিক পরিণতি। এই সম্পর্কে যে শেষ কথা বলে লেখক প্রমথনাথ বিশী তাঁর বিশাল উপন্যাস ও সেই সঙ্গে জোড়াদীঘির বিরাট চৌধুরীবংশের ওপর ইতি টেনেছেন—তা হল "স্রোতের আবর্ত যেমন স্রোতের অঙ্গীভূত হইয়া মিশাইয়া যায়—চৌধুরীগণ একদা যে আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল—মানব-জীবন স্রোতে তাহা তেমনিভাবে মিশিয়া গিয়াছে—যে মানব-জীবন-স্রোতের স্বাভাবিক গতি ওই কৃষাণের, রাখালের, পথিকের জীবনে অনাদ্যন্ত লীলায় প্রবাহিত।"

# বনফুল

জমিদার চরিত্রের রূপায়ণের ক্ষেত্রে আর এক সুদক্ষ লেখক বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর লেখা দ্বৈরথ, মৃগয়া ও জঙ্গমের তৃতীয় খণ্ডে জমিদার ও জমিদারিপ্রথার চিত্র পাওয়া যায়।

জমিদারের চরিত্রচিত্রণ করতে গেলে গ্রামের পটভূমিকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই কারণে বাংলাসাহিত্যের বিশেষ একটি যুগে (প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ও তার অব্যবহিত পরে) গ্রাম কেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যেত। অর্থাৎ যতক্ষণ সামন্তরা বাংলাদেশের মাটি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হন নি এবং নগরমুখী হলেও তাঁদের দাবী ছিল গ্রামের জমিদারির প্রতি ততদিন জমিদার চরিত্রাঙ্কণের পট-ভূমিকা হিসাবে গ্রামজীবন ও গ্রাম্যসমাজ অপরিহার্যভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু ক্রমে বণিকতন্ত্রের প্রাদুর্ভাবে জমিদারশ্রেণী তাঁদের গ্রামের ভূসম্পত্তি বিলিয়ে দিতে লাগলেন ব্যবসায়ীদের কাছে। গ্রামের মধ্যে কলকারখানা মিল স্থাপনের মাধ্যমে প্রভূত অর্থলাভের সুবর্ণসুযোগ করে নিতে লাগলেন পুঁজিবাদীরা। জমিদারশ্রেণীরা স্থায়ীভাবে নগরবাসী হতে লাগলেন। গ্রামের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রজাবিক্ষোভ তাঁদের অধিকারকে আরও সঙ্কুচিত করতে লাগল। অতিরিক্ত শোষণ ও সহানুভূতিহীন ব্যবহারের কারণে জমিদারশ্রেণী প্রজাসাধারণের কাছে ভীতির পাত্র হয়ে উঠলেন। কারণ প্রাক্তনদের প্রজাবাৎসল্য ও দানশীলতা তাঁদের ছিল না, ছিল কেবল অর্থলোলুপতা। ফলে আইনতঃ জমিদারি উচ্ছেদের বহু আগে থেকেই গ্রামে বসবাসের পাট উঠিয়ে দিয়েছিলেন জমিদাররা। অন্যদিকে নগরজীবনের আকর্ষণ ও সুযোগসুবিধা অনেক। ফলে গ্রামীণ সম্পত্তি থেকে নগরজীবনের বিলাসিতার রসদ সংগ্রহ করার ধান্দায় থাকতেন তাঁরা। ফলে জমিদারের অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলে গ্রামজীবন দুর্বিষহ ও শোচনীয় হয়ে উঠতে থাকে। মজাপুকুর, হাজাদীঘি, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, অশিক্ষা, কুসংস্কার এইসব ছিল গ্রামের প্রধান অবলম্বন। চাষবাসের ক্ষেত্রেও অশিক্ষিত চাষীর অবৈজ্ঞানিক কৃষি-কার্যপদ্ধতি, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টির ফলে অজন্মা, মহাজন, নায়েব গোমস্তার শোষণ অথচ খাজনা আদায়ের নামে পীড়ন উঠেছিল দুঃসহ হয়ে। সেই সময় যাঁরা দেশব্রতী, তাঁরা অনুন্নত গ্রাম ও তার প্রজাচাষীদের পক্ষ অবলম্বন করে, বিদ্রোহী করে তুলেছিলেন তাদের-জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে। ফলে একদিন গ্রামের পাট চুকিয়ে দিতে বাধ্য হলেন সামন্তশ্রেণী। সেই সঙ্গে প্রজারাও

অনেকেই কৃষিকার্য ছেড়ে ক্রমশঃ শহরের কলকারখানার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শ্রমিক বনে যেতে থাকে। এই চিত্র অন্যত্রও পাওয়া যাবে (ফসিল গল্পে—রচয়িতা সুবোধ ঘোষ)। সেই সঙ্গে বাংলাসাহিত্যে গ্রামকেন্দ্রিকতাও বাদ পড়ল। কারণ জমিদারশ্রেণী ছিলেন সেযুগে গ্রামের মাথা তাই জমিদার ও গ্রামজীবন বাংলাসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। ক্রমশঃ জমিদার ও কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামজীবনের স্থান অধিকার করল মালিক ও শ্রমিক শ্রেণী যার পরিবেশ শিল্প-কেন্দ্রিক নগরজীবন। কৃষক আন্দোলন ও জমিদার-প্রজা সংঘর্ষের স্থান গ্রহণ করল শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ, 'ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেণ্ট' পুঁজিবাদী বুর্জোয়াতন্ত্রের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম। সেই সঙ্গে মার্কসীয় ভাবধারার প্রেরণা বহু উপন্যাস গল্পের ভিত্তিভূমি হয়েছে।

কিন্তু অকৃত্রিম, সরল গ্রাম্যজীবনের মত সামন্তচরিত্রও অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রচণ্ড। সামন্তচরিত্রে নগর সভ্যতার প্রভাব যতক্ষণ পড়ে নি ততক্ষণ তাদের শক্তি ও সাহস এবং খামখেয়ালীপনা, নিষ্ঠুরতা এবং সদাশয়তা দুই-ই সমান, অনাবৃতভাবে প্রকট ছিল। তাঁরা কখনও রাখ ঢাক করে চলতেন না—নগর জীবনের পালিশ তাঁদের চরিত্রে ছিল না। ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশ। সামন্ত-চরিত্রগুলোকে তাই যেন মহাকাব্যের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঐশ্বর্য বিলাস ও আড়ম্বরের সঙ্গে শক্তিদম্ভ ও প্রতিযোগী মনোভাব তাঁদের চরিত্রের ভূষণ-স্বরূপ ছিল। এ সব কিছু নিয়ে তবেই জমিদার চরিত্রের পূর্ণতা। লেখক বনফুল তাঁর দ্বৈরথ গল্পে দুই জমিদারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার, এক আকর্ষণীয় নজীর সৃষ্টি করেছেন। সম্পূর্ণ উপন্যাসখানি এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আনুপূর্বিক রচিত যার সঙ্গে সঙ্গে জমিদার চরিত্রের তথাকথিত বৈশিষ্ট্যগুলিও সমানভাবে পরিস্ফুট। এই জাতীয় আয়োজন, বুদ্ধিদীপ্ত ও কলাকৌশল সমন্বিত উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে প্রায় বিরল। উগ্রমোহন আর চন্দ্রকান্ত নিকট সম্পর্কিত অথচ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জমিদার। দুজনের সম্পর্কও অতি মধুর—শালা-ভগ্নীপতি।

উপন্যাসের গোড়াতেই লেখক কাছারী বাড়ীতে জমিদারের বিচার দৃশ্যটিকে উপভোগ্যরূপে বর্ণনা করেছেন। কাছারী বাড়ীতেই প্রজাদের খাজনা জমা দেবার রীতি ছিল। জমিদারের আগমণের পূর্বেই গোমস্তা মহাজনেরা প্রজাদের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করে রাখেন। প্রজাদের মধ্যে নগ্নগাত্র গরীবের সংখ্যাই বেশী, শুধু গরীব নয়, অধিকাংশই মূর্খ, তাই তহশীলদাররা জমিদারের ওপর তাদের প্রভাবের কথা বর্ণনা করে যখন আত্মগৌরব প্রচার করে প্রজারা মুগ্ধ বিস্ময়ে শোনে। সত্য মিথ্যা বাচাই করার ক্ষমতা বা বুদ্ধি তাদের নেই। তবে

উগ্রমোহন যে সদাশয় জমিদার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—কারণ তাঁর কাছারীতে প্রজাদের জন্য চিঁড়া দইয়ের ব্যবস্থা আছে। জমিদার উগ্রমোহন নামে এবং কাজেও উগ্রপ্রকৃতি। অন্যায় করলে গ্রামছাড়া করতে যেমন তিনি পিছ পা নন—প্রজাদের ঔদ্ধত্যে বেয়াদবী যেমন তিনি ক্ষমা করেন না—আবার দরিদ্র প্রজার খাজনা মকুব করতেও তিনি দ্বিধা করেন না। দরিদ্র প্রজার কন্যাদায়ে তিনি স্বেচ্ছায় অর্থসাহায্য করেন।

পূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে এই উগ্রমোহন চরিত্র কিছুটা যোগাযোগের মধুসূদনের ছাঁচে ঢালা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণসীতা' উপন্যাসের সোমনাথ চরিত্রের সঙ্গেও তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। তার কারণ, সামন্তশ্রেণীর চরিত্র বিশিষ্ট কতগুলি উপাদানে গঠিত ছিল এবং এর মধ্যে যাঁরা ব্যতিক্রম—তাঁরাই জনদরদী প্রজাদরদী জমিদার বিরোধী হতেন। তাঁদের রক্তের মধ্যেই তখন দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে।

অবশ্য উগ্রমোহন, সোমনাথ. মধুসুদন যে শ্রেণীর জমিদার তাঁদের মধ্যে শিল্পবোধের একান্ত অভাব। জমিদারদের স্বভাবতঃই সঙ্গীত প্রিয় সুরা এবং বাঈজীর নৃত্যগীতের প্রতি আসক্তরূপে দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু উগ্রমোহনদের বেলায় সঙ্গীতের প্রতি অনাসক্তি দেখানোর অর্থ হয়তো তাদের উগ্র শক্তিমত্তাকে প্রকট করে তোলার জন্যই। পশুশক্তির সঙ্গে শিল্পসৌন্দর্যের হয়তো বিরোধ আছে—কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠি' উপন্যাসের কুমার বিশ্বনাথের পূর্বপুরুষ রাঘবেন্দ্রনারায়ণ কিংবা জলসাঘরের জমিদারবংশ কেবলমাত্র বাঈজীর সঙ্গীত নৃত্য-রাগরাগিণীতে ডুবে থাকতেন না—তাঁরা নিজেরাও ছিলেন সুরস্রষ্টা।

দ্বৈরথ গল্পের চন্দ্রকান্তকেও সেই পর্যায়ে ফেলা যায়। তিনি একজন সূক্ষ্ম কলারসিক। তাঁর বৈঠকখানায় নিত্য সঙ্গীতের আসর বসে। চন্দ্রকান্ত নিজেও সঙ্গীত পারদর্শী। চন্দ্রকান্তের দেওয়া ভগ্নীর 'বাণী' নামটি রূপান্তরিত করে বহ্নিকুমারী নাম দেওয়া যেন চন্দ্রকান্তের শিল্পরুচির বিরুদ্ধে উগ্রমোহনের আপোসহীন বিদ্রোহই সূচিত হয়েছে।

'দ্বৈরথ' গল্পে শালা-ভগ্নীপতি যদিও দাবাখেলার সময় দুইজন পরম মিত্র—একে অন্যকে ছাড়া থাকতে পারেন না—কিন্তু দাবার ছক পেতে দুইজনেই দুজনকে জব্দ করার নব নব ফন্দি উদ্ভাবনে ব্যস্ত। কে কার ওপর টেক্কা দেবে। উভয় জমিদারের চালচলন প্রাসাদবাড়ীর ঐশ্বর্য বিলাস এবং জমিদারি মেজাজ যথারীতি পরিস্ফুট। উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও প্রতিবেশী সমধর্মী

জমিদারের লড়াইয়ের চিত্র প্রতিফলিত। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লাসে কত নিরীহ মানুষও যে বলিদান হয়, সেই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়'—এর মত, তার নজীরও এখানে বিরল নয়। জমিদারের খামখেয়ালীতেও নেকনজরে পড়ে কত লোক যে রাজা হয় আবার কত জন যে পথে বসে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য লুঠতরাজ দাঙ্গা খুন-খারাপীও চলতে থাকে।

চন্দ্রকান্তের লোকজন উগ্রমোহনের জলকর লুণ্ঠন করলে উগ্রমোহন তাঁকে ফৌজদারি মামলায় দায়ের করেন। চন্দ্রকান্তও মাছ লুঠ করে তাই দিয়ে উগ্রমোহনকে ভেট পাঠান। এইভাবে গাভী চুরি, বুমনি সুমনির বিবাহ ব্যাপার ইত্যাদি নিয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ সরসভাবে বর্ণনা করলেও তার মধ্যে জমিদার চরিত্রের নিষ্ঠুরতা এবং ব্যাভিচারের দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহন দুজনেরই চারিত্রিক কিছু দুর্বলতা ছিল—বরং তুলনায় উগ্রমোহনেরই বেশী ছিল। তিনি রেশম নাম্নী এক বাঈজীর প্রতি যৌবনে আসক্ত ছিলেন। জমিদারের এহেন চরিত্রদোষ অবশ্যই ধর্তব্য নয় কারণ সেকালের জমিদারের এসকল পৌরুষের অঙ্গ ছিল। চন্দ্রকান্তও সে দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না।

দ্বৈরথ গল্পে দুই জমিদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত রাণী বহ্নিকুমারীর মৃত্যুতে গভীর ট্রাজিকরসে পরিসমাপ্ত হয়েছে। বহ্নিকুমারীর মৃত্যু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতারই পরিণতি। বিত্তবান প্রজা গোলক শাকে চন্দ্রকান্তের জমিদারি থেকে হরণ করে জঙ্গলমহালের ভয়ঙ্কর চোরকুঠুরির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন জমিদার উগ্রমোহন। সেই গোলক শাকে জমিদারের অগোচরে, গভীর রাত্রে অন্ধকারে একাকিনী মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন বহ্নিকুমারী। কিন্তু ময়াল সাপের দংশনে তিনি প্রাণ হারান। তাঁর মৃত্যু প্রবল পরাক্রান্ত উগ্রমোহনের উগ্রতা চিরতরে হরণ করল। গল্পের শেষ কথা যদিও এই তবু এর মধ্যে সামন্তচরিত্রের নিষ্ঠুর ও ক্ষমতালিপ্সার দিক যেমন আত্মপ্রকাশ করেছে সেই সঙ্গে জমিদার পরিবারের হালচাল, জীবনচর্যা এবং জমিদারি পরিচালনার বিভিন্ন তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে।

মৃগয়া বনফুলের অপর একটি রচনা। এক জমিদার পরিবারের শিকার যাত্রার বিবরণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের জমিদারি মেজাজ এবং তাদের লোক লস্কর পাইক পেয়াদাদের স্বতন্ত্র চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। জমিদার পরিবারের তিন কর্তা-বড় মেজ ও ছোট—তিনজনের চরিত্র ও নেশার প্রকৃতি আলাদা। জমিদার-পত্নীদেরও

তাই। এবং এদের মৃগয়া উৎসব যে শুধু বিলাসিতারই নামান্তর জমিদারি খেয়াল বা প্রমোদ উৎসবমাত্র সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শিকার করা আর হয় না। জ্যোৎস্না রাত্রির প্রভাবে সকলেই মাতাল হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গক্রমে সেকালের জমিদার পরিবারের রক্ষণশীলতার সঙ্গে একালের জমিদার পরিবারের বন্ধন শিথিলতারও তুলনা দিয়েছেন। অতীতের সাক্ষী বৃদ্ধা জমিদার মাতার চোখেই এ দুয়ের পার্থক্য ধরা পড়ে। সে যুগে জমিদারের অন্তঃপুরে কলেজী শিক্ষা প্রবেশ করে নি—কিন্তু ছিল লজ্জা ও সম্ভ্রম বোধ, এবং বহুপোষ্য পরিবৃত সংসারে নিজেকে মানিয়ে নেবার শিক্ষা। সে যুগের ঐশ্বর্য বিলাস, বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠানের সে আড়ম্বর এখন কোথায়? শিকার করতে বুড়োকর্তারাও যেতেন—কিন্তু তাঁদের সঙ্গে অন্তঃপুরিকাদের অধিকার ছিল না বা নির্লজ্জতা ছিল না—পুরুষের বার মহলের অংশ নেবার। তাদের জীবন ছিল বারব্রত পূজা-পার্বণ আর অতিথি অভ্যাগত নিয়ে।

সেই জমিদার পরিবারেও এখন যুগের হাওয়া লেগেছে। মেয়েদের সাজসজ্জা ধরনধারণ গেছে পাল্টে। পর্দা গেছে উঠে। জমিদারী প্রথা ক্ষয়প্রাপ্ত হবার সঙ্গেই অবশ্য এই পরিবর্তন। এই প্রথা এখন আর কারুরই কাম্য নয়। কিন্তু বৃদ্ধা মায়ের মন বোঝে না। তাঁর অতীত বধূজীবনের কথা মনে পড়ে যায়। বড়ো কর্তাদের কত বীরত্ব ছিল। বড় বাঘ মারতেন তারা। কিন্তু মেয়েদেরকে রাখতেন অন্তঃপুরের মধ্যে তাঁদের সঙ্গী করার কথা কখনও ভাবতেন না তাঁরা। মেয়েরা ছিল দামী আসবাবের মতই কোণঠাসা। কিন্তু বৃদ্ধার মনে হয় সেই ছিল ভাল। কিন্তু আজকের জমিদারকন্যা ঊষা মনে করে আজকের যুগই ভাল।

সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্য ও রক্ষণশীলতার বাঁধুনী যে যুগের হাওয়াতে টলমল করে উঠছে—সেখানেও যে আধুনিক জীবনের ভাবধারা বনেদীয়ানার প্রাচীরকে ধ্বসিয়ে ফেলছে—জমিদার জীবনের এই দিকটিই 'মৃগয়ায়' ফুটিয়ে তুলেছেন বনফুল।

জমিদার পরিবারের এই ধরনের অন্তর্বিরোধ অর্থাৎ আব্রু ঠেলে মেয়েদের বেরিয়ে আসাটাও কি সামন্তব্যাঘ্রদের স্বেচ্ছাচারে অনেকখানি লাগাম টেনে ধরে নি? 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর' অপর্ণা যে কথা বলতে পারে নি, দ্বৈরথের বহ্নিকুমারী নিজের জীবনদানের যে পরিণাম দেখে যেতে পারে নি—আজকের ঊষারা সাধারণ মানুষকে জমিদার পরিবারে টেনে এনে তাদের অন্দরমহলের পাষাণ কারার অন্ধকারে বাইরের আলো প্রবেশের পথকে অবারিত করতে পেরেছে অনায়াসে।

এই জ্যোৎস্না রাত্রিতেই বড়বাবু—অজস্র অলঙ্কার ও বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে সজ্জিতা বড়বধূর মধ্যে প্রথম আবিস্কার করলেন তার সৌন্দর্যকে। এর আগে তিনি বড় বৌয়ের প্রতি কখনও মনোযোগ দেন নি। ছোটবাবুর বাইরের টান হঠাৎ ছোট বউয়ের প্রতি আকর্ষণে নিবৃত্ত হয়েছে। জ্যোৎস্নারাত্রিই শুধু নয়—উষা, হীরেন, সুরেন মীনার অবাধ মেলামেশার নেশা তাদেরও মনে রং ধরিয়েছে। তাদের বাইরের জমিদারি ঠাঁট আজ অন্তঃপুরিকাদের সাহসিকতা ও প্রগতিবাদের ধাক্কায় ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এইভাবে মৃগয়া গ্রন্থে সামন্ততন্ত্রের এক অভিনব দিক উন্মোচিত হয়েছে অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের সাবেক কালের মধ্যে এ কালের হাওয়া লেগে তার চেহারা কেমন বদলে দিচ্ছে—বনফুলের 'মৃগয়া'কে তারই বাণীরূপ বলা যায়।

জঙ্গম' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে বনফুল আর এক সামন্ততান্ত্রিক স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। কাহিনীর নায়ক বন্ধু উৎপলের ডাকে, গ্রামে এসে, জমিদার পরিচালনার ভার এবং সেই সঙ্গে প্রজা কল্যাণের দায়িত্ব নিয়েছে এবং লক্ষ্য করেছে মহাজনের হাতে প্রজার নিগ্রহ। তাদের জীবনের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র যেমন দেখেছে তেমনি দেখেছে প্রজাদের চরিত্রের দুর্নীতি-পরায়ণতা। তাই সে একটি সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী হলেও পরে বুঝেছে তাদের সর্বাত্মক উন্নতি ঘটানো কত অসম্ভব ব্যাপার। প্রজা সম্পর্কে শঙ্করের এই চিন্তাধারা প্রজা জমিদারের এক নূতন সম্পর্কের আভাস দিয়েছে।

এই উপন্যাসে শঙ্করের বন্ধু উৎপল জমিদার। নিপু ছিল জমিদার-বিদ্রোহী-প্রতি শ্রমিকের কৃষকের অন্তরে আগুন জ্বালানোই তার কাজ। তার ডায়েরীতে তারই বিস্তৃত বর্ণনা লেখা হয়েছে। নিপুর সঙ্গে শঙ্করের এইখানেই তর্কের সূত্রপাত।

নিপু বলে—"ধনী হয়ে কেউ জন্মায় না। গরীবের রক্ত শোষণ করে তবে লোকে ধনী হয়।"

শঙ্কর বলে—"সত্যি সত্যি গরীবের রক্ত শোষণ যারা করে নি ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এইমাত্র অপরাধ—তাদেরও আপনারা নিস্তার দেন নি।" নিপু বলে—"রক্তবীজের বংশ নির্মূল করাই উচিত।" শেষ পর্যন্ত শঙ্করের মনে হয়েছে—

"উৎপলের জমিদারির ভার লইবে উৎপলের প্রজারাই। তাহারাই নিজেদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসন পরিষদ গড়িবে।......তাহাকে যদি নির্বাচক করে, ভৃত্যের মত সেবা করিবে সে।"

বলাবাহুল্য এইখানে শঙ্করের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে সামন্তশ্রেণীর আদর্শই বিশ্লেষিত হয়েছে।

# মনোজ বসু

মনোজ বসুর 'নরবাঁধ' গল্পে বল্লভ রায়ের জমিদারি লাভের এক অবাস্তব ঘটনা—সেই সঙ্গে 'নরবাঁধ' উদ্ভবের পিছনে যে অলৌকিক কাহিনী বর্তমান—সেসব ইতিবৃত্ত যেমন বর্ণিত, অন্যদিকে পুঁটিমারির জমি নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে বিরোধের উল্লেখ আছে। সেই সঙ্গে ঘনশ্যাম চরিত্রে চিরন্তন নায়েব চরিত্র পরিস্ফুট। বিলে নোনা জল ঢুকে চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে নায়েব দুঃখিত নন বরং খুশী। বলেন—"বেঁচেছি মশায়। ছোটলোকের ঘরে পয়সা হলে রক্ষে আছে?" তখন প্রজারা রাইচরণের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধভাবে জমিদারের বিরুদ্ধে দল পাকাতে থাকে। কিন্তু নায়েব চেষ্টা করেন প্রজাদের সব জমি কি করে হস্তগত করা যায়। তাঁর মত হল—"সমস্ত চক এমনি করে আস্তে আস্তে খাস করে নেব। তারপর গোটা বিলটা জেলেদের কাছে বিলি হবে। জলকরে সুবিধে কত মশাই। প্রজা বেটাদের নানান আবদার, আজ বাঁধ ভাঙল—কাল নোনা লেগেছে—হেনো কর। তেনো কর। এখন কিছু হাঙ্গামা নেই। বছর অন্তর জেলের কাছ থেকে করকরে টাকা একসঙ্গে গুণে নেও। তারা জাল ফেলুক—মাছ ধরুক—ব্যস। ধানে আমাদের গরজটা কি? টাকা হলেই হল।" এর উত্তরে নায়কের যে কথা মনে হয়েছিল—তা সেই চিরন্তন জমিদারি শোষণের কথা। সে ভেবেছিল—"বুঝিলাম, পুঁটিমারির বিল ডুবি হওয়ায় জমিদারের লোক নাই। মরিতে মরিবে অভাগা প্রজারা, সাতপুরুষের ভিটে ছাড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দেশান্তরে চলিয়া যাইবে।"

রাইচরণের দলকে দেশ ছাড়া করে তবেই নায়কের কৃতিত্ব—তাই ঘনশ্যাম বলেন—"জমিদারির কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম—দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পিছপাও?"

রাইচরণকে জমিদার তলব করে পাঠালে রাইচরণ জমিদারের প্রেরিত দূত রজনীকে নাকি বলে সে জমিদারের নজরানা নিয়ে আসছে। কিন্তু 'নজরানা মানে এখানে [ছুরি—তাই দিয়ে আঘাত করেছে সে রজনীকে' এই সংবাদই রটনা হয়।

ফলে প্রতিশোধ স্পৃহায় জমিদার পক্ষ মামলা সাজাতে শুরু করে। এমন কি গোপনে ঘনশ্যাম নিজে গিয়ে রজনীকে নিদ্রিত অবস্থায় পায়ে আঘাত করে রক্ত বার করে আসেন রাইচরণকে ডবল মামলার দায়ে ফেলার জন্য। বাইরের লোক জানল রাইচরণই অপরাধী। সেই রাইচরণের কি শাস্তি হল?

নায়কের বাবার কথায়—"রাইচরণ—মরেও নি দেশও ছাড়ে নি। উচ্ছেদ করেছিলাম"—পরে তার স্ত্রীপুত্র পায়ে জড়িয়ে ধরাতে তিনি করুণা করায়, "শেষ পর্যন্ত পাই পয়সা না না নিয়ে সেই মৌরশি পঁচিশ বিঘে কবলা করে দিয়ে গেল।"

এই গল্পের অপর চরিত্র পণ্ডিতমশায়ের জীবনের ট্র্যাজিডিরও ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন। কথায় কথায় প্রজা উচ্ছেদ জমিদারের পক্ষে যত সহজ ছিল প্রজার হৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের জন্য তাঁদের কোনও দায় ছিল না। সম্পর্ক কেবল খাজনা আদায়ের। পাগল পণ্ডিতমশায়ের চরিত্রে সেই সর্বহারা ভাবটি চমৎকার ব্যঞ্জনা পেয়েছে। পণ্ডিত মলিন শতচ্ছিন্ন কাপড়ে বাঁধা ছেঁড়া দলিল দেখিয়ে বলে—

"ছেঁড়া দপ্তরে আমার লাখ টাকার দলিল জান। অবশ্যই এই পণ্ডিতের অনেক জমি ছিল পুঁটিমারির বিলে। সে বিশ বছরের দাখিলা[১] বাহির করিয়া দিল। যে বার অজন্মা গিয়াছে, খাজনা দিতে পারে নাই—পরের বৎসরের সুদ খেসারত দিয়া খাজনা শোধ করিয়াছে।"

নায়েব ঘনশ্যাম তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে "বাকি খাজনায় নিলাম হয়ে গেছে তোমার জমি। এস্টেট থেকে কিনে নিয়েছে—পচা দাখিলে তা ফিরবে না। ফেলে দাও......ও সব......পুড়িয়ে ফেল।" বিলডুবি হয়ে গেছে পণ্ডিতের সে-সকল সম্পত্তি। শোকে পণ্ডিত পাগল হয়ে গেছে—তাই তো সে সকলকেই দেখায় লাখ টাকার দলিল।

অভাব অনটন দুঃখ দারিদ্র্যে গ্রামের প্রজারা আজ দেহে মনে নিঃস্ব। তাই তো লেখকের মনে হয়েছে—নরবাঁধে দেবীর স্বপ্নাদেশ মতো হয়তো হাজার মানুষ বলি হয় নি—কিন্তু কঙ্কালসার মানুষের মিছিল যেন প্রেতলোকের ইশারা দিতে থাকে।

এই কাহিনীতে লেখক মনোজ বসু জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ এবং তার পরিণামের চিত্র যেমন এঁকেছেন তেমনি জমিদারিপ্রথা বিলোপের আগে প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তিত হবার আগেকার জমিদার ও নায়েবের ক্ষমতার সীমা সম্পর্কেও ধারণা দিয়েছেন।

'নরবাঁধের' পর অন্য যে রচনাগুলিতে জমিদার প্রজা সম্পর্ক. অথবা জমিদারে জমিদারে বিরোধ বিসংবাদ এবং সেই সঙ্গে ভূমিসংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুনের

১। দাখিলা—ভূম্যধিকারী স্বাক্ষরিত কয়েক বৎসরের খাজনার রসিদ বিশেষ

উল্লেখ আছে—সেগুলি হল 'পৃথিবী কাদের' ? 'বন মর্মর' এবং 'রায় রায়ানের দেউল'। এই তিনটিই গল্পসংগ্রহের অন্তর্গত ছোট গল্প।

এই ত্রয়ী গল্পের মধ্যে 'পৃথিবী কাদের' গল্পে প্রজার উপর জমিদার তথা নায়েবশ্রেণীর অত্যাচার অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নামকরণের মধ্যে লেখক সেই সত্যের আভাস দিয়েছেন। এবং গল্পের উপসংহারে চাষীর বউ সৌদামিনী ঠিক 'মহেশ' গল্পের ( শরৎচন্দ্র ) গফুরের মতই বলেছে—"গিয়ে সেই পোড়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করব। পৃথিবী যদি বাটোয়ারা করে দিয়েছিস তবে আমাদের সেখানে পাঠাস কি জন্যে ?"

পৃথিবী কাদের গল্পে খাজনার দায়ে বরকন্দাজ পাঠিয়ে জমিদার নটবর চাষীকে ধরতে পাঠায়। নটবর আত্মগোপন করতে গিয়েও ধরা পড়ে যায়। কাছারী ঘরে এসে ফাঁসির আসামীর মতো তাকে হাজির হতে হয়। লেখক এই সম্পর্কে লিখেছেন—"ছোটবাবু অল্পকথার মানুষ।" "বললেন—মালিকের মান খাজনার দায়ে তোমার জমি নিলাম হয়ে গেছে।"

নটবর সম্পর্কে সব তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে ইতি মধ্যেই। বরকন্দাজ দিয়ে লাঙ্গল খুলে তাকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিলেও সে রাত্রিতে গোপনে জমি চাষ করে জমির দখল বজায় রাখছে। সে কথা জানতে পেরে ছোটবাবু হাণ্টার দিয়ে তাকে উত্তম-মধ্যম দেবার প্রস্তাব করেন।

তার উত্তরে নটবর আকুল হয়ে কেঁদে বলেছিল "বাঁধ ভেঙ্গে তিন তিন বছর ক্ষেত ভাসিয়ে দিল—পেটে খেতে পাই নি, খাজনা দেব কোত্থেকে। সে আরও বলেছিল—এবার জমিতে সোনা ফলবে হুজুর। খাবার ধান যা জোগাড় ছিল, সমস্ত বীজতলায় ছাড়িয়েছি। এইবারটা রক্ষে করুন ধর্মবাপ, সিকি পয়সা আর বাকি থাকবে না।"

তার উত্তরে নায়েব বলেছিল, "তোদের ঐ মায়াকান্না শুনলে কি আর রাজ্যি রক্ষা করা যায় ?" ছোটবাবু জমিদার। অবশ্য নায়েব অপেক্ষা সদয়। তিনি সে বারের মত ক্ষমা করলেন তবে সতর্ক করে বললেন—"কিন্তু জমি জমিদারের। আর কোনদিন লাঙ্গল চষবিনে—খবরদার।"

আসল কথা বাকী খাজনার দায়ে জমিদারের চেলারা ঢোল বাজিয়ে দু-পুরুষের জমি নিলাম করে নিয়েছে—তাড়িয়ে দিয়েছে নটবরকে জমি থেকে।

নটবরের স্ত্রী সৌদামিনী জমিদারের কর্মচারীদের এই দুর্ব্যবহারের সমালোচনা করে বলে—"ওরা খাজনা পায় নি আর তুমি এই তিন বছর দিন নেই রাত নেই তিল তিল করে জীবন দিয়েছো—তুমি কি পেয়েছ শুনি ?" ছোটবাবুর বাপঠাকুর্দার

আমলের জমিদারি, তাইতো ছোটবাবু বলতে পারেন—টাকার সুদের হারে তাঁর পোষাচ্ছে না। কিন্তু নটবরের বাবা আবাদ করতে গিয়ে ঐ জমিতে সাপের কামড়ে জীবন দিয়েছে, তাই তার ছেলেপুলে আজ দানা পায় না। এ কেমন বিচার ? সৌদামিনীর মনে যে প্রশ্ন আছে তার জবাব দিয়েছেন লেখক। সৌদামিনী নিতান্তই অবোধ কিম্বা পাগল, তাই এই দুনিয়ার চিরাচরিত বিধানের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু যারা জানে—তারা নটবরের মত সবকিছু নির্বিবাদে মেনে নেয়। এই সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—

নটবর যা বলেছে—"পাগলই ঠিক। এই কথাটা কিছুতে বোঝে না—লাঙ্গল টানতে টানতে গরু মহিষও কত মুখ থুবড়ে মরে যায়। মানুষ সাপের কামড়ে মরেছে, জ্বরে, ওলাওঠায়, পঙ্গপালের মতো মরেছে বাঘ কুমীরের পেটে গেছে—আবার নূতনের দল এসেছে, যুগের পর যুগ চলেছে, বন কেটে জনপদ হয়েছে। শস্য-শালিনী পৃথিবী হাসছে। যাঁদের এই পৃথিবী, রাজ্য দেখতে তাঁরা মাঝে মাঝে শুভ পদার্পণ করেন, রাজ কাছারীতে উৎসব পড়ে যায়, আলো জ্বলে, মাছ আর মিষ্টান্ন দেশদেশান্তর থেকে ভারে ভারে উদয় হয়, শতজনে তটস্থ। তিলমাত্র ত্রুটি যেন না ঘটে। কবে কোনখানে কে মরেছিল, কে তার ইতিহাস মনে রেখেছে আর তার দরকারই বা কি।"

লক্ষ্যণীয় যে বিভিন্ন যুগের লেখকের মধ্যে প্রজাপীড়ন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের গভীর মিল রয়েছে।

নায়েবের কাছে নটবরচাষী আশ্বাস পেয়েছিল তার জমিতে চাষের অধিকার সে আবার ফিরে পাবে যদিও সে ফসল উঠবে কাছারীর গোলায়। কিন্তু নটবর জানতো না সে আশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা। নায়েব বলত সদর থেকে জমিদারের হুকুম এলেই নটবর আবার জমিতে যেতে পারবে কাজ করতে। কিন্তু সে হুকুম এল অন্যরূপ ধরে। পাকা হুকুম। আদালতের ছাপ মারা। চরণ ঘোষ টাকা দিয়ে গরু চরাবার বন্দোবস্ত পেয়েছে মালিকের কাছ থেকে। সেই অধিকারে নটবরের বীজধানে ফলানো শস্যক্ষেত্র গরুর আহার হয়ে উঠল। শুধু তাই নয় চরণ ঘোষকে এর শিক্ষা দিতে গিয়ে নটবর অপরাধী সাব্যস্ত হল। তার ঘরের জিনিসপত্র ভেঙ্গে-চুরে তাকে পথে বসাবার ব্যবস্থা হল। শুধু তাই নয় থানায় খবর দিয়ে তাকে জেলে পাঠাবার চেষ্টাও চলেছে। অতএব নিরুপায় চাষীদম্পতি একদিন ভিন্ন গাঁয়ে নতুন জমির আশায় পালিয়ে যেতে থাকে। যাবার আগে সৌদামিনীর শেষ প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। সে নিজেদের পরিত্যক্ত ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে দেয়। শুধু আগুনই জ্বালায় নি নিজেও সেই আগুনে ঝাঁপ দেয়। যাবার আগে বলে যায় বিধাতার কাছে সে এর কৈফিয়ৎ দাবী করবে-যে পৃথিবীটা কাদের ?

অপর দুটি গল্প 'বনমর্মর' এবং 'রায়রায়ানের দেউল' ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা না হলেও দুটি ঐতিহাসিক কিম্বদন্তীর মধ্য দিয়ে পুরানো দিনের সামন্ততান্ত্রিক বিরোধের চমৎকার নজীর তুলে ধরেছেন।

'বনমর্মর' গল্পটিতে বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে অতীত রোমন্থন যদিও হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে মামলামোকদ্দমা উপলক্ষে জমি জরিপ তার খাজনা সংক্রান্ত আইন-কানুন আলোচিত হয়েছে গল্পের নায়ক শঙ্কর ও ভজহরি আমিনের মধ্যে। এই ভজহরিই শঙ্করকে শুনিয়েছে রাজারামের গড়ের উপকথা।

জমির নক্সা দলিল ইত্যাদি সংক্রান্ত কাগজপত্র রাখার দায়িত্ব হল ভজহরি আমিনের। সেই সব রেকর্ডপত্রে যেসব মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিয়েছে তার সূত্র ধরে লেখক বলেছেন—"দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগেরা আসিয়া লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি লাগিয়াই থাকিত।"

শঙ্কর-দেখল দলিলে চাকলাদারবংশ কেমনভাবে পুরুষানুক্রমে রাজারামের গড়ের নিষ্কর জমির সেস দিয়ে যাচ্ছে কালেক্টারীতে। সেই সঙ্গে আছে জরিপের চিঠে—গুডিভসাহেবের চিঠে। বারো শ উনিশ সনের পুরানো দলিল। সেই সংগে আছে আরও অনেক দাবীদার। বর্তমান যুগে জমির মালিকানা নিয়ে কত তুচ্ছ মামলামোকদ্দমা শুরু হয়। অথচ এই রাজারামের গড়ের সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা ভাবলে মনে আজও রোমাঞ্চ জাগে। কুমার বাহাদুর জানকীরাম আর তার পিতা রাজারাম। কত বীরত্ব আর ঐশ্বর্যবহুল সেসব দিন গিয়েছে—আজকের দিনে জমির মামলা করতে এসে চারশ বছর আগেকার সেই পুরাতন ইতিহাসের স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে থাকে শঙ্কর।

'রায় রায়ানের দেউল' গল্পেও 'রাজা' রায়রায়ান ইত্যাদি উপাধিধারী সামন্তবর্গের শক্তির লড়াই এবং তার ট্রাজিক পরিণাম অপূর্ব ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। রায়-রায়ানের বিলাস ঐশ্বর্য শক্তি দম্ভের সঙ্গে গভীর বিষাদান্তক পরিণামের স্মৃতি বহন করছে আজও রায়রায়ানের দেউল। নিজের হাতে দেউল গড়ে আবার তাকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজের পরাভব স্বীকার করেছিলেন রায়রায়ান রামেশ্বর। এই পরাভব তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদীয়মান সামন্ত মধুকরের কাছে। রাজা ভারত-রায়ের কন্যাকে কেন্দ্র করেই এ বিরোধের সূত্রপাত। ডাকাতী লুণ্ঠন ও হরণ করা সে কালে সামন্তদের শক্তির প্রমাণ স্বরূপ ছিল—এরই সাহায্যে তাঁরা জায়গীর অধিকার করতেন, নগর পত্তন করতেন, গড় নির্মাণ করতেন। রায়রায়ানের দেওয়ান জীবনলাল ছিলেন তাঁর এসব ব্যাপারের প্রধান সহযোগী। রাজ্য গড়াই তাঁর কাজ। দেওয়ান জীবনলালের কূটবুদ্ধি পরবর্তী নায়েব গোমস্তাদের মধ্যে সঞ্চারিত। বলা বাহুল্য পর্তুগীজ আমলের সামন্তদের চিত্রই এখানে মনোজ বসু ফুটিয়ে তুলেছেন।

## নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সামন্তশাসনের আর এক দিক উদ্ভাসিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লালমাটি, স্বর্ণসীতা এবং সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী উপন্যাসে।

ঐতিহাসিক কৈবর্ত বিদ্রোহের রক্তাক্ত স্বাক্ষরে একদা রক্তিম বরেন্দ্রভূমের লালমাটি—তারই পটভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর এক নববিদ্রোহের চিত্র এঁকেছেন—তা হল জমিদার ভৈরব নারায়ণ আর ফতেশার বিরুদ্ধে সমগ্র প্রজা-সাধারণের বিদ্রোহ।

উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, দিব্যোকের নেতৃত্বে, কৈবর্ত বিদ্রোহকেই বাংলার মাটিতে প্রথম সার্থক গণবিপ্লব বলা হয়। আজকের দিনের আদিনার সাঁওতালদের অভ্যুত্থানের কাহিনী বর্ণনার আগেই ( লালমাটি উপন্যাসে ) লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন সে কথার।

বলেছেন—"অনার্য শক্তি কি নতুন করে খুঁজেছিল আত্মপ্রকাশের পথ? জিতু সাঁওতালের ভেতর দিয়ে কি আত্মঘোষণা করতে চেয়েছিল দিব্যোকর বিদ্রোহী প্রেত সত্তা?"

লালমাটি উপন্যাসের মূল লক্ষ্য যদিও হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ ও আজাদী পাকিস্তানের নব জন্ম দেখানো—কিন্তু এর মূল ভিত্তি সেই জমিদার প্রজার চিরন্তন বিরোধ।

সামন্তশাসনের কাছে উচ্চ-নীচ হিন্দু-মুসলমান কোনও ভেদ নেই। বিদ্রোহী প্রজা জমিদারের চোখে সমান শত্রু। আবার জমিদারে জমিদারে যত বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই থাকুক—বিদ্রোহী প্রজা দমনের সময়ে তারা হাতে হাত মিলিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান সব জমিদারেরই এক চেহারা তারা সবাই একজোট। এখানে শরৎচন্দ্রের সেই দর্শনেই ফিরে আসতে হয় অথবা মার্কসীয় দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যায়—বিশ্বের সর্বত্র শোষণের চেহারা এক। তাই শোষকে শোষকে চরিত্র ও অত্যাচারের যেমন কোনও ভেদ নেই আবার শ্রেণী বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষেরও চেহারা এক।

লালমাটিতে হিজলবনীর জমিদার কুমার ভৈরবনারায়ণ ও জয়গর মহালের জমিদার ফতেশা—দুই প্রধান চরিত্র। দুজনেই জমিদার তবে জমিদারি অর্জনের ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র। ভৈরবনারায়ণ বংশানুক্রমে তথা উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদার। সে দিক থেকে তাঁদের রক্তে বনিয়াদী জমিদারের চরিত্রকৌলীন্য

আছে এবং কথায় কথায় তিনি সে কথা প্রকাশ করেন—তাঁর মোসাহেবরাও তাঁর পূর্বপুরুষের আমলের গৌরবময় অতীতের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জমিদারের মনোরঞ্জন করে। পূর্বপুরুষের জন্য গৌরব করা ও সেই ঠাট বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করা যে জমিদার চরিত্রের মজ্জাগত দিক ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ তারা-শঙ্কর প্রভৃতির কয়েকটি ছোট গল্পেও আমরা সেই বর্ণনা পেয়েছি।

বরিন্দরের মালিনী নদীর বাঁকের মুখে একপারে হিজলবনী অন্যপারে কুমার ভৈরবনারায়ণের দৌলতখানার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত লেখক প্রাসঙ্গিকভাবে এনেছেন।

সাতমহলা বাড়ীর লোকলস্কর, আমলা-পেয়াদার দস্তুরমতো রাজকীয় কারবার। মহাল নেহাত ছোট নয়, প্রায় ষাট হাজার টাকার জমিদারি, আগে আরো ছিল—তবে মদিরা ও মদিরাক্ষীদের অনুগ্রহে তার অনেকটাই বেহাত হয়ে গেছে। তবে পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বড়াই করতে ভৈরবনারায়াণ কুণ্ঠিত নন। সে সময় দশলাখ টাকার সম্পত্তি ছিল তাঁদের, তার চেয়েও বড় কথা কান্তনগরের যুদ্ধে দিনাজপুরের মহারাজার সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লেগেছেন তাঁরা।

সেই বিশাল জমিদারি চলে যাবার ঐতিহাসিক কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেন। দেবীসিংহের তখন ইজারা চলছে। ইজারাদার দেবীসিংহের আমলে জমিদারদের দুরবস্থার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীর জমিদার হরবল্লভের জীবনে দেখানো হয়েছে। খাজনার দায়ে জমিদারের জমিদারি নিলামে ওঠে। অনাদায়ে জমিদারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আসে।

এখানেও ভৈরবনারায়ণ তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। জমিদারদের তখন যেমন লাঠির জোর, তেমনি টাকার তাকত। কথায় কথায় মাথা কেটে আনে। দেবী-সিংহ কিস্তির টাকা এমন চড়িয়ে দিলে যে তা দিতে দিতেই অনেকের জমিদারি সরকারী লাটে চড়ল। নইলে এতকাল কি আর ইংরেজ রাজ্যশাসন করত—করত জমিদারেরা। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের ফলেই প্রাচীন বহু জমিদারবংশ দীন-দরিদ্র ও বিলুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল তারই একটা আভাস।

তবুও ভৈরবনারায়ণ আজও মস্ত জমিদার এবং লেখকের কথায় "তাঁর চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস যে মরেই তিনি পত্রপাঠ ফুরিয়ে যাবেন না, তাঁর জমিদারির স্বত্বস্বামীত্ব ভোগ করবার জন্য আবার দেহধারণ করে ফিরে আসবেন মর্তে।" এই জমিদারশ্রেণী সম্পর্কে লেখক অন্যত্র যে মন্তব্য করেছেন তা অতি রূঢ় বাস্তব সত্য—কথাটি হল—"কিন্তু রক্তে রক্তবীজেরা মরেও ফুরোয় না। দেবীসিংহের

সাধ্য কি তাদের বিনাশ ঘটায়।" অবশ্য এই জমিদারবংশে সূর্যনারায়ণের মত দানশীল জমিদারও জন্মেছিলেন। গ্রামে তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয় আজও তাঁর দানের সাক্ষী, যদিও অত্যাচারের ধনসম্পদকে অনেক জমিদারই এইভাবে সৎকাজে লাগাতেন।

কুমার ভৈরবনারায়ণ কিন্তু ঠিক বিপরীত। নিজের শক্তি ও অর্থলোভেও তিনি প্রজাদের স্বার্থে'র কথা ভাবেন না। বানের জল ডাঁড়ার মুখ দিয়ে বেরিয়ে প্রজাদের কাল পুখরির তিন হাজারি ফসলী জমি ডুবে যায়। তাই তারা বানের মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করার সঙ্কল্প নিয়েছে। কিন্তু ভৈরবনারায়ণ অটল, কারণ ঐ বানের জলে ফিরিঙ্গিপুর হাঁসমারীর বিল ভরবে, তাতে বছরে তিন হাজার টাকার জলকর লাভ আর ঐ বিলে ভৈরবনারায়ণের একচেটিয়া পাখি শিকার হয়।

এই নিয়েই প্রজা-জমিদার বিরোধের সূত্রপাত। জমিদারের আরও অত্যাচারের কাহিনী এতে বর্ণিত। জমিদারের অত্যাচারে নারীর ইজ্জত রক্ষা করা দায় হয়ে ওঠে, বহুলোক বেঘোরে প্রাণ হারায়। আবার দুই জমিদারের সংঘর্ষেরও ফলভোগী হয় প্রজা উলুখরেরা।

ভৈরবনারায়ণের প্রজারা বেশিরভাগই সাঁওতাল। অন্য কোনও জমিদারের অত্যাচারে এরা এসে স্থায়ীভাবে বাস করছে এই গাঁয়ে। তাদের মধ্যে যে আদিম রক্ত তার সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন।

রঞ্জন প্রশ্ন করেছিল যমুনা আহীরকে—"জমিদার কি জুলুম করে তোমাদের উপর ?" তার উত্তরে যমুনা বলেছিল—"জমিদার ফের কবে আমাদের মাথায় তুলে রাখে ?" তারপর সে বলেছিল খাজনা দিয়ে তাদের নিস্তার নেই, তাদের দই ঘি তাঁর পেয়াদা এসে কেড়ে নিয়ে যাবে বিনা পয়সায়। তার ওপর ঘরের মেয়েদের উপর পিয়াদাদের নির্লজ্জ দৃষ্টি। এইসব কারণে জমিদারের সঙ্গে প্রজার স্নেহ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না—ওঠে বাস্তব খাদ্যখাদক সম্পর্ক। জমিদারি অত্যাচারের এক জীবন্ত চিত্র এখানে পরিস্ফুট। এই বিদ্বেষের ভিত্তিতেই জমিদারি-প্রথার ভিত্তি প্রাঙ্গণ নড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য প্রমথনাথ বিশী জমিদার প্রজার সম্পর্ক বিষয়ে জোড়াদীঘির উদয়াস্তে যে মত পোষণ করেছেন—এ যেন ঠিক তার বিপরীত।

আর একদিকে জমিদার ও পাঠান নেতা ফতেশা—সোনাদীঘির হাটের পথে নিজের লোক লাগিয়ে বাপকে খুন করায় সে। তারপর দখল করে জমিদারি।

পিতৃহত্যার রক্ত হাতে মেখে নিঃসঙ্কোচে সে তার রাজ্যপাট চালিয়ে যাচ্ছে। লেখক বলেছেন এমন লোকের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক যে খুব মধুর থাকবে না, সে বলাই বাহুল্য। কিন্তু সাঁওতালরা মোটের উপর জমিদারের সান্নিধ্য থেকে দূরেই ছিল অনেককাল। কুঁজিকাঁটা আর ইকড় ঘাসে ভরা জমিতে এরা বাসা বেঁধে ছিল। জমিদার এদের কাছে প্রত্যাশা রাখে না—এরা খুশিমত কিছু নজর দিলেই খুশী।

ফতেশার হঠাৎ নজরে পড়ে সাঁওতালদের ফসলে ক্ষেতের উপর। তিনি জানলেন এই জমি তাঁরই। জিজ্ঞেস করে জানলেন ওরা খাজনা দেয় না—ফতেশা চোখ লাল করে জানতে চাইলেন—"আমার প্রজা, অথচ খাজনা দেয় না? উত্তরে শুনলেন—ওটা পতিত জমি। তখন গর্জন করে বললেন—পতিত জমি? কিন্তু খয়রাতী তো নয়—জমি আমার। পতিত হোক যাই হোক চাষ দিতে কে বলেছিল ওদের? খাজনা চাই।"

এইভাবেই জমিদারি দখল বেড়ে চলে—সেই সঙ্গে দুই জমিদারের সংঘর্ষও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সেই হিসাবেই ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে তিনি তিন চারটে দেওয়ানী লড়েছেন—ফৌজদারী তো আছেই।

ওদিকে যেমন ভৈরবনারায়ণ আর তার পেয়াদারা—এদিকে শাহু আর তার চরেরা প্রজাদের শ্রমার্জিত ধনে গায়ের জোরে ভাগ বসায়, মুসলিম প্রজারা মাছ ধরে—আর শাহুর পাইক এসে মাছগুলো তুলে নিয়ে যায়, না দিতে চাইলে লাথি মেরে কেড়ে নিয়ে যায়।

জিব্রাইল জমিদারের মোসাহেব। তাই সে প্রজাদের বিপক্ষে জমিদারকে সমর্থন করে বলে প্রজারা নাকি কথা বাড়িয়ে বলে। খাজনা তো ঠেকায় বছরে দু-চারগণ্ডা পয়সা, কিছু দেবে না তার বদলে? তোলা দেবে না জমিদারকে, থানার দারোগাকে? সে কথার প্রতিবাদে জলিল জ্বলে উঠে বলে, "তোলা? আমাদের মুখের গরাস, পেটের ভাত কেড়ে নেওয়াকে তোলা বলে?"

এইভাবে একটু একটু করে সমস্ত লালমাটিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিশাল হাঁসমারী আর ফিরিঙ্গিপুর বিলের জলকরের লোভে জমিদার ভৈরবনারায়ণ ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করতে রাজী নন। অথচ এই ডাঁড়ার সঙ্কীর্ণ খাতে প্রচণ্ডবেগে বয়ে আসা বর্ষার ঢল—প্রতি বছর ভাসিয়ে দেয় দুই তীরের ফসলী জমি। এই নিয়েই জমিদার-প্রজা বিদ্রোহের সূত্রপাত। রাজবংশীরা কিষাণ সমিতি গড়েছে জয়গড় মহালে—তারই ইন্ধন আহীরপাড়ায় আগুন জ্বালিয়েছে। জয়গড় মহাল

থেকে ভৈরবনারায়ণের পুত্রের অন্নপ্রাশনে কোনও বেগার আসে নি—আসে নি এক মুঠো বাড়তি নজরানা।

কিষাণ সমিতি ঠিক করেছে ন্যায্য পাওনাগণ্ডার অতিরিক্ত একটি পয়সা বেশি দেবে না জমিদারকে। এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের পাইক বা পেয়াদার মধ্যে খুনখারাপি চলতে শুরু করেছে। জয়গড় মহালের এই ঔদ্ধত্যের পিছনে ফতেশার পরোক্ষ হাত আছে—জমিদার ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবই এর মূল কারণ।

কিন্তু সকল অত্যাচারী রূপই এক-এ কথা আগেই বলছি। তাই প্রজা বিদ্রোহ বন্ধ করতে ভৈরবনারায়ণ প্রথমে রেশম কুঠিয়াল ক্রুসাহেবকে দলে টানবার চেষ্টা করেন, বলেন—"চারদিকে আগুন জ্বলবার জো হয়েছে সাহেব। এই বেলা ঘর সামলাও। নইলে পরে আর সময় পাবে না।"

সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলেন না ভয় তিনি পান নি—"ভয় আমাদের রক্তে নেই। লাঠির জোরে আমাদের জমিদারি, লাঠির জোরেই তা রাখব।"

ভৈরবনারায়ণের উক্তি আচরণের মধ্যে দিয়ে লেখক জমিদারের চিরন্তন শোষক রূপটি যেমন উদ্‌ঘাটিত করেছেন—সেই সঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন তার আসন্ন পতনের। ফতেশা আর-ভৈরব নারায়ণরা যে আর বেশিদিন থাকবে না—তারই ইঙ্গিত। স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন সফল হবার সঙ্গে সঙ্গে এই লালমাটি থেকে চিরদিনের মত মুছে যাবে এইসব রক্তবীজেরা—ইজারাদার দেবীসিংহও যাদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে পারে নি।

তাই রাত্রে খেতে বসে আলিমুদ্দিন যখন দেখল শাহু মাছ পাঠিয়েছে সে বিস্ময় বোধ করল। সামান্য স্কুল মাস্টারের প্রতি ফতেশা পাঠানের অযাচিত অনুগ্রহ? কিন্তু পরে কারণটা বুঝতে দেরী হয় না আলিমুদ্দিনের। তাদের আজাদ পাকিস্তানের স্বপ্নের মধ্যে ফতেশার স্বপ্নও মিশে আছে—যদিও তার চেহারা আলাদা। সে হয়তো স্বপ্ন দেখছে নতুন কোন শাহী আমলের। পাকিস্তান হলেই আবার গিয়ে চড়াও হবে—তখত এ তাউসে। হাতে মাথা কাটতে পারবে হাজার হাজার মানুষের।

আলিমুদ্দিন মনে মনে ভাবে—"না আর তা হতে দেওয়া যাবে না। আর ফিরে আসবে না সেই স্বর্ণযুগ। তাদের স্বপ্নের পাকিস্তানে শিকল খুলে যাবে সমস্ত মানুষের। সেখানে গরীবের বুকের রক্ত শুষে টাকার পাহাড়ে চড়ে বসতে পারবে না বাখিলের দল......

কিন্তু ফতেশা পাঠানেরা কি তাই চায়। জীবনের সমস্ত অসত্য—শোষণ মিথ্যা, অন্যায় সব না-পাক্‌কে বর্জন করে এরা কি কামনা করে সেই সত্যিকারের পাকিস্তান ?"

অথচ এই জমিদারশ্রেণীর পূর্বপুরুষেরা, নবাব জমিদাররা অনেকেই বৃষ্টি না হলে পাছে চাষার কষ্ট হয় এজন্যে পুকুর কাটিয়ে ছিলেন বরিন্দের চারিদিকে। আর এখন, নেবার কুটুম সব একটা আধলা দেবার বেলা কেউ নেই।

"অথচ প্রজাকেই যদি না বাঁচালো, তাহলে কিসের জমিদার ? আর তা ছাড়া ফসল ভালো হলে জমিদারেরই তো লাভ। বাকী-বকেয়া কিছু পড়ে থাকবে না প্রজার কাছে।"

আসল কথা চিরস্থারী বন্দোবস্ত-জমির সঙ্গে মালিকের পাকা বন্দোবস্ত করার মহান প্রচেষ্টারই চরম প্রহসন এটা। জমিদার বুঝল খালি নিজের স্বাথ,' প্রজার মঙ্গল বিধান ও জমির উন্নতির কোনও দায়িত্ব রইল না। লর্ড কর্ণওয়ালিশ যে মনে করেছিলেন এর ফলে জমিদাররা "Will exert themselves in the cultivation of their lands upon the certainty that they will enjoy exclusively the fruits of their own good management and industry". সে কল্পনা আর বাস্তবায়িত হল না।

প্রজা ও জমির প্রতি জমিদারের এই ঔদাসীন্য এবং শোষণশীল মনোভাবই জমিদারিপ্রথার বিরুদ্ধে প্রজা বিক্ষোভকে ধূমায়িত করে তুলেছিল, যার অপরিহার্য পরিণতি জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ।

বাংলাসাহিত্যের সেকাল ও একালের বিভিন্ন উপন্যাস—ছোটগল্প নাটকে আমরা সামন্ততন্ত্রেরও সেই বিবর্তন লক্ষ করেছি। জমিদারি অর্জনের ইতিহাস থেকে শুরু করে জমিদারি উচ্ছেদ পর্যন্ত সামন্তদের ইতিহাসে যে উত্থানপতন ঘটেছে—প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত তারই নাম দিয়েছি সামন্ততন্ত্রের সেকাল ও একাল।

যদিও বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন লেখকের নানা রচনায় এর বিস্তৃত ইতিহাস বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে—বিভিন্ন চরিত্র কিংবা কাহিনীর ও সংলাপের মধ্যে। তথাপি সেগুলিকে সংগ্রহ করে আমি একটি ধারাচিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছি এবং সমস্ত গল্প ইতিহাসের মধ্য থেকে একটিই প্রবণতা লক্ষ্য করেছি—সে হল সামন্ততন্ত্রের অর্জন বা উদ্ভবের মূলেই আছে অনেক রক্তপাত, অনেক লুন্ঠন, অনেক শোষণ, সেই শোষণের দ্বারা অর্জিত ঐশ্বর্যকে অনেক জমিদার—বিদ্যালয়, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, জলাশয় প্রভৃতি জনহিতকর কর্মে ব্যয় করে পাপের কিছুটা লাঘব করবার চেষ্টা করেছে। ইতিহাসে তাঁরাই দানশীল প্রাতঃ-

স্মরণীয় জমিদাররূপে বিশেষিত। কিন্তু সরকারী রাজকোষের চাহিদা মেটাতে এই জমিদারশ্রেণী যখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে তখন প্রজাদের উপর ইচ্ছামত শোষণ চালিয়েছে আর্থিক অনটন দূরের আশায়।

এর পরে আমরা দেখেছি জমিদারি রক্তের মধ্যেই বেঁধেছে সংঘাত অর্থাৎ জমিদারবংশের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসেছে বিদ্রোহী বংশধর যে ক্ষেপিয়ে তুলেছে প্রজাদের শোষণের বিরুদ্ধে। প্রজাবিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে কিংবা জমিদার হয়েও নিজের বিরুদ্ধে প্রজাদের দিয়ে মামলা ঋজু করিয়েছে। অথবা জমিদার পিতার বিরুদ্ধে অথবা ভ্রাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েচে পুত্র অথবা ভ্রাতা। যেন 'থিসিসের' পরেই 'এ্যান্টিথিসিস'। আবার কখনও একই জমিদারের মধ্যে দ্বৈতসত্ত্বার দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে একদিকে—জমিদারি অভিমান, অন্যদিকে গভীর প্রজা দরদী হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। প্রগাঢ় দেশপ্রেমের অগ্নিশিখাতে অবশেষে জমিদারি দম্ভের স্তম্ভগুলো ভস্মসাৎ হয়েছে। জয় হয়েছে মানবতার।

এর পরবর্তী স্তরে আমরা দেখেছি, যে প্রজাবিক্ষোভ ধূমায়িত হতে শুরু করেছিল, তা প্রত্যক্ষ রূপ নিতে শুরু করল। অপর দিকে গণচেতনার উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতশ্রেণীর শোষণের উচ্ছেদ দাবী করা হল। স্বাধীনতা এল। উচ্ছেদ হল সেই অতীতের সামন্তশাসনের। অতীত আভিজাত্যের গৌরবদীপ্তির স্মৃতির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কেউ কেউ। আবার অনাগত দিনের শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নে বিভোর হলেন অনেকেই।

কিন্তু শোষণের শেষ হল কি? জমিদারের অত্যাচার জমিদারি উচ্ছেদের পর রূপ নিল পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণীর মধ্যে—প্রজাউৎপীড়ন রূপ নিল শ্রমিক শোষণের মধ্যে। পরবর্তী আলোচ্য উপন্যাস 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর' মধ্যে এই নবতম শোষণের প্রতিরূপ দেখতে পাওয়া যাবে।

অতঃপর আবার লালমাটির প্রসঙ্গে আসা যাক। খাজনা না দেওয়া তীরশানানো প্রজাদের নেতা স্কুল মাস্টারকে বাগে আনবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ক্ষেপে উঠলেন ফতেশা। তার ওপর রয়েছেন কুমার ভৈরবনারায়ণ, তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশেষে আমরা দেখেছি ফতেশার স্বার্থ এক হয়ে গেছে ভৈরবনারায়নের স্বার্থের সঙ্গে। একই 'জমিদারি বাঁচাওয়ে'র লড়াইয়ে দুজন সামিল হয়েছেন। আমাদের সমাজ, হিন্দু জমিদার শাসিত এবং হিন্দু জমিদারের মুসলমান প্রজাপীড়ণের ভিত্তিতেই একদিন গড়ে উঠেছিল মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষ। এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, অর্থাৎ ক্ষমতালোভী জমিদার তিনি হিন্দুই হোন বা মুসলমানই হোন তিনি প্রজাসাধারণের উপর সমান অত্যাচার চালান। সে কথা প্রমাণিত

হয়েছে ফতেশা এবং ভৈরবনারায়ণের আচরণে। ফতেশা তাঁর স্বজাতি মুসলমান প্রজাদের উপর শোষণ চালাতে যেমন পিছ পা নন, তেমনি নন কুমার ভৈরব নারায়ণও। তাঁর প্রজারা হিন্দু হলেও সমান অত্যাচারিত।

অবশ্য লেখকের মতে বিদ্রোহী প্রজা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একদিন জাগবে সর্বাত্মক শোষণের বিরুদ্ধে। ফতেশার উক্তিতে তারই স্পষ্ট আশঙ্কা ফুটে উঠেছে। তাই সে বলেছে "আসুন এক জোট হই আমরা। নিজেদের মধ্যে মামলামোকদ্দমা, লাঠালাঠি, হিন্দু-মুসলমান—এগুলো এমন কিছু বড় ব্যাপার নয় যে আপনার আমার কারুরই তা গায়ে লাগবে।"

"কিন্তু প্রজা ক্ষেপাবার ফল বুঝতে পারছেন। দুদিনে ওলটপালট করে দেবে। তখন হিন্দুও থাকবে না মুসলমানও থাকবে না। সব শালা এক হয়ে জমিদারের ঘাড়ে লাঠি ঝাড়তে চাইবে।" প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার কুমার ভৈরবনারায়ণ ও ফতেশার কথার প্রতিধ্বনি করে বলে—"আপনি তৈরী হোন শাহু, আমিও তৈরী। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেব। দুটোর না হলে দুশোর মাথা নামিয়ে দেব।" অতঃপর দুই জমিদারের রক্তে সেই চিরন্তন শোষণের উল্লাস উদ্দাম হয়ে ওঠে প্রজা শাসনের নতুন উৎসাহে। তাই ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে শাহুকে এক জোটে আসতে দেখে অবাক হল না আলিমুদ্দিন মাস্টার। তিনি বুঝলেন— 'আজ দুদিকে দু দলকে জোড় বাঁধতে হবে। শোষক আর শোষিতের সমস্ত স্বার্থ দুটি দলেই ভাগ হয়ে গেছে আজকে। এই নিয়ম, এই ইতিহাস।"

লালমাটিরই পরবর্তী অধ্যায় যেন 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠি'। সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসের পৃষ্ঠা এক্ষণে উল্টে গিয়ে আর এক নূতন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। সে হল সম্রাটের সঙ্গে শ্রেষ্ঠির সংঘর্ষ। এ লড়াই জমিদারে জমিদারে নয়—ফতেশা আর ভৈরব-নারায়ণে নয়—এ হল দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার শেষ অধঃস্তন পুরুষ কুমার বিশ্বনাথের সঙ্গে শ্রেষ্ঠি লালা হরিশরণের।

সাধারণতঃ দেখা যায় বাংলাসাহিত্যে যেখানে সামন্ততন্ত্রের প্রাধান্য দেখানো হয়েছে, কাহিনীর পটভূমি সেখানে হয়েছে একান্ত গ্রামকেন্দ্রিক। এই গ্রাম-জীবনের সামন্তশাসনাধীন বিভিন্ন ধরনের ভূমিব্যবস্থার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন—বিভিন্ন লেখক, তার অবস্থাবিশেষে। বঙ্কিমের রচনায় গ্রামে জমিদারের শাসনাধীনে প্রতিষ্ঠিত ভূমিব্যবস্থার ইঙ্গিত আছে। শরৎসাহিত্যে ভালমন্দ দুই শ্রেণীর জমিদারদের অধীনস্থ গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন বাস্তব চিত্র বর্ণিত। তারাশঙ্করের রচনায় গ্রামজীবনকে দেখানো হয়েছে বিলীয়মান সামন্ততন্ত্র ও সমাগত বণিকতন্ত্রের আলোড়ন ক্ষেত্র হিসাবে। তাঁর রচনায় বণিক সভ্যতার

হাওয়া এসে গ্রামজীবনে লেগেছে—এই হাওয়া নগর সভ্যতার হাওয়া। গ্রামে গ্রামে জ্বলছে বিজলীর আলো। গ্রামের চাষীর ছেলেরা শহরে বন্দরে কল-কারখানায় ছড়িয়ে পড়ছে।

সামন্ততন্ত্রের মূলভিত্তিই হল গ্রাম, আর বণিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হল নগর। বণিকশক্তি কিভাবে সামন্তদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও প্রজাসাধারণের অসহযোগিতার সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত গ্রামখানিকে কুক্ষিগত করে—রজতচক্রের বিনিময়ে বড় বড় কলকারখানা বসিয়ে, শান্তির নীড় গ্রামের চাষের জমিগুলোকে অধিকার করে—ইতিপূর্বে কালিন্দী ও দুইপুরুষ উপন্যাসে তার আভাস পাওয়া গেছে। কৃষিজীবী প্রজারা শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। টাকার বিনিময়ে জমিদার বণিকের হাতে সাগ্রহে তুলে দিয়েছেন তাঁর তালুকমুলুক, নতুবা সরকারী খাজনার দায়ে তাঁর সম্পত্তি লাটে উঠবে।

'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে লেখক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে চিত্র এঁকেছেন তা সামন্তশাসনের অবসান ও বণিক শাসনের অভ্যুত্থান সূচিত করে এবং একের অবক্ষয় ও অন্যের উত্থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি উভয় সমাজের চরিত্রতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। সেই হিসাবে কুমার বিশ্বনাথ সম্রাট বা সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ আর লালা হরিশরণ শ্রেষ্ঠী সমাজের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন। সামন্তরাজাদের একদিন সুদিন ছিল—ফলে ঐশ্বর্য বলদীপ্তির সঙ্গে তাঁদের অহমিকা, আভিজাত্য গৌরব, সুরা ও সাকীর প্রতি অত্যুগ্র আসক্তি চমৎকার খাপ খেত। কেবল তাই নয় —ঐ বিলাস উপকরণগুলি জমিদার চরিত্রের ভূষণস্বরূপ ছিল।

কিন্তু আজকের মজা দীঘি আর ভগ্ন দেউলে, ভাঙ্গা সিংহদ্বার আর জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ডে, আকণ্ঠ ঋণের ভারে অবনত জমিদারির মালিকের পক্ষে সে দম্ভ শোভা পায় না। সকলে যেমন জানে, তিনি নিজেও জানেন যে তাঁর অহমিকা কত অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু তবু সেই বংশধারায় চিরন্তন যে জমিদারি রক্তপ্রবাহ ছুটছে তাকে তো অস্বীকার করা যায় না। তাই সাময়িকভাবে দুর্বল হতোদ্যম হয়ে পড়লেও সেই জমিদারি চাল, তার শূন্যগর্ভ দম্ভ, তার লালসা, তার হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেশাকে ভুলতে পারেন না তাঁরা। তাই এই বিরোধী পক্ষ থেকে এক-একটি আঘাত খেয়ে তাঁরা ফণা তুলে দাঁড়ান। রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার শেষ অধঃস্তন পুরুষ কুমার বিশ্বনাথের জমিদারি লাটে চড়লেও তিনি ভোলেন না তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার বংশধর। তাঁর পূর্বপুরুষ কুকুরের বদলে বাঘ পুষত। ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁর পূর্বপুরুষ অতুল বৈভব ও বিস্তৃত জমিদারি রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটি ভুলে যান সামন্ততন্ত্রের অবসানের মূল কারণ কি ছিল? কেন রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার বিস্তীর্ণ জমিদারি কালে কালে সীমিত হয়ে পড়ল? লেখক তার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন শ্রেষ্ঠী চরিত্রের সঙ্গে তার বৈপরীত্য দেখাতে গিয়ে।

আসল কথা, কুমার বিশ্বনাথ যেগুলিকে জমিদার চরিত্রের গর্ব মনে করতেন সেগুলিই ছিল সামন্ততন্ত্রের পতনের মূল কাবণ। শক্তিমদমত্ততায় জমিদার কখনও প্রজাদের মানুষ জ্ঞান করতেন না—বিদ্রোহী প্রজার দাবীর কথা না শুনে তাদের দমন করতেন জঘন্য অত্যাচারের দ্বারা। একদিকে অত্যাচারবৃত্তি অন্যদিকে মদের নেশা ও নারীদেহের প্রতি আসক্তি। যতই বাঘ পুষুন না কেন সুরা ও সাকীর নেশায় তাঁদের সুবুদ্ধি ও কর্মক্ষমত্য লোপ পেত। সুন্দরী বাঈজীর পায়ে, বিলাসের স্রোতে অজস্র অর্থ ব্যয় করে চলতেন তাঁরা। এখনও জমিদারের নীল রক্তে সে খেয়াল তেমনি বিদ্যমান কেবল অভাব অর্থের। তাই প্রতাপান্বিত রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার মত জমিদার যেখানে সুন্দরী সূরয় বাঈয়ের নৃত্যের নেশায় মত্ত—তাঁর বংশধর ওঁরাও রমণী কিংবা কামারদের ভাগী কামিনীর মধ্যে সেই জমিদারি লালসার চরিতার্থ করেছেন।

এই বিলাস-ব্যসন, অমিতব্যয়িতা, অহমিকা এবং প্রজাগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাবের কারণেই সামন্তশ্রেণী শেষ পর্যন্ত জমিদারি রক্ষা করতে পারেন নি।

ঠিক তার বিপরীতভাবে বলা যায়, বহিরাগত এবং অত্যন্ত সামান্য বৃত্তিজীবী অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠীরা একদিন সামন্তরাজদের চোখের সামনে প্রবল প্রতাপে বেড়ে উঠতে থাকে। তাদের রৌপ্য মুদ্রার ঝন্‌ঝনার কাছে চাপা পড়ে যায় সামন্ত-রাজ্যের দম্ভোক্তি—তাদের নগরপত্তনের ঐশ্বর্যে ঢাকা পড়ে যায় মজা দীঘি আর জীর্ণ দেউল। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। বোঝা যায় লক্ষ্মী এখন সামন্তদের অর্থকোষ শূন্য করে বসেছে শ্রেষ্ঠীর ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে। লালা হরিশরণ সেই শ্রেষ্ঠীসমাজের প্রতিনিধি। তার পূর্বপুরুষ রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার জমিদারিতে সাহসের কাজ করত। কিন্তু আজ লালাজীকে সকলে এক ডাকে চেনে। স্বয়ং গভর্ণর তাকে খাতির করে। টাকার জোরে সে ছিনিয়ে নেয় কুমারদহের প্রজাদের। কিন্তু এসব সম্ভরের মূলে রয়েছে শ্রেষ্ঠী চরিত্রের তৎপরতা। তারা প্রথমতঃ মিতব্যয়ী। অজস্র টাকার মালিক লালা হরিশরণ এখনও বিলাসে অর্থ ব্যয় করে না। বাইরে থেকে দেখলে তার মধ্যে বড়লোকী চাল দেখা যাবে না। যদিও সে নবীপুরের নূতন শহর গড়ে তুলেছে এবং সেখানে তার বিরাট প্রাসাদ, তার আরামের ব্যবস্থা কিছু কম নয়—তবু

হরিশরণ তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নিজে ধান মাপেন। তার চেয়েও বড় কথা তাঁদের সহিষ্ণুতা এবং তুচ্ছ সম্মান বোধ নিয়ে অহেতুক মাথাঘামানো সম্পর্কে তাঁদের স্বাভাবিক বীতরাগ। এর কারণ জন্মসূত্রে তাঁরা কুলীন নন। রক্তে তাঁদের কৌলীন্য নয়—কৌলীন্য অর্থসম্পদ। সংসারে তারা অর্থকেই পরমার্থ জেনেছেন—এবং এই অর্থসংগ্রহের ও অর্থসংরক্ষণের জন্য তাঁরা মানুষের অনেক অপমান হাসিমুখে হজম করতে পারেন। ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের কাছে তাই বিনয়ের অবতার হয়ে নিজেকে গরীব প্রমাণ করতে তিনি দ্বিধা করেন না। রাণীজী অপর্ণার মুখে তাঁকে চাকর সম্বোধনের পরও লালা হরিশরণের মুখের শিষ্ট হাসি মুছে যায় না। আর ধ্বংসোন্মুখ জমিদারির শেষ কুলতিলক কুমার বিশ্বনাথের শূন্যগর্ভ দম্ভের তিনি প্রতিবাদ করেন না। তাকে অর্থসাহায্য দিয়ে নিজে পূর্ব-পুরুষের কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করছেন—এমনি বিনয় বচনে তাকে তোষামোদ করেন। কিন্তু বাইরে তোষামোদ, চাটুকারিতা ও শিষ্ট হাসি বজায় রেখেও তলে তলে কুটিল চক্রান্ত ও আত্মবিস্তারের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। অর্থের লোভ দেখিয়ে বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে অবাধ্য করে তুলেছেন তার প্রজাদের। এই ভাবে সোনাদীঘির মেলাকে কেন্দ্র করে শেষ বাজী জিততে চাইলেন হরিশরণ অর্থ দিয়ে বংশকৌলীন্যকে ঢাকা দেওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টায়। কুমার বিশ্বনাথ পরাস্ত। সামন্ত গৌরবের শেষ শিখা নিভে গেল শ্রেষ্ঠীর পদতলে। কিন্তু সেই সঙ্গে জেগে উঠল অন্য মানুষেরা—যারা চিরকাল একই দুর্ভাগ্য ভোগ করেছে—কি সামন্ত কি শ্রেষ্ঠীর শাসনে পেয়েছে শুধুই শোষণ আর অত্যাচার।

তাদের জীবনের দাম কেউ দেয় নি। যে জমিকে কেন্দ্র করে এদের জীবন সেই জমির প্রতি মন দেন নি মালিকেরা।

তাই তো অপর্ণা শেষ পর্যন্ত বলেছে কুমার বিশ্বনাথ এখনও বাঁচতে পারে যদি সে শেষ চেষ্টা করে দেখে। একটিই মাত্র উপায় আছে। সে কথা অপর্ণার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে—জমিদারি বিলোপের পিছনে ছিল সেইটিই প্রধান যুক্তি। অপর্ণা বলেছে—"কেন তুমি এ কথা ভুলতে পারো না যে তিনশো বছর আগেকার পৃথিবী আজ সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিয়েছে? এ যুগ লালা হরিশরণের। কোনো অস্ত্র, কোনো রাজার ক্ষমতা নেই আজ তাদের হারিয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর চারি-দিকে তারা মাকড়সার মতো জাল ছড়াচ্ছে, গ্রাস করে নিচ্ছে রাজাকে, গ্রাস করছে প্রজাকে। এদের লোভের মুখে কারো রক্ষা নেই—রাজারও নয়।

আজ যদি বাঁচতে চাও, তা হলে তিনশো বছর আগেকার ইতিহাস ভোলো। নেমে এস তাদেরই দলে।" "তিনশো বছরের ইতিহাস অর্থাৎ জমিদারদের সেই

দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজত্বকালের ইতিহাস। বিশ্বনাথের পূর্বপুরুষ দেবীকোট রাজবংশের অনমনীয় আগ্নেয়প্রতাপ আর অতুলবৈভব। সেই শক্তি দম্ভ আজকের অন্তঃসারশূন্য জমিদারের পক্ষে শূন্যকুম্ভের আস্ফালনের মতই শোনায়। আবার এই জমিদার-শ্রেণীর দুর্বলতার সুযোগেই শ্রেষ্ঠী সমাজ মাথা তুলে দাঁড়ায়। লাটের কিস্তি দেবার জন্য জমিদার বিশ্বনাথকে ঋণ করতে হয় লালাজীর কাছে। আর্থিক দৈন্যাবস্থার সুযোগে শ্রেষ্ঠী আধিপত্য বিস্তার করে। জমিদারের নীল রক্তের দম্ভ স্তিমিত হয়ে যায়। প্রতিশোধের অস্ত্র তাঁর নিজের বুকেই ফিরে আসে। লালাজীর টাকার লালসায় প্রজারা ভুলে যায় জমিদারের প্রতি সহজ কৃতজ্ঞতা। কৃষিজীবী প্রজারা পরিণত হয় শ্রমিক শ্রেণীতে। গ্রামীণ সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে নগর সভ্যতার পত্তন হয়। হরিশরণ লালা গ্রামে বাস করলেও বিবেকানন্দ রোডে তার মস্ত বাড়ী। তা ছাড়া নবীপুরেও তিনি যে গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেছেন তা প্রায় ছোট-খাট শহর হয়ে উঠেছে।

এত সহজেই কেন প্রজাদের বশীভূত করা যায় তার কারণ, প্রজাদের সহানুভূতি ও ভালবাসার বন্ধনকে মজবুত রাখার মত কোনও চেষ্টাই তাঁরা করেন না। 'রাজবাড়ী' ও 'রাজা' শূন্যগর্ভ এই নাম ও রাজ্যহীন রাজবাড়ীর সেই 'ইমেজ' বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। এই কারণেই হয়তো প্র. না. বি. মন্তব্য করেছেন—"জমিদারদের ধ্বংসের মূলে তাহাদের দুর্বুদ্ধি।"

একদিন যখন শ্রেষ্ঠী হরিশরণ লালার আবির্ভাব হয় নি- তখন রাজ্যহীন রাজার নাম শোনামাত্র কপালে হাত ঠেকিয়েছে বিমূঢ় প্রজার দল। কিন্তু শ্রেষ্ঠী, শকুনের মত তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে জমিদারের আওতা থেকে নিজের আওতায়। জমিদারির একখানার পর একখানা মহাল দেনার দায়ে বিকিয়ে যায়, লাটের খাজনা দেবার জন্য ঘোড়ার সহিস রামসুন্দর লালার বংশ-ধরের কাছে গিয়ে থাকে—নতজানু হয়ে দাঁড়াতে হয় তার শক্তি আর পৌরুষের দম্ভকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী গল্পে' সূচনা থেকেই সেই দ্বন্দ্বের সূত্র পাত এবং পরিসমাপ্তি হয়েছে এই নূতন জগতের ইঙ্গিত দিয়ে। অবশেষে শ্রেষ্ঠীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে জমিদারকে স্থান করে নিতে হয় জমির মধ্যে, প্রজাদের মধ্যে।

লালাজির বিরুদ্ধে জমিদারের এক নতুন সংগ্রাম। বিনা খাজনায়, বিনা তোলায় জমিদার মেলা বসিয়েছেন। উদেশ্য প্রজারা ইচ্ছামত আনন্দ ভোগ করুক। অপর্ণা বলেছে আজ জমিদার একা কেন? কেন সে পারে না লালাকে জয় করতে? আসল কথা তার পূর্বপুরুষের শক্তির গৌরব আজ আর জমিদারের

কাজে শক্তি যোগায় না—বরং তাকে দুর্বল করে—কারণ সেই অহমিকা বোধই তাকে প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। অথচ প্রজাশক্তিই জমিদারের প্রধান শক্তি। আজকের জমিদারকে এ কথাটাই সর্বদা মনে রাখতে হবে এবং তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। অপর্ণার উক্তিগুলো এখানে উদ্ধৃত করা যাক। অপর্ণা বিশ্বনাথকে বলেছে—

"তুমি জমিদার, জমির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। আর সেই জমির মালিক যারা—যারা জমি চাষ করে, তারাই তো তোমার আপনার লোক। তাদের জোরেই তোমার জয় হবে।"

কিন্তু আজকের জমিদারের সেই প্রজাশক্তি নেই কেন? সে কথার উত্তরও অপর্ণা দিয়েছে। বলেছে—"তিনশো বছর ধরে ওদের অস্বীকার করে এসেছ তোমরা। ওদের কাছ থেকে শুধুই নিয়েছ, এতটুকুও ফিরিয়ে দাও নি। আজ ওদের কাছে নেমে এস একবার ওদের স্বীকার করে নাও। দেখবে আর কোন ভাবনা নেই। মনে রেখো ওদের আপনার জন যদি কেউ থাকে—তাহলে সে জমিদার, জমিদারের সঙ্গেই ওদের হাত মিলবে সকলের আগে। আর মহাজন। সে যে ওদের কতখানি শত্রু—তা বোঝবার দিনও ওদের আসছে।"

শেষ পর্যন্ত কুমার বিশ্বনাথকে আচ্ছন্ন করে অপর্ণার ব্যক্তিত্ব প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে লালা হরিশরণের। অপর্ণা নিজের আদর্শকে কার্যতঃ রূপ দিতে চেয়েছে। তার ফলে লালা হরিশরণ স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছে প্রজারা আবার জমিদারের অধীন হয়ে পড়েছে—কারণ জমিদার এখন নির্ভর করছেন প্রজাশক্তির উপর। তখন হরিশরণ শঙ্কিত চিত্তে অনুভব করলেন—"কুমার বিশ্বনাথের সঙ্গে লড়াই করা শক্ত নয়, কিন্তু তাঁর প্রজাদের সঙ্গে জনতার সঙ্গে?"

অপর্ণার মধ্যে লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে আদর্শবাদ রেখেছেন হয়তো তা সামন্তশ্রেণীর একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত ছিল—সামন্তপ্রথা হয়তো তাহলে চিরকালের জন্য মুছে যেত না। কিন্তু অপর্ণার কল্পনা কল্পনাই থেকে গেছে বাস্তবে রূপ লাভ করে নি। তাই সম্রাট বনাম শ্রেষ্ঠীর সংঘর্ষে সম্রাটের বনিয়াদ অচিরে ভেঙ্গে পড়েছে।

এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সামন্তশ্রেণীর ভবিষ্যৎ কি হতে পারত, বণিক সমাজের কাছে নিজেদের বিকিয়ে না দিয়ে কিভাবে তারা জনগণের সমর্থন ও ভালবাসার ওপর নিজেদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় রাখতে পারত—তার আশাবাদ যদিও ঘোষিত হয়েছে কিন্তু সামন্তপ্রথার জয়গান তিনি করেন নি। তার পতনে বিষাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করেন নি। তবে তাঁর মতে বণিক

সভ্যতার চেয়ে তবু সামন্তপ্রথা ভাল ছিল—অবশ্য যদি তা জনগণের ওপর নির্ভরশীল হত, কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। কারণ শোষিত প্রজার চোখে সম্রাট বা শ্রেষ্ঠী দুই-ই সমান।

দুইয়েরই বনিয়াদ প্রজাশোষণের ভিত্তিতে। জনগণের মধ্যে নেমে না এলে তাঁদের জানা যায় না। রাজ অবরোধের মধ্যে বন্দী থেকেও রাণীজী অপর্ণা বিশ্বনাথকে সেই আলোর আভাস দেখাতে পেরেছিল—কারণ একদিন সে ছিল জনগণেরই অংশ। এই গল্পে অপর্ণার যে ভূমিকা তা ইতিপূর্বে তারাশঙ্করের 'কালিন্দীর' কিংবা 'ধাত্রীদেবতার' অহিন অথবা শিবনাথের মধ্যে, শরৎচন্দ্রের দ্বিজ-দাসের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। বৈপ্লবিক চেতনা সেখানে বাইরে থেকে প্রেরণারূপে আসে নি—সৃষ্টি হয়েছে তাদেরই সামন্তরক্তের স্বতঃবিরোধিতার মধ্যে। আরও আধুনিক কালে এই স্বতঃবিরোধকে আরও জটিল, মনস্তত্ত্বের আকারে রূপ দিতে পেরেছেন লেখক বিমল মিত্র, তাঁর 'আসামী হাজিরের' নায়ক সদানন্দের মধ্যে। জমিদারবংশীয় হয়েও যাঁরা নিজেদের রক্তকে শোধন করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন—জমিদারি বৈভবের বেড়াজাল থেকে নিজেদের মুক্ত করে। কারণ সেই জমিদারির অর্থ যে শুধুই বঞ্চনা আর শোষণের দ্বারা অর্জিত তাঁদের মুখে সে কথারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে। এখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অপর গ্রন্থ 'স্বর্ণসীতার' সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

'স্বর্ণসীতা' উপন্যাসের নায়িকা অনুপমা বিবাহোত্তর জীবনে যখন জমিদার পত্নী হল তখন থেকেই শুরু হল উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের চরিত্রচিত্র রচনা। সোমনাথও একজন দুর্ধর্ষ জমিদার। জমিদার বংশের বদান্যতাটুকু তার মধ্যে বর্তায় নি—কিন্তু অত্যাচারী ও শোষণের রক্তবীজেরা তার রক্তে বাসা বেঁধে আছে। এই ধরনের ক্ষয়িষ্ণু জমিদারশ্রেণী তাই আরও ভয়ঙ্কর। সোমনাথের চরিত্রের সেই দিকটিরই বর্ণনা দিতে চেয়েছেন লেখক। এখানেও অবশ্য বরেন্দ্রভূমের অতীত যুগের রাজতন্ত্রের বিস্তৃত ঐতিহ্যের ইতিহাস রচনা করেছেন তিনি। গৌড়ের হিন্দুযুগ। সিংহাসনে পঞ্চ গৌড়াধীশ রাজন্য কুল মুকুটমণি—পরম ভট্টারক সেন কুল কমল বিলাস নৃপতিবৃন্দ।

সে যুগের রাজারা ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন—সাধ্যায়শীল বেদজ্ঞ উপচারে উপহারে কৃতার্থ করেন এবং কৃতার্থ হন। তাম্রপট্টে, স্বর্ণপট্টে তাঁদের দান-শীলতার খ্যাতি অক্ষয় হয়ে থাকে। পৌণ্ড্রবর্ধনের তথা উত্তর বাংলার অনুর্বর ভূমিখণ্ডকে শস্যশ্রীতে মণ্ডিত করবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন জলাশয়, ধূ ধূ প্রান্তরের বুকে রোপণ করেন বটবৃক্ষ। তারপর বহু যুগ অতিক্রান্ত ইতিহাসের অনেক জল

গড়িয়ে গেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান যুগ পার হয়েছে। সেই উত্তর বাংলা এখন জীর্ণ বিধ্বস্ত। তবু এর সম্পদের প্রাচুর্য এখনও আছে—বিশেষ করে মাছ। ছোট ছোট অসংখ্য খরস্রোতা নালা দিয়ে যখন বর্ষার জল তীব্র বেগে নামে তখন ভেসে আসে মাছের স্রোত। হরেক রকমের অজস্র মাছ। এই নালাগুলোর স্থানীয় নাম ডাঁড়া। এই বিলের কথা লালমাটিতেও লেখক উল্লেখ করেছেন। এই নালার মাছের বর্তমান সত্বাধিকারী সম্পর্কে ধারণা দেবার চেষ্টা করে তিনি বলেছেন—"এত মাছ অথচ বেওয়ারিস বললেই হয়। যাদের জমিদারি-শুকনোর সময় তারা ছোট ছোট বিলে জলকর বসায়। পশ্চিম থেকে আমদানি বিন আর মালা সম্প্রদায় ভেসাল ফেলে মাছ ধরে। কিন্তু এই সময়টা ( বর্ষার সময় ) সদাব্রত জোভার মাছের ওপর জমিদার লোভ করে না। তার অনেক আছে। চেক আছে, দাখিলা আছে, দোর্দণ্ডপ্রতাপ নায়েব গোমস্তা আছে, সার্টিফিকেট আছে। কারো কারো লাঠিয়ালও আছে। সব দিক থেকে নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার ব্যাপারে তার ত্রুটি নেই। কিন্তু এই বিশেষ সময়টা সে প্রসন্ন উদারতায় ডাঁড়ার ধারে আর লাঠিয়াল বসায় না। সম্বৎসরে যাদের পেটের ভাত জোটেনা, এই সময় মাছ খেয়ে তারা পেট ভরায়।"

তারপরেই লেখক আবার পূর্বানুবৃত্তি করে বলেছেন—কিন্তু দিন বদলে গেছে। যারা সাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মত্র দিত, ভূমিদান করত, তাদের বংশধরেরাআজ ভুলতে বসেছে সামন্ততন্ত্রের বিরাট আভিজাত্যকে। ধনতন্ত্রের সংঘাতে দিনের পর দিন তারা ক্ষীণপ্রাণ হয়ে আসছে আর সেইজন্যে আত্মরক্ষার অন্তিম চেষ্টায় আঁকড়ে ধরেছে তার ধনতন্ত্রের বিকৃত লোলুপতাগুলো। অবশিষ্ট জমিদারির যেটুকু আছে তার ভিতর থেকেই যতখানি পারে চুষে নিংড়ে নিংড়ে নিতে চায় তারা। ফলে এখন এই ডাঁড়ার মাছগুলোর ওপরেও নজর পড়েছে তাদের। কেন এত মাছ বারোভূতে লু'টে খাবে কেন? সে সকল যাবে অভুক্ত প্রজাদের পেটে? অথচ এই মাছ যদি বিক্রি করা যায়, পাঁচশো টাকা ঘরে আসতে পারে এবং সেই ডাঁড়া মহালদারদের কাছে ইজারা দিয়ে পাঁচশো টাকা নজরানার ব্যবস্থা হয়ে গেছে—জমিদার সোমনাথ দত্তের।

জমিদারের ঐশ্বর্য শৌর্যবীর্য ও আভিজাত্যের দম্ভের সঙ্গে অত্যাচার এবং সুরা নারীর বিলাসিতার যে চিত্র আমরা পেয়েছি ল্যলমাটি ও সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর ভৈরব-নারায়ণ এবং কুমার বিশ্বনাথের চরিত্রে—সোমনাথ দত্তের মধ্যে সেই কামনাসক্তি ও বিলাসিতার দিকটি কিন্তু অনুপস্থিত। সোমনাথ দত্ত অত্যাচারী কিন্তু ব্যাভিচারী নয়। অর্থাৎ সামন্তচরিত্রের দুর্ধর্ষ পশুশক্তির দিকটাকেই ফুটিয়ে তুলতে

চেয়েছেন লেখক। সম্ভবতঃ সোমনাথ আরও আধুনিক কালের জমিদার। তার ঐশ্বর্যের চাকচিক্যময় খোলসটুকুই শুধু আছে আর আছে প্রজাশাসনের অমোঘ শক্তি। যে শক্তি ও বলিষ্ঠতাকে আধুনিকা তরুণী অনুপমা পৌরুষের প্রকাশ বলে প্রথমে ভুল করেছিল। তারই প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হয়েছে জীবন দিয়ে। বিবাহের পর কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছিল সোমনাথের পশুবল শুধু দমন কার্যেই ব্যয়িত। পশুশক্তির অধিকারী বলেই কোনও সূক্ষ্ম রসবোধ, শিল্পসাহিত্য সঙ্গীতের প্রতি সামান্যতম অনুরাগও তার জন্মায়নি। হয়তো সেই কারণেই অনুপমা ও তার সৌন্দর্যমাধুর্য ও সুকুমার অনুভূতি সবকিছু মিলিয়ে সোমনাথের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। সোমনাথ ঘোড়া বশ করার চাবুকের ভয় দেখিয়ে জেদী অনুপমাকে বশ করার কথা বলে কিন্তু তার হৃদয়ের কাছাকাছি সে পৌঁছতে পারে না বা পৌঁছবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করে না।

বিবাহিতা স্ত্রীরা জমিদারদের আসবাবের মধ্যেই গণ্য হন—তাদের মনের খবর তাঁরা রাখেন না বা রাখা তাঁদের পক্ষে কলঙ্কজনক, অপরাধজনক বলেও ধরা হত। কোনও জমিদারই বিবাহিতা স্ত্রীর আঁচল ধরা হতে বাধ্য নন। কিন্তু তাঁরা অগণিত সুন্দরী বাঈজীর পায়ে আত্মসমর্পণ করতেন। সুরা ও সুন্দরীর সেবা জমিদার চরিত্রের আভিজাত্যের অঙ্গ ছিল। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর' অপর্ণার প্রতি কুমার বিশ্বনাথের আচরণ আমরা দেখেছি। বাইরের আকর্ষণই ঘরের স্ত্রীর প্রতি তাঁদের উদাসীন করেছে দেখতে পাই। যদিও রাঘবেন্দ্রের আমলের মত সুবিখ্যাত নর্তকী সুন্দরী সুরযবাঈয়ের নূপুর কিঙ্কণ আর শোনা যায় না কিন্তু তার জায়গায় ওঁরাও আর সাঁওতাল মেয়েদের নিয়ে কামনা চরিতার্থ করেছে 'লালমাটি' আর সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর জমিদারগণ। কিন্তু 'স্বর্ণসীতার' সোমনাথ সে কলঙ্কমুক্ত অথবা লেখাপড়া জানার জন্যই হয়তো তার চরিত্রের এ দোষটি অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে। যদিও সনাতন জমিদারি ঐতিহ্যের বিচারে সোমনাথ চরিত্রে এই নারী-জাতির প্রতি অনীহাকে তার চরিত্রের কলঙ্কই বলা উচিত। বাস্তবিকই সোমনাথের চরিত্রে জমিদারসুলভ নারীঘটিত দুর্বলতা একেবারেই ছিল না। অনুপমাকে বিবাহ করবার সময় একবার মাত্র তার স্বাস্থ্যের প্রতিই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। অনুপমাকে সে অবহেলা করে না তবে ধরাও সে দিতে রাজী নয়। হয়তো রসবোধের অভাবের দরুণই সোমনাথের মনে বিশ্বের কোনও নারীই রং ধরাতে পারে না। নারী-জাতির সেন্টিমেন্টাল দিক তার অসহ্য। মেয়েলীপনাটাকেই সে ঘৃণা করে। অতএব সামন্তশ্রেণীর মধ্যে পশুশক্তির প্রতীক সোমনাথের চরিত্রকে দুর্লভ-এবং একক বলা চলে। সে শুধু জমিদারের বদান্যতা ও দানশীলতাই হারায় নি—হারিয়েছে তার বিলাসিতা ও রসবোধেরও দিক।

অতঃপর এই জলকর নিয়েই বিরোধ বাধল জমিদার আর প্রজায়! প্রজাদের বিদ্রোহের পেছনে কাজ করছে দেশব্রতী অরুণ ও প্রমীলা। জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত করার সেই চিরন্তন ইতিহাস রচিত হয়েছে এখানেও।

সোমনাথের জমিদারির আওতায় যারা বাস করে তারা সাঁওতাল প্রজা। তাঁদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—"যোগ অঙ্কে এখনো তারা ঠিক দিতে শেখে নি, কাজেই জমিদারের আমলারা তাদের ঠকায়। ঠকায় মহাজনেরা। যেদিন পরিত্যক্ত বরেন্দ্রভূমি—মৃত অতীতের কঙ্কাল বুকে করে, পড়েছিল মজা দীঘিতে, বিশৃঙ্খল অরণ্যে আর উষর মৃত্তিকায়, সে দিন ওরাই এসে এখানে আস্তানা বেঁধেছিল। সেদিন কোনও জমিদার ওদের খাজনা চায় নি, পত্তনির জন্যে নজরানা দাবী করে নি কেউ। কিন্তু মরা মাটি যখন ওদের লাঙলের ফলায় প্রাণ পেল, যখন অনাবাদী জমিতে ফলতে লাগল আউস আমন, বোরো তখন তার সঙ্গে মানুষের লোভও এল এগিয়ে। তাই ওদের গ্রামের মাঝখানে আজ জমিদার বাড়ি আকাশে স্পর্ধিত মাথা তুলেছে।"

এই বাড়ী তৈরী করেছিলেন সোমনাথের বাবা গিরিশনাথ। বাড়ীর বর্ণনাতেও জমিদারের চিরাচরিত প্রাসাদবাড়ীর বর্ণনা। পাঁচিল ঘেরা মস্ত তিন মহলা বাড়ী। সামনে সিংহ দরজা। কিন্তু গিরিশনাথ ছিলেন ভাল জমিদার। কাব্যধর্মী ছিল তাঁর মন। তাঁর সাঁওতালপ্রীতিও ছিল খুব। জমিদারের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে খাজনা তিনি নিতেন। তবে খাজনার বিনিময়ে কলা মূলো তামাক বা বুনো শূয়রের দাঁত পেলেও খুশী হতেন। এই নির্বোধ অথচ সদানন্দ সরল প্রজাদের ওপর তাঁর ছিল এক ধরনের অকৃত্রিম অপত্য স্নেহ।

আসল কথা গিরিশনাথ বাস করতেন প্রজাদের মধ্যে একই জায়গায়। তাই মাটির ওপর যেমন তাঁর টান ছিল প্রজাদের সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল স্নেহের বন্ধন।

কিন্তু দূরে বাস করার ফলে প্রজা ও মাটির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই দূরত্ব গড়ে ওঠে ফলে সেখানে শোষণ ও শাসনের তীব্রতা প্রকট হতে পারে।

সোমনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সোমনাথ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তার দেশের মাটিতে আসে নি। এসেছিল প্রয়োজনের তাগিদে। তাঁর শহর জীবনযাপন, রেস, রেসিংকরি, রাইফেলের খরচ ইত্যাদি নানান প্রয়োজন মেটাতে গ্রামের জমিদারিকে শোষণ করে অর্থসংগ্রহ করতে হবে এই অভিপ্রায় নিয়েই সোমনাথ এসেছে জমিদারিতে। যেমন করে হোক চারদিকের দেনা শোধ করতে হবে তার জন্য টাকা চাই রাশি রাশি। কিন্তু এদিকে জমিদারিও রেস দিয়েছে সর্বনাশের মুখে।

হরেন এই ব্যাপারে তার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। চিরকালের গোমস্তা চরিত্র তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। এ সেই লোক যে শুভঙ্করের নামতা গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারে, কড়া ক্রান্তি কাক তিলের যোগ চক্ষের নিমেষে করে ফেলতে পারে এবং জমিদারির পক্ষে অপরিহার্য ফৌজদারী আর দেওয়ানী কার্যবিধির মূল্যবান অংশগুলো যার ঠোঁটাগ্রে।

ধূমায়মান সাঁওতাল বিক্ষোভের আভাস সোমনাথ টের পেয়েছিলেন আগেই। মহলদারকে ডাঁড়া ইজারা দেবার আগে সে কথার উল্লেখ করলে মহলদার যে ইঙ্গিত দিল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ভবানন্দ মহেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে যে কথা বলেছিল এ যেন তারই প্রতিধ্বনি। ভবানন্দের উক্তি "অস্ত্রহাতে করিয়া তফাত রহিলে—জমিদারের ছেলে, দুধ ঘির শ্রাদ্ধ করিয়াই মজবুত। কাজের বেলা হনুমান।"

এখানেও মহলদার বলেছে—"বাঙালি জমিদার বড় ডরপোক। খালি দুধ ঘিউয়ের শ্রাদ্ধ করতে পারে আর কিছু পারে না।"

কিন্তু সোমনাথ চরিত্রকে বাঙালী জমিদারের পক্ষে ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। বস্তুবাদী বুদ্ধিজীবী সোমনাথ দেহে মনে প্রচণ্ড বলশালী। প্রচণ্ড তার আভিজাত্য বোধ, যেন জনমণ্ডলের মণ্ডলেশ্বর হওয়ার জন্য ভগবানের হাড় মাস দিয়ে তৈরী।

অনেকটা ঠিক এই ধরনের চরিত্র দ্বৈরথ গল্পে উগ্রমোহনের মধ্যে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসের মধুসূদনের সঙ্গেও আছে কিছুটা মিল যদিও নারীর প্রতি দুর্বলতা উগ্রমোহন ও মধুসূদনে কিছুটা দেখানো হয়েছে। সোমনাথ সেদিক থেকেও প্রচণ্ড নারীবিদ্বেষী।

এহেন দুর্ধর্ষ সোমনাথ সৌজন্যের খাতিরে যখন সাঁওতালদের মুখপাত্র অরুণের আবেদন রক্ষার অর্থাৎ বিল ইজারা না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন তখন তাঁর নির্বাপিত রোষাগ্নিতে ইন্ধন যোগালে হরেন গোমস্তা আর ইজারাদার মহলদার। সোমনাথের শক্তিদম্ভের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে হরেন বলে বিল ইজারা না দিলে প্রজারা মনে করবে জমিদার ভয় পেয়েছেন কিংবা তিনি শক্তিহীন। জমিদারি নীতি সম্পর্কে হরেনের অভিমত—"যে জমিদার ভালো মানুষ, প্রজার কথা শোনে দয়া করে আড়ালে তাকেই ওরা ঠাট্টা করে ভীরু বলে। জুতো মারতে না জানলে ছোটলোকের শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না।"

সোমনাথের পিতা গিরিশনাথের তুলনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন—"গিরিশনাথকে চেনা কঠিন ছিল না। স্পষ্টভাষী, প্রখর মেজাজ। প্রজাদের ভালবাসতেন বটে, কিন্তু কোনদিন মাথায় পা দিয়ে চলবার সুযোগ তিনি

কাউকে দেন নি। খাজনা মাপ করেছেন, দরকার হলে চাবুকও মেরেছেন সঙ্গে সঙ্গে। প্রজারা যেমন ভালবাসত ভয়ও করত তেমনি। কিন্তু সেই তুলনায় সোমনাথ অনেক নিঃস্ব—কারণ প্রজাদের ভয় বা ভালবাসা কিছুই সে পায় নি। তাঁর সম্পর্কে মুখে যাই বলুক হরেন জানে—

"যে জমিদার প্রজাদের কাছে নেমে তাদেরই মত ছোট হতে জানে না, নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে, সাধারণের কাছে সে অনাত্মীয় অনধিকারী।" ওদিকে মহলদার—বাঙালী জমিদারের শক্তিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করে। তাঁর মতে- "বাঙালী জমিদার এমনিই পরজার ভয়ে মাথা গুটিয়ে থাকে। আমার দেশের জমিদার তো পরজাকে কাটিয়ে গঙ্গাজীমে ভাসিয়ে দিতো।"

সে আরও বলে—বাংলাদেশের জমিদারের মধ্যে জোয়ান নেই—মানুষও নেই।

বাহুশক্তির প্রতি এই ধরনের অপমানজনক ইঙ্গিত সোমনাথের পশুশক্তিকে আবার জাগিয়ে তোলে। সত্যিই তো, দেশব্রতী অরুণের সেণ্টিমেণ্টকে প্রশ্রয় দেবার কোনও অর্থ নেই। প্রজা-আন্দোলন না করে সে শ্রমিক-আন্দোলন তো করতে পারে। প্রজারা তাঁকে ভীরু কাপুরুষ অক্ষম মনে করবে—সোমনাথের পক্ষে এ অসহ্য, তাই সবকিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সোমনাথ যখন শক্তিপরীক্ষার জন্য বারুদ হয়ে উঠেছে, সেই সময় অরুণের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাতা অনুপমার অপমানের জ্বালা ও প্রতিশোধ কামনা তাতে অগ্নিসংযোগ করেছে। জমিদারি অত্যাচারের সঙ্গে প্রেমের অভিমান সম্মিলিত হয়ে কৃষকনেতা সাঁওতালপাড়ায় অগ্নিদাহ ঘটিয়েছে। জমিদারের হুকুম ও রাণীজীর হুকুম এক সঙ্গে কার্যকরী করে তুলেছে হরেন গোমস্তা।

কাহিনীর পরিণাম যদিও প্রেমতত্ত্বের বিশ্লেষণে সমাপ্তিলাভ করেছে—কিন্তু জমি, জমিদার ও প্রজাবিদ্রোহের চিত্রটিও এখানে অস্পষ্ট থাকে নি। বরেন্দ্র-ভূমের আকাশে বাতাসের মধ্যে যে সামন্তসৌরভ মিশে রয়েছে বহু অতীতকাল থেকেই, শক্তিমান সোমনাথকে আঁকতে গিয়ে, লেখক তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

# বিমল মিত্র

স্বাধীনতা উত্তরকালে অর্থাৎ জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ হবার পরও সামন্ততন্ত্রের ফসিল নিয়ে যাঁরা উপন্যাসের কারবার করেছেন বিমল মিত্র তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর সুবৃহৎ দুইখানি উপন্যাস, 'সাহেব বিবি গোলাম' এবং অধুনাতন 'আসামী হাজির' এই প্রসঙ্গে আলোচিতব্য।

এদের মধ্যে 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাসখানি কাল্পনিক হলেও কিছুটা ঐতিহাসিক উপাদান সমন্বিত। অবশ্য গল্পের প্রয়োজনেই যে তিনি প্রাচীন কলকাতার সমাজ বা জীবন আলোচনা করেছেন—তিনি ইতিহাস লিখতে বসেন নি—এ কৈফিয়ৎ লেখক ভূমিকাতেই দিয়েছেন। অর্থাৎ এর ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রমাণ নিয়ে আলোচনার অবকাশ তিনি রাখেন নি। তবে তাঁর স্বীকারোক্তির মধ্যে তিনি যে ইঙ্গিতটুকু রেখেছেন—"প্রাচীন কলিকাতার সমাজ বা জীবন আলোচনা"—বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট আলোকপাত করতে পেরেছে। কারণ সপ্তদশের শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর একটা পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রের উত্থানপতনের—ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়ে ফেলেছেন তিনি। গ্রামকেন্দ্রিক সম্পর্ক ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি সামন্তদের ক্রমশঃ নগরাভিমুখী হতে। সামন্তসমাজের সেই নগর-কেন্দ্রিক জীবনই চিত্রিত হয়েছে 'সাহেব বিবি গোলামে' বর্ণিত সেকালের কলকাতার সমাজ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে।

অতীতযুগের নগরকেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্রের আর এক দিগন্ত উন্মোচিত করেছে এই "সাহেব বিবি গোলাম।' এই বৃহদায়তন উপন্যাসে আছে শহুরে জমিদার পরিবারের বহির্মহল, অন্দরমহল এবং নীচুমহলের চিত্র। এর কাহিনী বর্তমানকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ অতীতচারী হয়েছে। কলকাতার নাম তখন 'কলিকাতা' নয়—'সুতানুটি গোবিন্দপুর'। সেইখানেই রাজত্ব করতেন বনমালী সরকারের—পূর্বপুরুষ। তাঁরই নামে 'বনমালী সরকার লেন' নামের সেই এঁদোগলি সেদিন পর্যন্ত বউবাজার স্ট্রীট আর সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ের সংযোগ সেতু হয়ে বেঁচেছিল। আর ছিল গলিটার ডানদিক জুড়ে একখানা প্রকাণ্ড বাড়ি। এর প্রচলিত নাম 'বড়বাড়ি'। পুরোনো কালের প্রাসাদ, তার ঘরে ঘরে অসংখ্য ভাড়াটে এখন। তাদের বিচিত্র কর্মবহুল অতি সাধারণ জীবনের সঙ্গে কোনও মিল নেই বড়বাড়ির—সেই জাঁকজমকের

দিনগুলোর। সেকালে শহর কলকাতার ইংরেজ কৃপাপুষ্ট জমিদারদের বিলাস আড়ম্বরের সঙ্গে গ্রাম্য জমিদারদের বিলাসিতার স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যেত। সাহেব বিবি গোলামের শহুরে জমিদারদের ছিল জুড়ি, চৌঘুড়ি, ল্যাণ্ডো ল্যাণ্ডোলেট, ফিটন আর ব্রাহাম সেই সঙ্গে ছিল চাল্লিশ দাঁড়ীর ময়ূরপঙ্খী। গ্রামের জমিদারদের সাধারণতঃ থাকত হাতী, ঘোড়া এবং পাল্কি। অবশ্য—মেয়েদের জন্য পাল্কির ব্যবস্থা যে শহরবাসী জমিদার পরিবারেও ছিল এখানে সে কথা জানা গেছে। জমিদারের কর্মচারীদের মধ্যে শহর ও গ্রামের পার্থক্য বোঝা যেত নাম ও বেশবাসের তফাতে। শহরে থাকত সোনালী রূপালী কোমরবন্ধ পরা দারোয়ান। সরকার, হরকরা হুকো বরদার ইত্যাদি।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নির্দেশে বনমালী সরকার লেন ভাঙতে এলে তার বাঁ পাশের বিরাট প্রাসাদ বাড়ীটাতেও ভাঙার কাজ করতে হয়। এবং এর দায়িত্ব পড়েছে ওভারশিয়ার ভূতনাথ চক্রবর্তীর ওপর। এই ঐতিহাসিক বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পুরানো দিনের অনেক কথাই মনে পড়ে যায়। ভূতনাথ নিজে একদিন বড়বাড়ীর জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল যখন প্রথম সে চাকরির সন্ধানে এখানে এসেছিল গ্রাম সম্পর্কিত ভগ্নীপতি ব্রজরাখালের কাছে। তাই এই প্রাসাদ বাড়ীর প্রতিটি গাঁথুনি আর ইটপাথর ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সেই অতীত স্মৃতিতে টান পড়ে যায়। 'সাহেব বিবি গোলাম' আগাগোড়াই সেই অতীত স্মৃতি মন্থন। শুধু এর পূর্বাভাস ও উপকাহিনী অংশটুকু পরবর্তী ইতিহাস।

"জমিদারবংশের রক্তের মধ্যে বিষ থাকে, তাই বহু লোকের দীর্ঘশ্বাসে জমিদার-বংশ চিরকালই অভিশপ্ত। তার ক্ষুদ্রতম অথচ বিবদমান অংশীদারদের ওপর তার স্পর্শ লাগে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ভাঙনের নির্দেশ সেই অভিশপ্ত বংশের ওপর চিরতরে যবনিকা ফেলে দেবে, এই আশ্বাসে অনেকেই প্রফুল্ল হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বিষাদবাষ্পও অগোচরে জমে ওঠে সেই ঐশ্বর্যবিলাসের কথা স্মরণ করে। কি বিলাসীই না ছিলেন বড়বাড়ীর সাহেব বিবিরা।

মেজরাণীর পুতুলের বিয়েতে ফ্রান্স থেকে মুক্তোর গহনা এসেছে। পায়রা নিয়ে মেজবাবুর মোকর্দ্দমা চলেছে ঠনঠনের দত্তদের সঙ্গে তিন বছর ধরে। সবচেয়ে নামজাদা বাঈজীদের নৃত্যগীত চলত উৎসব অনুষ্ঠানে। দাসীরাও পরত তসরের কাপড়। সদরের গেটে পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজত বিভিন্ন সঙ্কেত জানিয়ে। সেই দেউড়ি, সেই পাল্কি বেহারা, সেই তোষাখানা, সেই চাকরবাকর কালে কালে কোথায় গেল হারিয়ে।

জমিদার বাড়ীর যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা পড়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

মন্তব্য করেছিলেন "জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি ভবনের সঙ্গে বড়বাড়ির চেহারার অনেকটা মিল পেয়েছিলুম। সেকালের বনেদী বড়মানুষের সব বাড়ীই বোধ হয় মোটামুটি এক ছাঁচে ঢালা ছিল।"

ইন্দিরা দেবীর আরও আপত্তি ছিল "তিনতলার মানুষ প্রমাণ উচ্চ ঝিলমিল ঘেরা শুদ্ধান্তঃপুরের নিচে থেকে ধরে বাকি বাড়িটা অমন নরককুণ্ড বলে না দেখালে কি যথাযথ আপত্তি ছিল ?"

কিন্তু ঐ বড়বাড়ির ভেতর মহলের চেহারাই হল নগরকেন্দ্রিক সামন্ত পরিবারে অন্তঃপুরের রূপ।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী গল্পরসের বিচার করেছেন বলেই হয়তো তাঁর কাছে শ্লীলতা অশ্লীলতার দিক বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তথ্যসন্ধানীর কাছে সেই নরককুণ্ডের বর্ণনার মধ্যেই বাস্তবের সত্য ধরা দেবে। সে সত্য সামন্ততন্ত্রের চিরন্তন স্বরূপ। এই বর্ণনা কেবল বিমল মিত্র কেন, সব লেখকের সামন্ততন্ত্রের বর্ণনাতেই পরিস্ফুট। এ ক্ষেত্রে বিমল মিত্রের লেখার ভঙ্গিটুকুই অভিনব। বিষয় গৌরবে খুব নূতনত্ব নেই। সামন্ততন্ত্রের প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তফাত এই—এখানে জমিদাররা ইংরেজ প্রভাবিত এবং শহর কলকাতার অধিবাসী। তাই তাদের রুচি আলাদা, চালচলন ও বিলাসোপকরণ ভিন্নতর। নতুবা চরিত্রধর্মে সকল সামন্তই এক এবং তাদের অন্তঃপুরিকাদের মর্মবেদনার অভিব্যক্তিও প্রায় এক।

বড়বাড়ীর অধিবাসীদের জীবনের যে ছবি একদিন ভূতনাথের সামনে ধরা দিয়েছিল 'সাহেব বিবি গোলামের' সেই অংশটিরই এখানে মুখ্যতঃ আলোচনা হবে। আনুষঙ্গিক কাহিনীর আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। মদ আর মেয়েমানুষই জমিদারদের আভিজাত্য ও বংশগৌরবের সব চেয়ে বড় প্রমাণ। গ্রামের জমিদারদের বেলায় এই মদ আর মেয়েমানুষের প্রভাব শুধু বহির্মহলেই সীমাবদ্ধ—সেখানে বিবাহিতা স্ত্রীরা কাব্যে উপেক্ষিতা হয়ে একান্তে মনের দুঃখে পড়ে থাকেন অথবা কিছুটা সাহসিকা হলে স্বামীর মন ফেরাবার জন্য নানাবিধ উপদেশ দান করেন। কিন্তু 'সাহেব বিবি গোলামে' নাগরিকতার স্পর্শ অন্তঃপুরেও লেগেছে। এখানে পাতিব্রত্যের প্রকাশ ভিন্নতর। ছোট বৌ স্বামীর মন ফিরিয়ে যখন তাকে গৃহবন্দী করতে পারেন নি তখন নিজেই মদ্যপান করে বাঈজীর ভূমিকা নিয়ে ছোট-কর্তার মনোরঞ্জন করতে চেয়েছিলেন। স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা সেই নারীর মর্মান্তিক আত্মহননের সহযোগী হতে হয়েছিল এই ভূতনাথকে। মোহিনী সিন্দূরে যে কাজ হয় নি—মদ্যপান করে সে চেষ্টায় সফল হয়েছিল এ বাড়ীর ছোট বৌ, ভূতনাথের ছোট বৌঠান। দীর্ঘকাল পরে গাঁইতির আঘাতে জেগে ওঠা এক নারীদেহের

অস্থিকঙ্কাল ভূতনাথের স্মৃতির পটে অতীতের সেই ঘটনাগুলোকে একে একে মেলে ধরে।

খাজাঞ্চীখানায় জমিদার বাড়ীর আয়-ব্যয়ের হিসাবের বহর শোনা যায়। পাকা খাজাঞ্চী বিধু সরকার বলে—

"জমিদারি সেরেস্তার কাজ অমন সোজা নয়। সই মিললেই ছেড়ে দিলাম, সে সরকারী আপিসে পাবে—এখানে চলবে না, তেমন কাজ করলে। বিধু সরকার আর বাবুদের জমিদারি রাখতে পারতো না।"

তার হিসাবে সিকি পয়সা কড়ি, দামড়ি ছেদামটি পর্যন্ত হিসেবে ভুল হবে না। বিধু বলে—"একটি পয়সা এদিক-ওদিক হলে নায়েব গোমস্তার গলা টিপে ধরবো না? বাবুদের ধর্মের পয়সা। বিধু সরকার আর সব পারে দাদা—অধর্ম সইতে পারে না।"

নায়েব গোমস্তার চেয়েও যে খাজাঞ্চী সরকারের ক্ষমতা আরও বেশি এখানে তার আভাস আছে।

ছোটবাবু, মেজবাবুর পরে আর এক চরিত্র ছুটুকবাবু—বড় বউঠাকরুণের একমাত্র ছেলে। কার্তিকের মতো চেহারা। তার সম্বন্ধে লেখক বলেছেন—"কিন্তু যে বংশের ঐশ্বর্য আর বিলাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করেছে তাকে কে বাঁচাতে পারে।"

একদিকে কেবল মদ আর বাঈজী নাচের স্রোতে ভেসে যাওয়া বিলাস আর একদিকে সমধর্মী অন্য জমিদারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জুয়াখেলায় মেতে ওঠা—এই দুয়ের নেশাতেই জমিদারীশ্রেণী ভিতরে ভিতরে ফোঁপড়া হয়ে পড়েছে। অথচ বাইরের ঠাঁটটি ঠিক বজায় রাখা চাই। কারণ ঐ বিলাসের দম্ভটুকু না থাকলে তাদের আভিজাত্য থাকে না।

সারা দেশে যখন দুর্ভিক্ষ আর মহামারী তখনও বড়বাড়ীতে চলেছে অপব্যয়। জলসাঘরকে মনের মত সাজানোর জন্য লক্ষ লক্ষ অর্থের অপব্যয় হচ্ছে। বিলাতী ঠাঁটে সাজানো হলঘর তাতে বিলিতি আঁকড। লাটসাহেবের বাগানের মালী নিযুক্ত হল গাছের পরিচর্যায়। চীনে আঁকড়ের চারাগাছ নিলামে উঠল—শেষ পর্যন্ত পাঁচটাকার গাছ তিন শ টাকা দিয়ে কিনে নিলেন বড়বাড়ীর মালিক। সেই গাছ প্রতিষ্ঠায় লাটসাহেব পর্যন্ত নিমন্ত্রিত। সে কি জাঁকজমকের ব্যাপার। জমিদারের সাবেকী বিলাসব্যাসনের সঙ্গে ইংরেজীয়ানার মিশ্রণ ঘটে এই শহর কলকাতার জমিদারদের ঠাঁট আরও খরচবহুল করে তুলেছে।

বড়বাড়ীর স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে আরও বহু অতীতের দিকে লেখক দৃষ্টি

প্রসারিত করেছেন। সে হল অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদকুলী খাঁর আমল। এই সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—

"ইতিহাসের সিংহদ্বার যেন আস্তে-আস্তে খুলেছে ওভারশিয়ার ভূতনাথের চোখের সামনে। সন্ধ্যা হয়ে এল। কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর একশ দেড়শ বছর পেছনে যেন ভূতনাথ চলে গিয়েছে। কালের নাটমঞ্চ যেন ক্রমশঃ ঘুরতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদকুলী খাঁর কানুনগোর শেষ বংশধর বদরিকাবাবু যেন সামনের একতলা বৈঠকখানা ঘরের শেতলপাটি ঢাকা নিচু তক্তপোষটার ওপর হঠাৎ উঠে বসেছেন।"

এই বদরিকাবাবু খাজাঞ্চি খানার পাশের ঘরে একলা থাকতেন—আর কেল্লার তোপধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে পেটাঘড়িতে নিয়মিত দম দিতেন। তিনি নিজেই যেন মহাকালের নীরব সাক্ষী। শত শত বছরের বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন তিনি ঐ ঘড়ির টিক টিক চলার আওয়াজের মধ্য দিয়ে।

আজকের এই বৃদ্ধ বদরিকাবাবু মুর্শিদকুলী খাঁর কানুনগো দর্পনারায়ণ মিত্রের শেষ বংশধর। বলা বাহুল্য মুর্শিদকুলী খাঁই বাংলাদেশে প্রথম জমিদারিপ্রথার সুবন্দোবস্ত করেন। এই মুর্শিদকুলি খাঁর নামের সঙ্গে জমিদারিপ্রথার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জমিদাররা নবাবকে খাজনা দিতে বাধ্য ছিলেন। জমিদারদের শোষণ করে অপর্যাপ্ত অর্থসংগ্রহ করে পরে দিল্লীর বাদশাহের তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমা দিতেন নবাব। এবং এই অর্থ আদায় করার জন্য নিযুক্ত ছিলেন কানুনগো। অর্থাৎ তাঁর স্বাক্ষর ছাড়া রাজস্ব জমা দিতে পারতেন না নবাব। বদরিকাবাবুর পূর্বপুরুষ কানুনগো দর্পনারায়ণের জীবনের এক ঘটনা বর্ণনা করে জমিদার নবাব কানুনগো এবং দিল্লীর বাদশাহ কিংবা পরবর্তীকালের ইংরেজ সরকার প্রভৃতির মধ্যে আপেক্ষিক সম্পর্কের কথা যেমন স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক—সেই সঙ্গে পূর্বকালে সরকার থেকে প্রজা পর্যন্ত অর্থ আদায়সূত্রে, যে সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল শোষণমূলক সে কথাও বলেছেন। অর্থাৎ কৃষকপ্রজাকে শোষণ করত গোমস্তা ওরফে জমিদার, কারণ জমিদার আবার শোষিত হতেন নবাবের দ্বারা—নবাবও বাধ্য ছিলেন নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিল্লীর বাদশাহের সরকারী তহবিলে জমা দিতে। এদের প্রত্যেকেই দেয় অর্থের অতিরিক্ত সংগ্রহে মনোযোগী ছিলেন বলেই শোষণ ও অন্যায় অত্যাচার আরও তীব্রতর ছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও, নবাব আলিবর্দ্দিকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নজর না দিতে পারার কারণে, কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন বলে উল্লিখিত আছে। ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচারে বহু জমিদার জমিদারি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে-

ছিলেন সে ঘটনাও বহু লেখক উল্লেখ করেছেন। তবে পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের অধিকারে বর্ধিত হল ঠিকই, কিন্তু চিরকাল ধরে রইল দরিদ্র প্রজারা—নতুন নতুন শোষণের চাপ তাদের ওপরই শেষ পর্যন্ত এসে পড়েছে। এ অন্যায়ের প্রতিকার আগেও হয় নি, এখনও, এমন কি জমিদারি উচ্ছেদের পরও হল না। তাদের অবস্থা থেকে গেল যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

প্রাচীনকালে অর্থাৎ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে জমিদারদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—কারণ তাদের রক্ত চুষত নবাব। "একদিন খাজনা দিতে দেরি হলে জমিদারদের বৈকুণ্ঠ লাভ। সে বৈকুণ্ঠ নরকের চেয়েও যন্ত্রণাকর।"

মুর্শিদকুলি খাঁর পর থেকে কত মুসলমান নবাব রাজত্ব করে গেল। হিন্দু নরপতিও রাজত্ব করেছেন, তারপর ইংরেজ আমল এল। কিন্তু চিরকাল ধরে সেই শোষণের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি চলেছে—মানুষের মর্যাদা কেউ দিতে শেখে নি।

ননীলাল বলেছে—"ছুটুকবাবু সম্পর্কে, সুখচর জমিদার বংশ—প্রজা ঠেঙানো পয়সা, রক্তের দোষ যাবে কোথায়"—কথাটা খুবই সত্য।

সেই ছুটুকবাবু অর্থাৎ বড়বাড়ীর শেষ বংশধর চূড়ামণি চৌধুরী ওরফে ছুটুক বাবু আজ বৃদ্ধ। আলিপুরের উকিল। তাঁর মক্কেল জোটে না। ট্রামে হাতি বাগানের পথে চলতে চলতে কালোকোট গায়ে বৃদ্ধ চূড়ামণি চৌধুরী চোখ বুজে ভাবেন বড়বাড়ীর অনেক পুরানো কথা। তাঁর বাল্য যৌবনাবস্থার সেই জাঁক-জমকের স্মৃতি—সেই সঙ্গে চৌধুরীবংশের উদ্ভবের চমকপ্রদ ইতিহাস—তাঁর মনে এক এক করে ভেসে ওঠে। বড়বাড়ীর সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের শেষ সাক্ষীরূপে বৃদ্ধ চূড়ামণি চৌধুরীই শোনাবেন এ বাড়ীর নতুন মালিকদের কাছে, সেই চৌধুরী বংশের ইতিবৃত্ত। এইভাবে বর্তমানকালের পটভূমিকায় অতীত স্মৃতির উপর নতুন করে দাগ বুলিয়েছেন লেখক। এই বড়বাড়ীর ঘড়িবাবু বদরিকাবাবুর সেই কথাগুলো যেন বর্ণে বর্ণে ফলে গিয়েছে—' বড়বাড়ীর ইটপাঁথর ভাঙার প্রতিটি শব্দে ভূতনাথের সেই কথাই প্রথম মনে হল। বদরিকাবাবু বলতেন—"দেখবি, একদিন এর কড়িকাঠ ভেঙে পড়বে। এই বাড়ী গুঁড়ো হয়ে যাবে। বড়বাড়ির ভিটেতে ঘুঘু চরবে, পায়রাগুলো না খেতে পেয়ে মরবে—তারপর এই বাড়ী ভেঙে মাটি সমান হবে একদিন—সেই মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে কুলি-মজুরদের।"

বদরিকারবাবুর দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত বড়বাড়ীর সমস্ত ঐতিহ্য একটু একটু করে সত্যই গুঁড়িয়ে গেল ভূতনাথের চোখের সামনে। বড়বাড়ীর মানুষগুলো এক এক করে বাড়ী ছাড়ল, মেজবাবু, ছুটুকবাবু, বড়বৌ, মেজবৌ দাসদাসী দারোয়ান

সকলেই। দেউড়িতে আর ঘণ্টা বাজে না সময় ঘোষণা করে। রান্নাবাড়ী আর নাচমহল লোকজনের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে না। বিধু সরকারের খাজাঞ্চী খানার দরজায় তালাচাবি পড়ে। পটলডাঙ্গার বাবুরা আস্তে আস্তে দখল নেয় চৌধুরীদের বড়বাড়ীর। এক কোণে পড়ে থাকে অসুস্থ ছোটকর্তা, যার দাপটে আর বিলাস-ব্যসনে একদিন থরহরি হত লোকজন। আর নির্জন নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকে পটেশ্বরী বৌঠান—এ বাড়ীর ছোটবৌ—সৌন্দর্য-মাধুর্যে এ বাড়ীর সেরা বৌ। সেই পটেশ্বরী বৌঠানও একদিন হারিয়ে গেল সকলের অগোচরে। সে খবর কেউ জানত না—এমন কি ভূতনাথও না। বড়বাড়ীর এই অবক্ষয়ের মধ্যে সামন্ত-তন্ত্রের নিশ্চিত পরিণামই প্রতিফলিত হয়েছে।

ভূমিপতি চৌধুরীর একদা অর্জিত জমিদারি ও প্রতিষ্ঠিত চৌধুরীবংশের সমস্ত ঐশ্বর্য বহু অত্যাচার অন্যায় ও রক্তপাতের মধ্য দিয়েই লব্ধ। চৌধুরীবংশের রক্ত ধারায় মদ আর মেয়েমানুষের নেশা আদিকাল থেকে চলে আসছে। এর মধ্যেই আছে তাদের আভিজাত্যের বীজ। আজকের দিনেও বড়বাড়ীর বৈদুর্যমণি, হিরণ্যমণি, কৌস্তুভমণিরা ঘরের স্ত্রীর আঁচল ধরে থাকাকে অপমানজনক কাজ বলে মনে করে। বাইরে বারাঙ্গনার ঘরে রাত কাটানোতে তাঁদের চরিত্রের গৌরব বাড়ে—কলঙ্ক রটে না।

যে সামন্তশ্রেণীর উদ্ভবের মূলে এত অন্যায় এত পাপ এত বঞ্চনা আছে তার স্থায়িত্ব যে বেশিদিনের নয়—বদরিকাবাবুর অভিশাপে তারই ইঙ্গিত আভাসিত। কেবলমাত্র বদরিকাবাবুর পূর্বপুরুষ দর্পনারায়ণের অপঘাত মৃত্যুর জন্য বড়বাড়ী ধ্বংস হয় নি—প্রকৃতপক্ষে বহু দর্পনারায়ণের বঞ্চনার ইতিহাস মিশে আছে—মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতিষ্ঠিত সামন্ত বংশধারার ইতিহাসে—তাই কোনও সামন্ত বংশই টিকতে পারে না। এ কথাও বদরিকাবাবু ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছে।

"অত বড় আলমগীর বাদশাহ-তাই রইল না—সীতারাম, আবুতোরাপ, রেজা খাঁ, ঈশাখাঁ, কেউ রইল না—তোমার বাবুদের জমিদারি তো ছার তার কাছে।"

আসল কথা চিরকালীন সামন্ততন্ত্রের নিজের মধ্যেই আছে তার পতনের বীজ—বড়বাড়ীর পরিণামের মধ্য দিয়ে, বদরিকাবাবুর অভিশাপ বর্ণে বর্ণে সত্যই কেবল হয়ে ওঠেনি, চিরকালীন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষদের একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদরূপে ঘোষিত হয়েছে।

কেবলমাত্র নিজের কারণে নয়—যুগধর্মের পরিবর্তনও যে সামন্ততন্ত্রের অবসানের অপর এক বড় কারণ 'সাহেব বিবি গোলামের' বড়বাড়ীর—শোচনীয় পরিণামের চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে সেই সত্যও বাস্তবায়িত হয়েছে। ননীলাল

আর ছুটুকবাবু ওরফে চূড়ামণিবাবুর মধ্যে সেই যুগসংঘর্ষের প্রতিফলন দেখানো হয়েছে।

ননীলাল বলেছে "আজকাল বনেদীর কোনো দাম নেই। এখন ওসব সামন্তযুগ চলে গিয়েছে এখন ক্যাপিটালিজম-এর যুগ।"

একদিকে বন্ধু ননীলাল আর একদিকে ব্যবসায়ী শ্বশুর হাবুল দত্ত প্ররোচিত করেছে ছুটুকবাবুকে জমিদারি বেচে কয়লার খনি কিনতে, কারখানা চালাতে। নতুনকালে ব্যবসাতেই টাকা। আর আভিজাত্য টাকার বিনিময়েই কেনা যায়। ফাঁকা বনেদীয়ানার কোনও দাম নেই। প্রিন্স দ্বারকানাথ থেকে শুরু করে রাজা নবকৃষ্ণ আর যত শীল, শেঠ সকলেই ব্যবসায়ের দ্বারাই ধনী হতে পেরেছেন।

বড়বাড়ীর শেষ অধস্তন পুরুষ একমাত্র অথবা অন্যতম বংশধর (মেজরাণীর ছেলে-মেয়েদের উল্লেখ থাকলেও পরিচয় নেই) চূড়ামণিবাবু ক্রমে চৌধুরীবংশে মূর্তিমান ব্যতিক্রমহয়ে ওঠেন। ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিয়ে করেছেন তিনি। ছুটুক-বাবুই জমিদার পরিবারের একমাত্র পুরুষ—যিনি ঘরে থাকেন। শ্বশুরের পরামর্শ শোনেন। এটর্ণীশীপ পড়ে তিনি ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছেন। সেই সঙ্গে নিজের অংশ বিক্রি করে বড়বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন। লেখক নিজেই বলেছেন —"ছুটুকবাবু যেন অদ্ভূত সৃষ্টি এ বাড়ীর।"

সেদিনের সেই ছুটুকবাবুই আজকের বৃদ্ধ এটর্নী কালোকোট পরা মধ্যবিত্ত চূড়ামণি চৌধুরী যিনি ট্রামে যেতে যেতে বড়বাড়ীর স্মৃতি রোমন্থন করেন। সামন্ততন্ত্র ভেঙে গিয়ে ক্যাপিটালিজম এবং সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়, উকিল মোক্তার কেরানী প্রভৃতি স্বল্প বিত্তের কর্মচারী ছুটুকবাবুর জীবনইতিহাসে এই পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

বড়বাড়ীর শেষ অস্তরাগে দাঁড়িয়ে ভূতনাথের তাই সেদিন মনে হয়েছিল "বড়বাড়ীর সূর্য যদিই বা ডুবেছে—কিন্তু সূর্য উঠেছে আর এক জায়গায়। উদয় হচ্ছে আর এক পাড়ায়।"

"সেখানে রূপচাঁদবাবুর বাড়ী উঠেছে হাজারে হাজারে। সেখানে আর এক মানুষের দল আর এক সভ্যতার পত্তন করছে। সে মানুষেরা হয়তো এত বড় নয়, এত অভিজাত নয়—তাদের বাড়ীতে ঘরে ঘরে হয়তো এত ঘোড়া, পাল্কি, মেয়ে-মানুষ, বুহাম, ল্যাণ্ডোলেট নেই—তাদের বউরা হয়তো হীরের নাকছাবি পরে না, পুরুষেরা রাজবাহাদুর খেতাব পায় না—পরের পরিশ্রমের আয়ের ওপর ভাগ বসায় না। তারা হেঁটে আফিসে যায়, বৃষ্টি হলে মাথায় ছাতা দেয় তারা, খেটে খায়।"

যন্ত্রযুগের আগমনী শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের নিয়মে জনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

'সাহেব-বিবি-গোলামের' ভাষ্যকার ভূতনাথ চক্রবর্তীর স্মৃতিচিত্রণের মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রের উদয়বিলয়ের অপূর্ব তথ্যচিত্র এ'কেছেন লেখক। সামন্ততন্ত্রের অবসান-যুগে নব্য ক্যাপিটালিজম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—ননীলাল যেন তাঁরই প্রতিনিধি। কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য আনে রাশি রাশি টাকা আর এই টাকাতেই আভিজাত্য কেনা হয়। ননীলাল এই মত ব্যক্ত করেছে। ইংরেজ রাজত্বে প্রাচীন সামন্ত রাজাদের অবস্থার কথাও ননীলালের মুখ দিয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইংরেজরা প্রথমে এদেশের ধনী ব্যবসায়ীদের হাত করেছিল—তারাই ছিল বেনিয়ান মুৎসুদ্দি তাদেরই দিয়েছিল সবরকম সুখসুবিধা, পরে এদের অনেকেই জমিদারে পরিণত হয়। কিন্তু সাবেককালের বহু জমিদার ইংরেজদের সরকারের খাজনা যোগাতে ভিটেমাটি উচ্ছেদ হয়েছে। এ সংবাদ আমরা ভারতচন্দ্র থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরও পরবর্তীকালে বহু লেখকের রচনায় পেয়েছি। ননীলালের কথায় তারই পুনরুল্লেখ পাওয়া যায়। ননীলাল বলেছিল—"ওসব বড় বড় লোকদের কথা ছেড়ে দে, ওরা ছিল ইংরেজদের পুষ্যিপুত্তুর। এটা নতুন দেশ। বিদেশে বিভুঁই—এখানে বাস করতে গেলে এখানকার কয়েকজন লোকের সাহায্য নিতে হবেই তাই ওদের সব বেনিয়ান মুৎসদ্দি করে নিয়েছিল আর কিছু কিছু সুবিধেও ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু কত জমিদারকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে জানিস? সেকালে বাকি খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাড়ী বন্দী করে রেখেছিল। দিনাজপুরের রাজবংশের সমস্ত সম্পত্তি ১৮০০ সালে নীলেম হয়ে যায়। নদীয়ারাজের তো সব গেল বাকি খাজনার দায়ে। রাজা শুধু লাখ টাকা করে ভাতা পেতো।"

ননীলালের উক্তিতে এক বিস্তৃত সামন্ত ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যার সূচনা মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে দর্পনারায়ণ ভূমিপতি চৌধুরী পর্যন্ত আর যার পরিণাম ছুটুকবাবু। বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলামে' লেখক দেখিয়েছেন ইমপ্রূভমেণ্ট ট্রাস্টের নির্দেশে বড়বাড়ীর প্রাসাদ গাত্র ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল সামন্ত-শ্রেণীর ইতিহাসও চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বনমালী সরকার লেনের অস্তিত্ব যেমন মুছে গেল, সেই বড়বাড়ীর বড়মানুষদের কথাও আর কেউ কোনও দিন জানবে না। ভুতনাথ যেন তারই পুনরাবৃত্তি করে শেষ দায়িত্বপালন করেছে। বিপুলায়তন উপন্যাস 'আসামী হাজিরে'র নায়ক সদানন্দ চরিত্রটিকে লেখক বিমল মিত্র এক উচ্চতর আদর্শবাদের উন্নত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেদিক

দিয়ে সদানন্দ বুদ্ধ যীশু কিম্বা সক্রেটিশের পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে। রাজপুত্র বুদ্ধ যেমন আর্তমানুষের মঙ্গলের জন্য সর্বত্যাগী হয়েছিলেন, যীশু, সক্রেটিশকে যেমন মানুষ ভুল বুঝে তাদের শাস্তি দিয়েছিলো, সদানন্দ তেমনি ন্যায় ও আদর্শের জন্য সর্বস্বত্যাগ করে সবকিছু বিলিয়ে দিয়েও মানুষের কাছে অপরাধী, আসামী বলে বিবেচিত হয়েছে। জগতের নিয়মই এই। যারা প্রকৃত আসামী, তারা থাকে আত্মগোপন করে। তারাই সমাজে প্রথম সারির মানুষ। কিন্তু সদানন্দ সর্বস্ব ত্যাগ করে সকলকে সুখী করার ব্রত নিয়েও কেন জগতের সামনে আসামী প্রতিপন্ন হল ? এর পিছনে আর যে প্রশ্নই জড়িত থাকুক না কেন, আমরা লক্ষ্য করব পাপের দ্বারা অর্জিত ধন পাপপথকেই প্রশস্ত করে। প্রজাশোষণ করে একদিন সদানন্দের পূর্বপুরুষ যে জমিদারি ও প্রভুত অর্থসঞ্চয় করেছিল বিবাগী সদানন্দ তা বিলিয়ে দিয়ে, পাপের ঋণ থেকে মুক্ত হতে চেয়েই মস্ত ভুল করল। কারণ পরে জানা গেল তার মোটা দানের অঙ্ক যারা যারা পেয়েছে, তারা কেউই তা সৎপথে ব্যবহার করছে না। অতএব এই বিভিন্ন রকম পাপকে ঘটাবার জন্যই সদানন্দ আসামী বলে বিবেচিত হয়েছে। অতএব রূঢ় জাগতিক সত্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে সদানন্দ একটি রূপক চরিত্র হয়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে সদানন্দ যেন সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে জীবন্ত চ্যালেঞ্জ। সাহেব বিবি গোলামে ছুটুকবাবু বড়বাড়ীর তথা চৌধুরীবংশের প্রথম ব্যতিক্রম হলেও সে বিদ্রোহী সন্তান নয়। প্রথম জীবনে সেও গা ভাসিয়ে দিয়েছিল তার পিতা, পিতামহের বিলাসের স্রোতে, মদ আর মেয়েমানুষে নেশায়, যার মধ্য দিয়েই পাপের টাকার সদ্ব্যবহার করা হত। সেই সম্পর্কেই বন্ধু ননীলাল বলেছিল—"সুখচর, জমিদারবংশ প্রজা ঠেঙানো পয়সা। রক্তের দোষ যাবে কোথায় ?"

কিন্তু সদানন্দের বেলায় একদিকে প্রবল প্রতিপক্ষ তার বাপ-ঠাকুর্দা —আর একদিকে সে নিজে একা। শিশুকাল থেকে বাপ-ঠাকুর্দার লোক ঠকানো কার্যকলাপ, অত্যাচার, শোষণ, গুপ্তহত্যা, লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধানের ব্যবস্থা—খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার—ইত্যাদি দেখে দেখে সদানন্দের মনের মধ্যে এর প্রতিকারস্পৃহা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। এবং আপন বংশধারার চরিত্র সম্পর্কে একটা বিদ্বেষ গড়ে ওঠে। সদানন্দও তার বংশের একটা ব্যতিক্রম, যদিও এ ব্যতিক্রম সাহেব বিবি গোলামের ছুটুকবাবুর মত নয়।

অবশ্য আসামী হাজির উপন্যাস পাঠের আরম্ভে একটা কথা মনে রাখতে হবে 'সাহেব বিবি গোলামের' বড়বাড়ীর চৌধুরী পরিবারের মধ্যে যে বনেদীয়ানা ছিল তা সদানন্দের পূর্বপুরুষদের মধ্যে নেই। তার কারণ তারা ছিল আসলে কালিগঞ্জের

জমিদার হর্ষনাথ চক্রবর্তীর গোমস্তা। গোমস্তার কালক্রমে জমিদারি অর্জনের ইতিহাস আরও অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া গেছে। কিন্তু খাস জমিদারের সঙ্গে এই নবোদিত জমিদারদের চরিত্রগত বিভিন্নতা পূর্বতর লেখকদের উপন্যাসে ঠিক এই আলোকে ধরা পড়ে নি।

'সাহেব বিবি গোলামের' পাশাপাশি 'আসামী হাজির' গ্রন্থটি রেখে বিচার করলে এই ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

সাহেব বিবি গোলামে ছুট্‌কবাবুর বিয়েতে শেষবারের মত বড়বাড়ীর উপযুক্ত সমারোহ আর উৎসব আনন্দ হল। শ্বশুর হাবুল দত্ত আর বন্ধু ননীলাল নতুন পথের সন্ধান দিল তাকে—যে পথে আসে অনেক টাকা, অনেক মান সম্মান, প্রতিপত্তি, ব্যবসা, কলকারখানা। সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সফল করতে হবে তাকে। জমিদারের আয় এখন স্তিমিত। অতএব দাও জমিদারি বিলি করে, বিক্রি করে। সেই টাকায় গড়ে তোলো ব্যবসা। তারাশঙ্কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সকলেই এই নবজাগ্রত ক্যাপিটালিজমের কাছে জমিদারদের পদানত হতে দেখিয়েছেন। জমিদার টাকার অভাবে জমি তুলে দিয়েছে মিল মালিকের হাতে। চাষের জমির ওপর দেখতে দেখতে গড়ে উঠেছে কলকারখানা, নতুন বণিক সভ্যতা। তাই নিয়ে প্রজা-জমিদার সংঘর্ষ শুরু হয়েছে—আবার বহু চাষী প্রজা কলখারখানার শ্রমিক বনে গেছে। গ্রামীণ জমিদার গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে শহরবাসী হয়েছেন।

'সাহেব বিবি গোলামের' জমিদার পরিবার প্রথমাবধিই নগরবাসী। কিন্তু তাঁদের জমিদারি সুখচর ও আরও নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিল।

ছুট্‌কবাবু আস্তে আস্তে বড়বাড়ীর অংশ বেচে দিয়ে অন্যত্র উঠে গেলেন। সেদিনের ছুটুকবাবুর সঙ্গে আজকের উকিলবাবু চূড়ামণি চৌধুরীর কোনও মিল নেই। তিনি আজ সামান্য একজন মক্কেলহীন উকিল। ট্রামে যাতায়াত করেন আর চলতি পথের ধারে বড়বাড়ীর স্মৃতি সৌরভে আজও ভরপুর হয়ে থাকেন।

ছুটুকবাবুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনও স্বতঃবিরোধিতা ছিল না—যা ছিল সে হল একান্ত পরিবেশের প্রভাব। বাইরে থেকে নতুন যুগের হাওয়া এসে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল বড়বাড়ীর গতানুগতিক জীবনধারা থেকে। আর কিছু বলিষ্ঠতা ছুটুকবাবুর ছিল না—অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তার কোনও নিজস্ব বক্তব্য ছিল না।

'আসামী হাজির' এর জমিদার গ্রামীণ জমিদার। উপন্যাসের নায়ক সদানন্দও ছুটুকবাবু নয়। তার আত্মসমালোচনা ও আত্মহনন আছে। গতানুগতিক

সামন্ত চরিত্রের যেন সে মূর্তিমান প্রতিবাদ। নিজের জীবন দিয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে তার দেহের জমিদার বংশের পাপরক্তের। তাই সদানন্দ চায় নি আর বংশবিস্তার করতে। নয়নতারাকে বিশেষ চুক্তিতে সে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল—কিন্তু পরে সে সর্ত ভঙ্গ হওয়ায় নিষ্ঠুরভাবে সে নয়নতারার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছে। সদানন্দের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তার পিতামহ যাদের বঞ্চিত করে, শোষণ করে এই জমিদারির ঐশ্বর্যের সৌধ গড়ে তুলেছে—সেই কালিগঞ্জের বৌ, সেই কপিল পায়রা পোড়ার দল যেন তাদের সুবিচার পায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, প্রজাশোষণের বিরুদ্ধে, অযথা রক্তপাত ও ক্ষমতালিপ্সার বিরুদ্ধে একা লড়াই করেছে জমিদারবংশের একমাত্র সন্তান সদানন্দ।

জমিদারবংশে এমন ছেলে জন্মানো নিতান্তই সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। সবাই তাকে জানে পাগল বলে। তার বাবা তাকে কখনও শাসন করে, কখনও এড়িয়ে চলে, মা তাকে বশীভূত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে—সাধুসন্তের সাহায্যে। আর প্রকাশ মামা চায় তাকে কামিনী কাঞ্চনের লোভ দেখাতে। কিন্তু সদানন্দ এর কোনটির মধ্যেই বাঁধা পড়ে না। পরমাসুন্দরী বৌ নয়নতারা তার রূপের পসরা নিয়ে যখন ব্যর্থ হল সদানন্দের মন বাঁধতে তখন তার মধ্যে জেগে উঠলো ব্যক্তিত্বময়ী নারী। এই সংসারে একমাত্র সেই জেনেছিল সদানন্দ কি চায় আর কেনই বা অবাধ্য হয়েছে। তার মহান আদর্শের কথা ভেবেই নয়নতারা মুখ বুঁজে পড়েছিল তার জমিদার শ্বশুরের সংসারে। পরে সে নিজেও দুচোখ দিয়ে দেখেছিল—জমিদার-বংশের মধ্যে কত পাপ, কত অন্যায় অবিচার, কত ব্যাভিচার চলে। এমন কি সে বধূ হয়েও রেহাই পায় নি তার থেকে। সে দেখেছে তার শ্বশুর কেমন করে গলা টিপে মেরেছে নিজের পিতাকে। আবার শিউরে উঠেছে গভীর রাত্রিতে নিজের শয়নঘরে চোরের মত সেই শ্বশুরকেই প্রবেশ করতে দেখে। সদানন্দ যেমন কালিগঞ্জের বউ অথবা কপিল পায়রা পোড়ার হত্যাকাণ্ড অথবা নিপীড়নের দৃশ্য দেখে এই জমিদারবংশের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল—নয়নতারাও দেখেছিল জমিদারের অর্থ যে কেবল বহু পাপের দ্বারা অর্জিত হয় তাই নয়—বহু পাপের দ্বারা তা রক্ষিতও হয়। নয়নতারা স্বচক্ষে তার প্রমাণ দেখেছে। অর্থলোভ ও বৈষয়িকতার মোহে অসুস্থ বৃদ্ধ রাজাবাবুর শ্বাসরোধ করে তাকে গোপনে হত্যা করতে হাত কাঁপেনা সনানন্দের পিতার। বংশরক্ষার অভিনব পরিকল্পনায় পিতৃতুল্য শ্বশুর দ্বিধা করে না পুত্রবধূর ঘরে গভীর রাত্রে চোরের মত প্রবেশ করতে আর শাশুড়ী হয় সেই দুষ্কর্মের সঙ্গিনী।

মদ আর মেয়েমানুষের নেশা এখানে জমিদার চরিত্রের ভূষণ নয়। কিন্তু তার

চেয়েও দুর্নীতিবোধের আরও কদর্যদিক তুলে ধরা হয়েছে। কপিল পায়রাপোড়া আর কালিগঞ্জের বউকে লেঠেল দিয়ে হত্যা করানোর মধ্যে জমিদারি পৌরুষ যেমন প্রকাশ পায়নি—তেমনি বাঈজীর আসরের পরিবর্তে পুত্র বধূরকক্ষে ঢোকার মধ্যেও নেই জমিদার চরিত্রের তথাকথিত বনেদীয়ানা। 'আসামী হাজিরে' জমিদার চরিত্র যেন নিতান্তই বৈষয়িক ও সংকীর্ণচেতা জমিদার চরিত্রের আধুনিক সংস্করণ।

'সাহেব বিবি গোলামের' চৌধুরীবংশের সেই ছেনিদত্তের সঙ্গে পায়রা ওড়ানোর মামলা এখানে নেই—ছুটুকবাবুর বিবাহ উৎসবের সমারোহ নেই সদানন্দের বিয়েতে। কিংবা সেই মেজ বৌঠানের পুতুলের বিয়ের অহেতুক অপব্যয়। আসামী হাজিরে বেহিসেবী কিছু নেই। জমিদারি প্রাচুর্য থাকা স্বত্ত্বেও সেই দিলদরিয়া মেজাজ নেই এখানে। তবে মিল আছে অন্য কয়েকটি বিষয়ে। জমিদার ভগ্নী, ভগ্নী-পতির কৃপাপুষ্ট প্রকাশ মামার চরিত্রদোষ ধনী জমিদারের বহু আশ্রিতের অন্যতম চরিত্ররূপেই ধরা দিয়েছে। 'সাহেব বিবি গোলামের' পটেশ্বরী বৌঠান আর 'আসামী হাজিরের' নয়নতারা দুজনেই সাধারণ ঘরের মেয়ে। নয়নতারার মত পটেশ্বরী বৌঠানেরই দুঃখ ছিল তার নিজস্ব। ছোটকর্তার মন বাঁধবার জন্য চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ছোট বৌঠানের সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা হল। ব্যক্তি মানুষ নয়, স্বামীর ইমেজকেই ছোট বৌঠান শ্রদ্ধা করেছে। নয়নতারাও ভালবেসেছে শ্রদ্ধা করেছে সদানন্দের জীবনের আদর্শকে। তাই ব্যক্তিজীবনে সে নিখিলেশকে পুনর্বিবাহ করলেও স্বামী বলে সদানন্দকে সে চিরদিনই পূজা করেছে।

শেষ পর্যন্ত এক হেঁয়ালি কল্পনার মধ্য দিয়ে বিমল মিত্র কাহিনীর পরিণতি ঘটালেও এর মধ্যে এক গভীর তাৎপর্য নিহিত আছে। ঠিক এই বৈপরীত্য বোধের প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথের হালদার গোষ্ঠীর বানোয়ারীলাল ঘর ছেড়েছিল। ঠিক এমনিধারা কিছু কিছু খাপছাড়া মানুষ থাকে যারা গতানুগতিক জীবনের সঙ্গে, আর পাঁচজনের ভাবধারার সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে নিকে পারে না নিজেকে। সেই কারণে তারা অন্যের কাছে উপহাস কিংবা উপেক্ষার বস্তু হয় অথবা দুর্বোধ্য হয়ে থাকে কিংবা নির্বোধ বলে প্রমাণিত হয়। সদানন্দও সেই শ্রেণীর চরিত্র।

সদানন্দকে সামন্ত বংশের অন্তর্ঘাত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। পূর্বা-লোচিত বিভিন্ন উপন্যাসে যে অন্তর্ঘাত প্রজাবিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে কোনও জমিদার কুলোদ্ভবের চরিত্রে বিস্তৃত হয়েছে—এইখানে, একক সদানন্দের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রয়েছে। সামন্ত রক্তের প্রায়শ্চিত্ত তথা শোধন হয়েছে সদানন্দের মধ্যে। তাই সদানন্দের পর জমিদারবংশ নির্বংশ হয়েছে। বহু কালিগঞ্জের বৌ আর কপিল পায়রা পোড়ার অভিশাপকে সদানন্দ সফল করে

তুলেছে নিজের জীবনের মধ্যে। সাহেব বিবি গোলামের ভূতনাথ যেমন লক্ষ্য করেছে বদরিকাবাবুর অভিশাপ সত্য হয়ে উঠেছে—বড়বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। বহু যুগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইভাবেই আত্মহননের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। সামন্ততন্ত্রের শেষ পরিণাম এই আত্মঘাতী সদানন্দ। হয়তো লেখক বিমল মিত্রের উপপাদ্য বিষয় এই ছিল। বিষয়বস্তু বর্ণনার দিক থেকে বিমল মিত্রের এই পদ্ধতি অভিনব সন্দেহ নেই। কারণ সামন্তশ্রেণীর প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা তিনি এখানে পরিহার করতে পেরেছেন এবং বাস্তবের সঙ্গে কিছু আদর্শবাদ এবং অলৌকিক রসের মিশ্রণ ঘটিয়ে গল্পের পরিকল্পনায় নূতনত্ব সৃষ্টি করেছেন। এদিক দিয়ে 'সাহেব বিবি গোলামের' তুলনায় 'আসামী হাজির' এর পদ্ধতি ভিন্নতর।

লেখকের 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' উপন্যাসটি যদিও স্বতন্ত্র ধারার অর্থাৎ সামন্তশ্রেণীর সমালোচনা এখানে মূল উপজীব্য হয় নি—এখানে আছে বড় বড় শিল্পপতিদের কথা—তবু বলব সামন্তচরিত্রের সেই শোষণমূলক ও চক্রান্তকারী চেহারা এখানে রূপ নিয়েছে শিল্পজীবীদের মধ্যে।

ননীলাল যে বলত জমিদারির পরই আসে ক্যাপিটালিজমের যুগ—কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে এ দুইয়ের স্বরূপ একই—খালি নাম আলাদা, অর্থাৎ জমিদারের প্রজা ঠেঙানো পয়সা আর শিল্পপতির শ্রমিক শোষণের অর্থে ইমারত তৈরী হয়। বনেদীয়ানা না থাকলেও উঠতি বড়লোকেরা টাকার বিনিময়ে মানমর্যাদা প্রতিপত্তি ক্রয় করে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজে। এই কাহিনীতে আছে তারই ইঙ্গিত।

'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' যেন 'আসামী হাজির' গল্পেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। নবাবগঞ্জের জমিদার বাড়ীর ছেলে সদানন্দের মত শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন গল্পের নায়কও পরিবারের এক বিদ্রোহী সন্তান। বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজীর পেছনে যে গভীর ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত থাকে, সুবিখ্যাত শিল্পপতির একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েও সে সেই গোপনে ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়ে নিজে জনতার অংশ হতে চেয়েছে—এবং এই কারণেই শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এইভাবেই নিজের জীবন দিয়ে সে প্রা.শ্চিত্ত করেছে তার পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের।

# সুবোধ ঘোষ, অমিয় ভূষণ মজুমদার

পূর্বতন অধ্যায়গুলিতে, একক লেখকের বিভিন্ন রচনা অবলম্বন করে সামন্ততন্ত্রের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে কয়েকজন লেখকের রচনা একত্র আলোচিত হল—না হলে এই অধ্যায়ের বিস্তৃতি সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

## সুবোধ ঘোষ

এই লেখকের লেখা ফসিল ও শ্রেয়সীর মধ্যে সামন্ত চরিত্রের আর এক দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। 'ফসিল' গল্পটিতে 'মহারাজ' খেতাবধারী অঞ্জনগড়, নেটিভ স্টেটের মালিকদের প্রজাপীড়নের এক অপূর্ব বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। এই মহারাজেরা বর্তমানে সংক্ষিপ্ত ভূখণ্ডের মালিক হলেও প্রাচীন ঐতিহ্য অহমিকার দাপটের কথা বিস্মৃত হন না। তাঁদের খেতাবটি এখনও সগৌরবে ব্যবহৃত হয়। নূতন যুগের হাওয়া লাগলেও তাঁরা পুরানো ধারাকেও বজায় রেখে চলেছেন। এখন অপরাধী প্রজার শাস্তিবিধানের বেলাতে পূর্বপুরুষের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে শূলে চড়ানো হয় না কিন্তু তাকে উলঙ্গ করে মক্ষিকা দংশন করানো হয়। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন "বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজা আছেন—ফৌজ, ফৌজদার সেরেস্তা নাজারাৎ সব আছে। এককুড়ির উপর মহারাজার উপাধি।……ক্ষাত্রিয় তিলক আর মোগল তকমার অদ্ভুত মিলন দেখা যায় দপ্তরে। যেন দুই যুগের দুই জাতের আমলাদের যৌথ প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন, সেই অদ্ভুত শাসনের তাপে রাজ্যের অর্ধেক প্রজা সরে পরেছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।" রাজা-জমিদারের শাসনের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে বহু প্রজা গ্রাম ছেড়ে সে যুগে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হত। চাষবাসের পরিবর্তে বেছে নিত কারখানার শ্রমিকজীবন।

রাজ্যের আয়তন আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে পড়লেও ভগ্নপ্রায় প্রাচীন প্রাসাদ, মরচেপড়া জীর্ণ কামান, সাবেক কালের কেল্লা, প্রাসাদচূড়ায় গৃহ কপোতের দল আর দপ্তরে পাগড়ী, তরবারী আর লোহার ঢাল পুরানো ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এবং সেই সঙ্গে রয়েছে ফসলের অংশ নিয়ে স্টেটের তসীল বিভাগের সঙ্গে ভিল কুর্মী প্রজাদের চিরকালীন সংঘর্ষ। এই মহারাজেরা অর্ধেক ফসল দাবী করেন। না পেলে তাঁর আস্তাবলের ঘোড়ারা খাবে কি?

অর্থাৎ রাজা-জমিদারের পশুশালার প্রয়োজনে প্রজাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হত। রাজ্যের ভিল প্রজারা গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মত চলে গেলেও কুর্মী প্রজাদের মাটির টান বেশী। তাই তারা গ্রাম ছেড়ে যায় না। চাষ করে বেহায়ার মত। আবার বিদ্রোহও করে। প্রকৃতপক্ষে এই কুর্মীজাতির মধ্যে চিরকালের প্রজা চরিত্রই পরিস্ফুট—যারা জমিদারের মার খেয়েও মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। আবার স্টেটের মহারাজাদের আচরণেও চিরন্তন জমিদারি প্রতাপ এবং বদান্যতা পরিস্ফুট। ফসল তোলার সময় জবরদস্তি করলেও প্রতি রবিবারে প্রজাদের মধ্যে বিলানো হয় চিড়া গুড়, । কেল্লার আঙিনায় অনুষ্ঠিত রামলীলা দেখার নিমন্ত্রণ হয় তাদের। কিন্তু সেই সঙ্গে "চিড়ে, আশীর্বাদ বা রামলীলা সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়। প্রজারা সেভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত" এ কথা বলেছেন লেখক। আরও লিখেছেন "লাঠিতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন আদায়-উসুল আর তসিল চলছিল বটে কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল তাতে গদির গৌরব অটুট রাখা যায় না।......রাজবাড়ীর বাপেরকেলে সিন্দুকের রূপো আর সোনার গদিতে হাত পড়ে।"

সেই অঞ্জনগড় নেটিভ স্টেট আর তার কুর্মী প্রজাদের কেন্দ্র করেই একদিন মার্চেণ্ট আর মহারাজের সংঘর্ষ শুরু হয়। মহারাজের ল এজেণ্ট অঞ্জনগড়ের ভূগর্ভস্থ খনিজসম্পদের সন্ধান পেয়ে নিজেই ডেকে এনেছিলেন মার্চেণ্টদের—অঞ্জনগড়ের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে—শ্রী ফিরবে। সমৃদ্ধশালী রাজ্যে পরিণত হবে অঞ্জনগড়। সেই সঙ্গে তিনি আরও স্বপ্ন দেখেছিলেন বেশ কয়েকটি ক্যানেল কেটে সেচ ও কৃষিজমির উন্নতি ঘটাতে। ফসলের প্রাচুর্য দেখা দিলে স্টেটের তহবিলেও জমা পড়বে মোটারকম ফসলের অংশ।

কিন্তু মুখার্জির স্বপ্ন পুরোপুরি সফল হল না। খনিজসম্পদের ব্যবহার হল ঠিকই কিন্তু মার্চেণ্টরা নগদ মজুরির লোভ দেখিয়ে টেনে নিতে লাগল কুর্মী-প্রজাদের। চাষ ছেড়ে কুর্মীরা হল কারখানার শ্রমিক। তারা ইউনিয়ন করতে শিখল—শিখল দাবী জানাতে, এমন কি মহারাজার বিরুদ্ধেও তারা পদাঘাত করার স্পর্ধা শিখল। তাদের মণ্ডলের উদ্দেশ্য পেট আর ইজ্জতের ওপর যারা হস্তক্ষেপ করবে তাদের তারা বরদাস্ত করবে না। বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো তাদের নেতা। এই দুলাল মাহাতোকে একদিকে টোপ দিতে চাইছে ইংরেজ মার্চেণ্টরা, অন্য দিকে মহারাজ তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে—তারা যেন ইংরেজ বেনিয়াদের সংস্পর্শে না যায়। ওদিকে সিণ্ডিকেটের কাছেও মহারাজের হুকুম —স্টেটের এগ্রিকালচার নষ্ট করে লোভ দেখিয়ে কুর্মী প্রজাদের কারখানার কুলি বানানো চলবে না।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল নগদ মজুরিরই জোর বেশী। সেই দিন মজুরির আকর্ষণ ছেড়ে মহারাজের রাজবাড়ীর বাগানে আর পোলো লনে তারা বেগার খাটতে এল না। উল্টো অনেকগুলি দাবী জানিয়ে মহারাজকে পত্র দিল। বলা বাহুল্য এসবের পিছনে মদত জোগাচ্ছে ইংরেজ মার্চেণ্টরা—তারা বলছে, "ডরো মৎ মাহাতো আমরা আছি। যদি ভিটেমাটি উৎখাত করে, তবে আমাদের ধাওড়া খোলা রয়েছে তোমাদের জন্য সব সময়।"

বণিকের কাছে সামন্তরাজের এই পরাভব যে কি মর্মান্তিক বেদনা তার প্রকাশ মুখার্জি দেখেছে "সিংহের চোখে জল" কিন্তু উপায় কি? নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়েছে—অঞ্জনগড়ের ধূলোমাটির বিনিময়ে মার্চেণ্টদের ডেকে এনে। এদিকে কুর্মী প্রজাদের নিয়ে দাবার গুটির মত ব্যবহার করছে—একদিকে মহারাজ আর একদিকে ইংরেজ বণিকেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামন্ত আর বণিক উভয়ের স্বার্থ একই বিন্দুতে এসে মিলে যায়। অর্থাৎ কুর্মী প্রজাদের প্রতি দুই পক্ষের ব্যবহারই আপত্তিজনক হয়ে ওঠে—একদিকে মহারাজের ফৌজদার প্রজাদের ওপর গুলি চালিয়েছে অন্য দিকে কারখানার পীট ধ্বসে পড়ে মারা গেছে অনেক প্রজা। অতএব প্রজাদের ক্ষেপে ওঠার পক্ষে এই দুটি ঘটনাই যৎ সামান্য নয়। তাই প্রথমেই কুর্মীদলের নেতা দুলাল মহাতোকে আটক করার প্রশ্ন ওঠে। মহারাজ এবং ইংরেজ বণিক দুজনেই ভয় পায় বিদ্রোহী প্রজাদের। তাই আত্মরক্ষার তাগিদে একে অন্যের সঙ্গে এসে হাত মেলায়। মহারাজ আর গিবসনের মিলিত প্রচেষ্টায় দুলাল মাহাতোর আর অন্য কুর্মীদের মৃতদেহগুলোকে খনির গহ্বরের নীচে চির-কালের মত প্রোথিত করা হল। এই সব হতভাগ্যদের ফসিলগুলোই হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠবে। এই মন্তব্য করেই 'ফসিল' গল্পের উপসংহার করেছেন লেখক।

এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমরা যদিও সামন্ত ও বণিক সংঘর্ষের চিত্র পাই কিন্তু এর মূল কথা সেই প্রজা শোষণ। প্রজার উপর পীড়ন অত্যাচার সব ক্ষেত্রেই সমান। কি সামন্ত কি বণিক সকলেই আপন আপন স্বার্থেই প্রজাদের ব্যবহার করে। প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা কেউ ভাবে না এবং আপাতঃ সংঘর্ষ যতই থাকুক স্বার্থ-রক্ষার ব্যাপারে যে তাঁরা এক—সে কথা লালমাটি উপন্যাসেও আমরা লক্ষ্য করেছি। এই প্রজাশোষণের ব্যাপারে সামন্ত বণিক হিন্দু বা মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান চরিত্রের কোনও পার্থক্য নেই। 'ফসিল' গল্পেও সে কথাই প্রমাণিত হয়েছে এবং যুগে যুগে বিদ্রোহী প্রজারা যে ফসিলেই পরিণত হয় তারও নজির রেখেছেন লেখক।

সুবোধ ঘোষের অন্যতম উপন্যাস 'শ্রেয়সী' যদিও প্রজা-জমিদার সম্পর্কের দিক

উদঘাটিত করে নি—কিন্তু ভগ্নপ্রাসাদ দেউলের মধ্যে যেজমিদার বংশধরেরা বর্তমান কালের সীমায় আজও বাস করছে তাদের জীবনের শোচনীয় ট্র্যাজিডিই এ উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করব। একটি জমিদার বাড়ীকে ঘিরে যেমন অনেক কাহিনী অনেক কিংবদন্তী অনেক গৌরবের স্মৃতি জড়িত থাকে তেমনি অন্তঃসার-শূন্য দরিদ্র জীর্ণ জমিদার বংশোদ্ভবেরও যেটুকু মূলধন তা হল দৈহিক রূপ-লাবণ্য, অপব্যয়ী মন এবং অন্তরের দীনতাকে চাপা দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এ বিষয়-গুলি রক্তের মধ্যেই থাকে—ইচ্ছা করলেই ত্যাগ করা যায় না। সেই কারণে আধুনিককালের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাদের অনেক সংঘাত সহ্য করতে হয়। যদিও পরিশেষে নূতনকালের নূতন ভাবধারারই জয় হয়।

'শ্রেয়সী' গল্পে রসিকপুরের রাজবাড়ী আর সে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই ভাবসংঘর্ষই পরিস্ফুট। আপন সৌন্দর্য ও বংশগৌরবের অহমিকায় অতীন যাকে অবহেলা করতে পেরেছিল পরে সেই হল সকলের চোখে শ্রেয়সী।

দুশো বছর আগে এই রসিকপুরে রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠা হয়। আজ তার পুরানো রূপ কিছু নেই—বংশপরম্পরায় তার ইট বিক্রি হয়ে হয়ে বর্তমানে জীর্ণ ভগ্ন অবস্থায় উপনীত। তবু তার নাম রাজবাড়ী—আর সে বাড়ীর বর্তমান মালিক কমল বিশ্বাস। লেখক লিখেছেন—"বিশ্বাস হয় না, এই বাড়ীর ভিতরে কোন প্রাণ বাস করে। একটা প্রাণহীণ জীর্ণতার বিরাট স্তূপের মত পড়ে আছে বাড়ীটা।"

অথচ বিরাট বিরাট স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ প্রায় নিশ্চিহ্ন দেউড়ি, পাইকদের কুঠুরির আভাস, দোলমঞ্চ, বড় বড় ঘর, দু-একটি রঙ্গীন ইটের কারুকার্য, বিরাট বাগান আর অজস্র ফলের গাছ—এসব মিলিয়ে রাজবাড়ীর পুরানো দিনগুলো যেন এখনও চোখে ভেসে ওঠে। এই সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—

"যেন পুরনো এক ইতিহাসের কোন প্রতিশ্রুতির দেহরক্ষীর মত নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে থামগুলি। বাড়ীর কর্তা কমল বিশ্বাস জানেন, এবং তাঁর স্ত্রী সুধাময়ীও জানেন, বিশাসবংশের সেই বনেদী গর্বের এই ভাঙ্গাচোরা ও শ্রীহীন চেহারার বাড়ীটা বাইরের লোকের চোখে যতই মূল্যহীন বলে মনে হোক না কেন, কিন্তু সত্যই মূল্যহীন নয়। এই ভয়ানক জীর্ণতা ও রিক্ততা বাড়ীটার একটা ছদ্মবেশ মাত্র। বিশাসবংশের সাতপুরুষ আগের সেই বিরাট সৌভাগ্যের কিছু সঞ্চয়, অন্ততঃ পাঁচ কলস সোনার মোহর এই ঠাকুরদালানেরই কোন না কোন থামের বুকের ভিতর লুকানো আছে।......ঠাকুরদালানের এই বারান্দাটা হল বিচিত্র এক সৌভাগ্যের কিংবদন্তী দিয়ে গাঁথা একটা স্বপ্নের বেদী।"

রসিকপুরের ভাঙ্গা রাজবাড়ীর সিন্দুকে এখনও দু লাখ টাকার সোনা আছে।

পাঁচ কলস মোহর মাটির নীচে পোঁতা আছে—সেই ধারণা নিয়ে ধনী ঘর থেকে ছেলেমেয়ের সম্বন্ধ আসে—তার ওপর বংশমর্যাদা আর সৌন্দর্য তো আছেই। কমল বিশ্বাসের ছেলে অতীন আর মেয়ে বাসনার দেবদুর্লভ চেহারা সকলকেই মুগ্ধ করে। যদিও ভেতরে ভেতরে অভাবের তাড়নায় তারা চরিত্রগৌরব হারাতে বসেছে। কমল বিশ্বাসও লোকের সে উচ্চ ধারণাকে নিজের হাতে ভেঙ্গে দিতে পারে না। তাই চূড়ান্ত অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও বড়লোকের ভাগ্নী কুরূপা কেতকীকে টাকার লোভে পুত্রবধূ করে ঘরে আনে সেই অর্থ আর কেতকীর গায়ের গহনার সাহায্যে মেয়ের বিয়ের দাবীদাওয়া মেটাতে। বাপ মার এই চক্রান্তের জালে ধরা দিতে পারে না স্বাধীনচেতা অতীন। নিজের সৌন্দর্য ও বংশমর্যাদা সম্পর্কে তার মনে নিদারুণ অহমিকা। তার পরমসুন্দর চেহারা দিয়ে সে অনায়াসে যেকোনও শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন লাভ করতে পারে—এবং পেরেছেও। সুন্দরী কাজরী তার জন্য পাগল, সেখানে কুরূপা কেতকী তো তুচ্ছ।

বাসনার চরিত্রেও রসিকপুরের রাজবাড়ীর মেয়ে হয়ে জন্মাবার ট্রাজেডি দেখানো হয়েছে। স্কুলের সঙ্গিনীদের কাছে তার নিরাভরণ মলিন সাজসজ্জা বিস্ময় সৃষ্টি করে। রাজবাড়ীর মেয়ের দৈন্য যেন বেশি করে চোখে পড়ে। দারিদ্রের জ্বালায়, সংসারের খাটুনীতে বাসনার যৌবন শুকিয়ে ওঠে। এবং এর জন্য তার মনে বিক্ষোভ আর অভিমান পুঞ্জীভূত হতে থাকে। বিয়ের পরও দেখা যায় স্বামীকে সে গরীব শ্বশুরবাড়ী উঠতে দেয় না। পাছে তাদের দীনতা ধরা পড়ে যায়। দরিদ্র জীবন ভাল কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী ট্রাজেডি হল ঐশ্বর্যহীন জমিদার পরিবারে জন্মানো। এ যেন এক অভিশাপ। ঘরেবাইরে এমন কি নিজেদের মধ্যে, নিজের অন্তরের মধ্যেও সেখানে লুকোচুরি চলেছে; ফাঁকা সম্মানবোধটা যেন কোনক্রমেই গুঁড়িয়ে না যায় সর্বদাই এই চেষ্টা। এবং এ বাড়ীর ছেলেমেয়ের মনের মধ্যে চাপা বিক্ষোভ, সর্বদাই কাজ করতে থাকে। তারা কিছুতেই বাপ-মা বা পরিবারের আপনজন হতে পারে না—অতিমাত্রায় স্বার্থপর হয়ে ওঠে। নিজেকে সুখী করতে চায়।

সে সম্পর্কেই লেখক লিখেছেন "ছেলে অতীন বিশ্বাসও কি তার এই সাত-পুরুষের ভিটাকে কোনদিন ভাল চোখে দেখতে পেরেছে?"......যেন একটা অপমানের কুণ্ড, আর বেশিদিন এখানে থাকলে অতীন বিশ্বাসের মত শিক্ষিত ও সুন্দর চেহারার জীবন যেন জোঁক আর শেওলার কামড়ে পচে যাবে। রসিকপুরের রাজবাড়ীর ছেলে এই পরিচয়টা কারও কাছে প্রকাশ করাই একটা অপমান।"

লক্ষ্য করতে হবে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বা তারাশঙ্করের সঙ্গে বর্তমান

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। সম্ভবতঃ জমিদারবংশের আরও কয়েক অধস্তন পরের পুরুষদের কথাই বলেছেন সুবোধ ঘোষ। তাই জলসাঘরে রায়বংশের শেষ প্রদীপ বিশ্বম্ভর রায় অথবা রবীন্দ্রনাথের নয়ানজোড়ের বাবুবংশীয় ঠাকুরদা যখন পুরানো দিনের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অথবা পুরানো ঠাঁট বজায় রাখার দরুন লোকের কাছে উপহাসাস্পদ হয়ে ওঠেন, তখন রসিকপুরের রাজবাড়ীর ছেলেমেয়েরা জমিদারবংশে জন্মানোটাই একটা লজ্জা বলে মনে করে। অবশ্য তার আগের পুরুষে কমল বিশ্বাসের মনে তখনও কিছু অহংবোধ ও শূন্যতাকে চাপা দেবার চেষ্টা দেখা যায়। কারণ তিনিও শিশুকালে কিছু ঐশ্বর্য চোখে দেখেছিলেন—যা আজকের অতীন বা বাসনারা কিছুই দেখে নি। কাজেই কমল বিশ্বাস- মোহরের কলসীর কিংবদন্তীতে এখনও যেটুকু বিশ্বাস রাখে তার পুত্রকন্যারা সে বিশ্বাসও হারিয়েছে। তারা শুধু দেখেছে দুঃখ দারিদ্র এবং সেই কারণে অতীত গৌরবের দিনগুলো তাদের কাছে সুখবহন করে না—দুঃখই বাড়ায়। লজ্জা আর অপমান বোধ জাগিয়ে তোলে। তাই জমিদারের ঠাট বজায় রাখার চেয়ে বরং সাধারণ মানুষের মত বাঁচাটাকেই তারা শ্রেয় বলে মনে করে। তাই বাবা কমল বিশ্বাসের বাহ্যিক ঠাঁট বজায় রাখার জন্য, মেয়েকে বড় ঘরে বিয়ে দেবার জন্য—তাদের সঙ্গে ভদ্রতা করার জন্য—ফন্দি আঁটার ব্যাপারটাকে কোনও দিনই সমর্থন করে নি অতীন যদিও সে হীন চেষ্টার শিকার হতে বাধ্য হয়েছে বংশের মানরক্ষার অজুহাতে। ছেলে আর মেয়ের বিয়েতে কমলবাবু যথেষ্ট জাঁক করলেন সে সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেছেন "রাজবাড়ীর বনেদী মেজাজ যেন শ্মশানের ধূলো থেকে আবার জীবন্ত চাঙ্গা হয়ে উঠে একটা কীর্তি করে রসিকপুরের থেকে পাতিপুকুর পর্যন্ত অঞ্চলটার অনেক মানুষের মনে অনেক চমক লাগিয়ে দিল। কুটুম্বরাও স্বীকার করলেন—কমলবাবুর অবস্থা পড়ে গেলেই বা কী? সাতপুরুষের সেই বনেদী স্বভাব তো যাবার নয়।"

কিন্তু বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়ে কেতকীর চোখে এই সমস্ত ফাঁকি একদিনেই ধরা পড়ে গিয়েছিল তবে তার জন্য প্রতিশোধস্পৃহা তার জাগে নি বরং গভীর সহানুভূতি দিয়েই সে সবকিছু দেখতে চেয়েছিল এবং এই সংসারের অর্থাভাব অনটন সে মেটাতে চেয়েছিল নিজে চাকরি করে। কেতকী জমিদারের বংশের এই হৃতশ্রী অবস্থাটাকে ব্যঙ্গ করে নি তার জন্য দরদ অনুভব করেছিল। সেই কারণেই সে সকলের কাছে শ্রেয়সী বলেই শ্রদ্ধা পেয়েছে। এই কাহিনীর উপসংহারে এবং নামকরণে সম্ভবতঃ সে দিকটির ওপরই আলোকপাত করতে পেরেছেন লেখক। অতএব বলা যায় সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় এবং পরিণামের আর এক দিগন্ত এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে—যে দিক ইতিপূর্বে অনালোচিত ছিল।

# অমিয় ভূষণ মজুমদার

গড় শ্রীখণ্ড—অমিয় ভূষণ মজুমদারের গড় শ্রীখণ্ড উপন্যাসে একদিকে সামন্ত পরিবার ও অন্যদিকে প্রজাসাধারণের জীবনচিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে জমি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা, মহাজন-প্রজার সম্পর্ক, প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথাও এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। তা ছাড়া এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামতেরও সমালোচনা আছে।

চিকন্দি অর্থাৎ গড় শ্রীখণ্ডের জমিদার সান্যালরা। তাঁরা গ্রামেই থাকেন রায়বংশও এ গ্রামের এককালীন জমিদার ছিলেন। তাঁদেরই আত্মীয়। কিন্তু রায়-বংশ বহুদিন শহরবাসী। গ্রামের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। সান্যালরা বহু শরিকে বিভক্ত এবং পরস্পরের মধ্যে জমিসংক্রান্ত মামলামোকদ্দমা লেগেই থাকে। মহিম সান্যালের সঙ্গে সান্যাল মহাশয়ের বিরোধের চিত্রে তারই ইঙ্গিত। জমিদার পরিবারের সাবেকী চাল, প্রাসাদবাড়ীর বর্ণনা যথারীতি সামন্ততন্ত্রের চিরন্তন ঐতিহ্যই ফুটিয়ে তুলেছে। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যারিস্টার পরিবারের মেয়ে সুমিতির দৃষ্টি দিয়ে সে দিকটি আলোচিত করার চেষ্টা আছে। স্নানাগারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখকের মন্তব্য—"সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আর একটা নিদর্শন।"

সান্যাল গৃহিণী অনুসূয়া সুমিতির পরিচয় জেনেও যখন বিনা প্রতিবাদে তাকে আশ্রয় দিলেন—তখন তাঁর এই ঔদার্য দেখে সামন্ততান্ত্রিক কথাটা আবার মনে হল সুমিতির—"হয়তো আভিজাত্যের আত্মাভিমান না থাকলে হয়তো বা তার আশ্রয় পাওয়াই দুরূহ হতো। এরা অভিজাত বলেই নীরব উপেক্ষায় তাদের মতামতটা পরিস্ফুট করে দিয়েছে।" রূপ লাবণ্যের অধিকার নিয়েই উকিলের মেয়ে অনুসূয়া একদিন এই সান্যাল পরিবারে বধূ হয়ে আসবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু জমিদারচরিত্র সম্পর্কে কতগুলি পূর্বতন ধারণা নিয়ে তিনি এসেছিলেন—জমিদাররা চরিত্রহীন, সুরা আর বাঈজী নিয়ে থাকেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বহুদিন তিনি মানিয়ে নিতে পারেন নি এ সংসারে। এর পর পরবর্তী জীবনে পুত্রসম কনিষ্ঠ দেবরের বধূ নির্বাচনে শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে এনে তিনি রক্ষণশীলতার প্রাচীরের মধ্যে কিছু আলো আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ছোটবৌ সুকৃতি কেবল শিক্ষিতা ছিল না—ছিল রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও যুক্ত। এই পরিবারে সামন্ততন্ত্রের অচলায়তনের মধ্যে প্রথম রাজনীতির হাওয়া লাগল। সেই রাজনীতি এ বাড়ীর বড়ছেলেতেও সংক্রামিত ছিল কিন্তু তার পথ

বিপ্লবের পথ নয় ছিল গান্ধীয়ানা বা অহিংসার পথ, সেই সূত্রেই তার অন্তরীণ বাস এবং সুকৃতির বোন সুমিতির সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন।

এদিকে গ্রামের মহাজন চৈতন্য সাহার সঙ্গে প্রজাদের বিরোধ সৃষ্টি হতে থাকে। এর পিছনে যে কারণ ছিল তা হল কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা। জমির দাম পড়ে যেতে থাকলে প্রজারা চৈতন্য সাহার কাছে বীজধান পর্যন্ত বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে মহাজনের মজুত ভাণ্ডারে ফসলের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও অচিরে প্রজাদের মধ্যে হাহাকার লেগে যায়। তখন চৈতন্য সা প্রজাদের মধ্যে জমির খাই-খালাস[1] বান্দাবস্ত করে। খাজনা দেবার দায়িত্ব থাকে তার নিজের। কিন্তু সে খাজনা দেয় না। তখন প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। মহাজন জমিদার চৈতন্য সাকে তারা বলে চিতিসাপ। তার বিরুদ্ধে তাদের মত হল—"চৈতন্য খাজনা দিবিনে খাইখালাসি সব খাস হবি কোনদিনই আর আমাদের হাতে—ফিরবি নে।' বকেয়া খাজনার দায়ে জমিদার অবশ্যই সব জমি খাস করে নেবেন। তখন প্রজাদের কোনও অধিকার থাকবে না তাতে। তার উত্তরে কেউ কেউ পরামর্শ দেয় খাস জমি হলে তারা বরগা চেয়ে নেবে, অর্থাৎ জমিদারের ভাগচাষী হতে পারবে। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন আছে। কারণ বাকি খাজনা না দিলে কোনো জমিদার বরগা দেয় না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেবার চুক্তিতে যারা জমি নেয় তারা হল বরগাদার বা ভাগচাষী তারা প্রজা নয়। প্রজা হল যাঁরা কর দেবার চুক্তিতে জমি নেয়। মহাজনদের দ্বারা এইরকম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি, নির্বুদ্ধিতার ফলে প্রজাদের ভূমিহীন হওয়া—তার উপর মহিম সান্যালের মত জমিদারের চাপ সৃষ্টি তো আছেই। প্রজাদের জীবনে এ তো চিরাচরিত ঘটনা। জমিদার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক সামন্তশ্রেণীর অত্যাচারী এবং প্রজানুরঞ্জকতা দুদিকের কথাই বলেছেন। রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে সে কথা বলানো হয়েছে। রায়রা জমিদারি করেছে। সান্যালরাও। কিন্তু কোনোদিন কোনো সান্যালকর্তা অত্যাচার করে নি প্রজার উপর। লোকে বলতো "কাছারী তো সান্যাল কাছারী, যাও বিচার পাবাই।"

সেদিন সান্যালমশাইয়ের মনে পড়ে গিয়েছিল উভয় বংশের অত্যাচারী পূর্ব-পুরুষদের কথা। তখন তার মনে হয়েছিল—"সেকালের সেই মহাবাহু বীর্যবান পুরুষদের যেন অত্যাচার প্রবৃত্তি মানাতো। যেন কোনো মহৎ শিল্পীর সুরাপান। তখনি তাঁর মনে হয়েছিল, মিহির তো সেসব পুরুষের মতো নয়। ডান হাতে তরোয়াল ধরে রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এমন সামন্ত নয় সে……পারুষ্য

(১) খাই খালাস—জমির সম্পূর্ণ উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক।

মিহিরকে মানায় না। "সান্যাল মশাই ভাবলেন" সেকালে জমিদাররা অত্যাচার করতো, ভালোও বাসতো। এখন দুটির কোনোটিই নয়। বাইরের শাসনের চাপে দুই-ই এক হয়ে গেছে—প্রজা ও জমিদার।" সান্যাল মশাইয়ের মতে জমিদারের পক্ষে খাজনা আদায় করা পাপ নয়। তাই তিনি রামচন্দ্রকে বলেন—"আজকাল তো প্রজারা আক্‌ছার নালিশ করছে জমিদারের নামে আদালতে। প্রয়োজন হলে তোমরাও তাই করো। খাজনা আদায় করা আমার কাছে অন্যায় নয়।"

বলা বাহুল্য লেখক যে সময়কার কথা বলছেন—তখন জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ না হলেও উচ্ছেদ আশঙ্কা জাগছে সকলের মনে। সামন্তশ্রেণীর মধ্যেও উদ্বেগের কালোছায়া পড়েছে। সরকার পক্ষ থেকে জমিদারশ্রেণীর ওপরও নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রজারাও পেয়েছে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করার সাহস। মধ্যবর্তী মহাজনরা ক্রমশঃ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।

এদিকে সান্যাল পরিবারের ছেলেদের মধ্যেও যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের হাওয়া লেগেছে তখন যেসব দিক দিয়েই সামন্তপ্রথার ভিত্তি দুর্বল হয়ে উঠেছে এ কথা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। সেই আশঙ্কা করেই অনুসূয়া বলেছিল—"জমিদারের ছেলে হয়েও সে যখন জমিদারিপ্রথা ধ্বংস করতে চায় তখন তুমি চুপ করে থাকো। তুমি কি বোঝো না ওদের হাতে পড়লে আমার এই শ্বশুরের ভিটের কি দুর্দশা হবে।"

অনুসূয়া বলেছিল—"কিন্তু জমিদারদের উচ্ছেদ করতে গেলে তোমার সঙ্গেই যে প্রথম বিবাদটা বাধবে না তার প্রমাণ কি ?"

তার উত্তরে সান্যালমশাই যা বলেছিলেন—তা থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় সামন্তবংশীয় হলেও নতুন যুগকে বরণ করে নেবার মত নৈতিক সাহস তাঁর আছে। তিনি বলেন—"বাধবেই ধরে নিতে পারো......জমিদাররাও আটাশে ছেলে নয় যে হট বললেই হটে যাবে। আমার সঙ্গে তার বিবাদ হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। লোকে বলবে অমুক সান্যালের ছেলে জমিদারিপ্রথার ধ্বংস কামনা করে অথচ নিজের পৈত্রিক ব্যাপারে অতি ভালো ছেলে। ছেলের এ অপবাদ আমি কখনো সহ্য করতে পারি না। বাপ-বেটার বিবাদ, সেটা কি ধর্মযুদ্ধ হবে না। শুধু আইন বদলানোর আন্দোলন নয়, রক্তপাতও হতে পারে। বড়ো কাজের জন্য রক্তের মতো দামী জিনিসের প্রয়োজন হয় কখনো কখনো।"

বোঝা যায় সান্যালমশাই জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদে ভীত নন। বরং তাঁর মনে যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে। অতএব জমিদারি হারিয়ে তিনি হয়তো বিষাদ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন না।

কিন্তু অনুসূয়া সেদিক থেকে ভীত। জমিদার পরিবারের বনেদীয়ানার সঙ্গে তিনি যেন একাত্ম হয়ে উঠেছেন। সুমিতিকে তিনি এ বাড়ীর রক্ষণশীলতা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দিতে চেয়েছেন। নৃপ ও বুসুকে তিনি জমিদারের ছেলে হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। যদিও শিক্ষার আলোক, গান্ধীর অহিংস নীতি এসবও তাকে প্রভাবিত করেছে। অনুসূয়া চরিত্রটিতে হয়তো এই দুই বিরোধী-ভাবের সমন্বয় দেখাতে চেয়েছেন লেখক—অথচ তার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। বলা বাহুল্য অনুসূয়া—শিবনাথের মা 'জ্যোতির্ময়ী' হতে পারে নি। সাধারণ ঘরের মেয়ে হলেও ছেলেদের সে জমিদারবংশের উপযুক্ত করে মানুষ করতে পারে নি বলেই অনুশোচনা করেছে।

জমিদারের নায়েবচরিত্র বর্ণনায় লেখক সেকালের কিছু কিছু প্রভুবৎসল নায়েবচরিত্রের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিহিংসা গল্পে কিংবা শরৎচন্দ্রের দত্তা গল্পের দয়াল চরিত্রে আদর্শ নায়েবচরিত্র দেখানো হয়েছে। এখানে লেখক আদর্শ নায়েব হবার পক্ষে প্রধান গুণ কি কি তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"নায়েবমশাই তার মামার কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে চাকরিটা পেয়েছিলো, তেমনি পেয়েছিলো দুটি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, তার প্রথমটা হচ্ছে এবংশের নায়েবি করে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, মনিবের পরিবারের প্রায় একজন হয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু বাজে টাকায় লোভ রাখতে নেই।"

জমিদার শেষ পর্যন্ত নায়েবমশায়ের বুদ্ধিকৌশলে প্রজাদের কাছ থেকে অধিক অর্থ আদায়ের জন্য জমির পত্তনি বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা করলেন। ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ফসলের মূল্য খাজনার চাইতে বেশি। সেই সঙ্গে আছে পত্তনি বন্দোবস্তের' নগদ সেলামী। বলা বাহুল্য জমিদারি আইন এবং পত্তনি আইনে এই সব প্রশ্ন জড়িত আছে। একদিকে প্রজা শোষণ আর একদিকে জমিদারের নূতন বাড়ী নির্মাণ, উচ্চ শিক্ষার জন্য ছেলেকে বিলাত পাঠানো, চিরাচরিত জমিদারিপ্রথায় পুত্রবধূ ও পৌত্রকে সোনার মুকুট পরিয়ে দরবারে প্রজাদের দর্শনার্থে বসিয়ে রাখা ও মোটা পরিমাণ নজর আদায় করা, এ সবেই সামন্ত প্রথার চিরাচরিত চেহারাই ফুটে উঠেছে।

কিন্তু সামন্ততন্ত্রের-প্রভাবে দেশব্রতী নৃপনারায়ণেরও আচরণে পরিবর্তন এল। খদ্দর পরা অথবা অহিংসার পথ যে শুধুই একটা রাজনৈতিক মোহ—এ ভুল তার ভাঙতে শুরু করল যখন থেকে তখন থেকে তার পোষাকে এল পারিপাট্য, শিকরা

(১) পত্তনি বন্দোবস্ত—জমিতে প্রজা বসানো ( কর আদায় করানোর জন্য )

করার নেশাও দেখা দিল। জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ নিয়ে পিতাপুত্রে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের যে আশঙ্কা অনুসূয়া করেছিল তা অমূলক বলে প্রমাণিত হল। নৃপ ছিল সম্পূর্ণ গ্রামবিমুখ। সেই সঙ্গে সুমিতির সঙ্গেও নৃপনারায়ণের আদর্শের অমিল ঘটল অথচ একদিন এই রাজনৈতিকতার সূত্রেই এরা পরস্পর কাছে এসেছিল। এবং আদর্শ হারিয়ে নৃপনারায়ণ যেন নিতান্তই অর্থহীন হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত গ্রাম দেখার নেশায় সে বেরিয়ে পড়েছে। এইখানেই সুমিতি হেরে গেছে। প্রচলিত প্রথাকে না মেনে দুঃসাহসী কাজের জন্য তাকে ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে। কারণ অনুসূয়ার মতে "ওদের ভালবাসা নিবে গেছে।" সান্যালমশাইয়ের ধারণা বিলিতী ও শহুরে শিক্ষা ঢুকে পড়ে সান্যাল পরিবারকে রায়বংশের মতই উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবে। সেই সঙ্গে সকলে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎসাহ প্রকাশ করাতে সান্যালমশাই যেন দেখতে পেলেন সুদূর ভবিষ্যতে গড় শ্রীখণ্ড তথা চিকন্দি চাষীদের হাতে পড়ে নতুন চাষের জমি হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ গ্রামের উন্নয়ন মানে চাষীদের প্রাধান্য—সেই সঙ্গে জমিদারের মালিকানারও পরিসমাপ্তি। সান্যালমশাই তাই গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনায় উৎসাহিত হন না—সম্ভবতঃ কোন সামন্তই তা চান না। যাই হোক গড় শ্রীখণ্ডের লেখক শ্রীঅমিয়ভূষণের বক্তব্য ও রচনারীতির উৎকর্ষ অপকর্ষ নিয়ে আলোচনা না করে আমরা এ কথাই বলব—সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের এক পূর্ব ভূমিকাই যেন এখানে করা হয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের সামন্ততান্ত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং রাজা-প্রজার সম্পর্কই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

# গ্রন্থপঞ্জী


| | | |
|---|---|---|
| (১) | বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস | ডঃ সুকুমার সেন |
| (২) | বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত | ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় |
| (৩) | বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা | ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় |
| (৪) | বাঙ্গালীর ইতিহাস | ডঃ নীহাররঞ্জন রায় |
| (৫) | জমির মালিক | অতুলচন্দ্র গুপ্ত |
| (৬) | বিশাল বাংলা | রাধাকমল মুখোপাধ্যায় |
| (৭) | কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্‌ | রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় |
| (৮) | প্রতাপাদিত্য চরিত্র | রামরাম বসু |
| (৯) | পশ্চিমবঙ্গীয় ভূমিসংস্কার আইন | এন. গোস্বামী (কলিঃ হাইকোর্ট) |
| (১০) | প্রজা স্বত্ব আইন | প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত |
| (১১) | An advanced History of India | K. K. Dutta, R. C. Mazumder & H. C. Roy Chowdhury |
| (১২) | Economic History of Bengal | N. K. Sinha |
| (১৩) | Sultanate of Delhi | Srivastav |
| (১৪) | Studies in Mughal India | S. L. Sikri |
| (১৫) | India Since 1526 | Mahajan & Sethi |
| (১৬) | Mughal Empire in India | S. R. Sharma |
| (১৭) | History of Bengal | Vol. I & Vol. II, R. C. Mazumdar & J. N. Sarkar |
| (১৮) | Bengal Peasant Life | Lalbihari Dey |
| (১৯) | সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ( ১ম খণ্ড ) | বিনয় ঘোষ |
| (২০) | বাংলার ভূমিব্যবস্থার রূপরেখা | বিনয় চৌধুরী |
| (২১) | West Bengal Land Reform Act | A. N. Saha |
| (২২) | ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ( ১ম খণ্ড ) | সুপ্রকাশ রায় |

# শব্দার্থ টীকা

| | |
|---|---|
| আমলা | অধিকার প্রাপ্ত কর্মচারী, (Agent, officer.)। |
| আমলাতন্ত্র | আমলাদের শাসন। |
| আমীন | রাজস্ব সংগ্রাহক ও রাজস্ব নির্দ্ধারক। |
| আর্জি | আবেদন। |
| আবওয়াব | অতিরিক্ত কর। বাজে কর (Cesses)। |
| আহ্‌লিকর | (ahal-i-kar) সরকারী অফিসের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। |
| ইজারা | নির্দিষ্ট খাজনায় জমির বন্দোবস্ত (lease) দেওয়া অথবা নেওয়া। |
| ইজারাদার | নির্দিষ্ট খাজনায় জমির বন্দোবস্ত বা ইজারা যে গ্রহণ করে। |
| উজির | সুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। |
| ওয়াকিবহাল | জ্ঞাত করান। |
| ওয়াশীল | আদায়, উশুল। |
| করচা | যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার নাম, আদায় ও বাকীর হিসাব থাকে। |
| কবচ | খাজনা দিয়ে প্রজারা যে রসিদ পায়, দাখিলা। |
| কবুলিয়ত | যে পত্র দ্বারা গ্রহীতা পাট্টাগ্রহণ স্বীকার করা হয়। |
| কড়া | অত্যল্প পরিমাণ। |
| কানুন গো | পরগণার অধিকর্ত্তা। তাঁর হাতে প্রচুর ক্ষমতা থাকত। তিনি জমির হিসাব রক্ষক অধিকর্ত্তা ছিলেন। |
| কারকুণ | গোমস্তার উপরস্থ কর্মচারী। প্রতিটি মরশুমী ফসলের পরিসংখ্যান করে। |
| খত | ঋণপত্র। |
| খতিয়ান | যে কাগজে পৃথক নামে হিসাব থাকে। (ledger book) |

| | |
|---|---|
| খাইখালাসী | জমির উপস্বত্ব থেকে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থায় বাধ্য। |
| খাজাঞ্চী | খাজনা আদায় কারী কোষাধ্যক্ষ। |
| খারিজ দাখিল | নাম পরিবর্ত্তন। |
| খাস তালুক | যে তালুক বা জমির খাজনা মালিক নিজে আদায় করে। |
| খাস তৌসিলভুক্ত | যে জমি অধিকারীর খাস অর্থাৎ নিজের দখলে আছে। |
| খিল জমি | যে জমি আপাতত পতিত আছে। |
| খেতাব | সম্মানসূচক উপাধি। |
| খোদকস্ত | যে প্রজা যে গ্রামে বাস করে, সেখানেই চাষ করে। |
| গোমস্তা | জমিদার বা মহাজনের কর্মচারী। |
| ঘড়িয়াল | যে ঘড়ি বাজায়। |
| চাক-চান্দী | রজত চক্র ( রুপার টাকা )। |
| চাকরাণ জমি | সরকারী কর্মচারী বা জমিদারের ভৃত্যদের বেতনের পরিবর্তে প্রদত্ত জমি। |
| চাকলাদার | জমিদারীর অন্তর্গত কয়েকটি পরগণা ( চাকলার ) অধিকারী। |
| চিঠা | যে খাতায় মহাজনেরা ক্রেতাকে দেয় ও প্রাপ্য টাকার হিসাব লিখে দেয়। |
| চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত | ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক ভূমিব্যবস্থা পারমানেণ্ট সেটলমেণ্টের প্রতিশব্দ। |
| চৌকিদার | গ্রামের পাহারাদার। এরাও জমিদারদের কাছ থেকে চাকরাণ জমি পেত। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চৌকিদারী আইন পাশ হয়। এরা স্থানীয় পুলিশ বিশেষ ছিল। |
| চৌথা | রাজস্বের চতুর্থাংশ। মারাঠারা প্রথম এই কর আদায় করত। এ ছাড়া ভূমিস্থিত বৃক্ষাদি কাটলে জমিদার বা তালুকদারকে বৃক্ষের মূল্যের এক চতুর্থাংশ দিতে হত। তাকেও চৌথা বলে। |

| | |
|---|---|
| চৌধুরী | বর্ত্তমানে উপাধি বিশেষ। চতুর্দ্ধুরীণ শব্দের অপভ্রংশ। পূর্বে গ্রাম-প্রধানদের চৌধুরী বলা হ'ত। |
| ছ আনি | জমিদারীর ছয় ভাগ বা অংশ। |
| ছাটে জমি | খণ্ড জমি। |
| জমা | রাজস্ব (Rent)। |
| জমাওয়াশীল | রাজস্ব আদায়। |
| জমা বন্দী | রাজস্ব ধার্য করা। |
| জরিপী | জমির মাপ। |
| জরীপ আইন | ভূমির মাপজোক করে গ্রামের সীমা ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করার জন্য ১৮৭৫ সালে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। |
| জামিনদারী | অন্য ব্যক্তির কাজের জন্য যখন অপরে দায়িত্ব নেয়। |
| জায় | বিস্তারিত বিবরণ। |
| জায়গীর | পুরস্কার স্বরূপ রাজসরকার থেকে যে জমি প্রদত্ত হয় (Free grant of land)। |
| জায়গীরদার | জায়গীর গ্রহণকারী ব্যক্তি। |
| জোতদার বা যোৎদার | কৃষি স্বত্ব যুক্ত জমির মালিক। |
| টেনেন্সি এ্যাক্ট | বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫ সালে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। পরে এই আইন দুই তিন বার সংশোধিত হয়। |
| ডিক্রী | বাদীর প্রার্থনা মঞ্জুর সূচক হুকুম। |
| ডিস্‌মিস্ | বাদীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করা। |
| ডিহি | মৌজার সমষ্টি (মৌজা গ্রাম)। |
| ডিহিদার | গ্রাম্য মণ্ডল (Headman of Dehi)। |
| তছরূপ | চুরি বা আত্মসাৎ করণ। |
| তজ্‌বিজ | বিচার। |
| তরফদার | তহশীলদারের পক্ষের কর্মচারী। |
| তবাকাৎ গ্রন্থ | আকবরের রাজত্বকালে রচিত গ্রন্থ তবাকাৎ-ই-আকবরী। রচয়িতা নাজিমুদ্দীন আহম্মদ। |

| | |
|---|---|
| তহশীল, তহশীলদার | খাজনা, খাজনা সংগ্রাহক। |
| তামাম্ জমা | সমস্ত জমা। |
| তারিখ-ই-বাংলা | মুর্শিদকুলি খাঁর সমকালীন ঐতিহাসিক সলিমুল্লা বিরচিত। |
| তালুক | জমিদারী অপেক্ষা অল্পবৃহৎ ভূসম্পত্তি। |
| তালুকদার | বাংলাদেশে জমিদারের পরেই ছিল তালুক-দারের স্থান। তারা সরকারকে সরাসরি খাজনা দিত। |
| তাহুত | সরকার বা জমিদারকে দেয় খাজনা। |
| তেভাগা আন্দোলন | ১৯৪৬ সালে ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ লাভ করার জন্য বাসের হাটে যে কৃষক সংগ্রাম হয়—তারই নাম তেভাগা আন্দোলন। |
| তেহাই কড়ি | এক তৃতীয়াংশ |
| তোবাখানা | খাদ্য ভাণ্ডার |
| থাক | জমির সীমা নির্দ্দেশক কাগজপত্র |
| থোকা | যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার আদায় বাকী প্রভৃতি পৃথক পৃথক ফর্দ্দে লিখিত হয়। |
| দপ্তরী | যে ব্যক্তি কাছারির খাতাপত্র বাঁধার ভার নেয়। |
| দরপত্তনি | পত্তনীদারের নিকট গৃহীত পত্তনী, (Tenure held, immediately under the Patta-nidar)। |
| দশশালা বন্দোবস্ত | দশ বৎসরের মেয়াদে লর্ড কর্নওয়ালিশ জমিদারদের সঙ্গে খাজনার যে বন্দোবস্ত করেছিলেন। |
| দশানি | দশ ভাগ ( অংশ )। |
| দস্তিদার | নবাবী মোহর যার জিম্মায় থাকত। |
| দস্তুর | নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক, ক্রয় মূল্য। |
| দাখিলা | খাজনার রসিদ। |
| দেওয়ান | দেওয়ান বা উজির মোগল আমলে রাজস্ব এবং অর্থ বিভাগের সর্বোচ্চ পদস্থ রাজ-কর্মচারী ছিলেন। |

| | |
|---|---|
| দেবত্র | দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পত্তি। |
| ধানের বাড়ি | সুদ বাড়াবার জন্য ধান ধার দেওয়া। |
| নজর<br>নাজারাৎ | বাদশাহ নবাব বা জমিদারকে<br>সম্মানুসূচক অর্থ। |
| নায়েব | মফঃস্বলের জমিদারের প্রধান কর্মচারী। |
| নিরিখ | হার (Rate)। |
| নিশান | চিহ্ন। |
| নিষ্কর | যে জমির জন্য কর দিতে হয় না (Rent free)। |
| নিয়োগী | নিয়োগ কর্ত্তা। পরে উপাধি বিশেষ। |
| পঞ্চম রেগুলেশন | ১৮১৩ সালের পঞ্চম রেগুলেশনে জমিদারদের কয়েদ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। |
| পতিত জমি | অনাবাদী জমি। |
| পত্তনি | জমিদারের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমি নেওয়া (lease)। |
| পত্তনি রেগুলেশন | পত্তনি গ্রহণ বিষয়ক সরকারী সিদ্ধান্ত। ১৮১৯ সালের পত্তনি রেগুলেশনে ইজারা দেওয়া আইন সম্মত হয়। |
| পত্তনিদার | যে পত্তনি নেয়। |
| পাইক | পদাতিক শব্দ থেকে। এখানে যে খাজনা আদায় করে। |
| পাইকস্ত রাইয়ত বা প্রজা | যে প্রজা এক জমিদারের অধিকারে বাস করে অন্য জমিদারের অধিকারে চাষ করে। |
| পাটোয়ারী | গ্রামীণ সমবায়ের সেবক। তারা সরকারী কর্মচারী নয়। |
| পাট্টা | জমিদার প্রজাকে ভূমি দখল দেবার জন্য যে প্রমাণ পত্র লিখে দেন। |
| পার্বণী পঞ্চক | পর্ব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত সামান্য কর অথবা পঞ্চ তিথিকে অবলম্বন করে যে উৎসব হয় তার পার্বণী। |

| | |
|---|---|
| প্যাদা | পেয়াদা। যে প্রজার খাজনা বাকী সে যতক্ষণ টাকা দিতে না পারে ততক্ষণ যে কর্মচারী উপস্থিত থাকে। |
| পোদ্দার | জেলার কোষাধ্যক্ষ। চাষীদের কাছে টাকা নিত এবং অর্থ আদায়ের রসিদ দিত। |
| প্রজাস্বত্ব আইন | ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। পরে এই আইন সংশোধিত হয়। |
| ফরমান | রাজাদেশ। |
| ফরিয়াদী | বাদী। |
| ফৌজদার | ১৭৬৫-১৭৯৩—এই সময় প্রতি জেলায় অপরাধীর বিচারের জন্য একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত হত। |
| বক্‌শী | মুসলমান আমলের কর্মচারী। এদের হাত দিয়ে সরকারী অর্থ বিলি করা হত। এরা বিশেষতঃ সৈন্যদের পে-মাস্টার ছিল। |
| বর্গাদার | কোন ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তিকে-উৎপন্ন ফসলের ভাগ দেবার সর্তে জমি আবাদ করতে দেয় তখন সেই চাষী 'বর্গাদার' নামে পরিচিত হয়। |
| বর্গী | প্রাচীন কালের মারাঠা সৈন্য। |
| ব্রহ্মত্র | ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত জমি। |
| বাকি জায় | যে কাগজে অনাদায়ী রাজস্বের পরিমাণ দেখানো হয়। |
| বাদী | অভিযোগকারী ( plaintiff )। |
| বারোভুঁইঞা | মোগল বিরোধী বারোজন ভূস্বামী। |
| বাড়ি ( ধানের বাড়ি ) | সুদে বাড়াবার জন্য ধান দেওয়া। |
| বাড়ীদার | বাড়ীওয়ালা। |
| বিত্‌কিচি | হিসাব রক্ষক। |
| বিলি | বিতরণ করা। |
| বেগার | বলপূর্বক খাটানো। |
| ভাগচাষী | যে চাষীকে খাজনার সর্তে জমি অর্পণ বা বন্দোবস্ত করা হয়। |

| | |
|---|---|
| মজুমদার | সরকার থেকে প্রদত্ত অগ্রিম লোন বা কর্জ্জ এর হিসাব রক্ষক। বর্ত্তমানে উপাধি বিশেষ। |
| মজীল | তামাসা করা। |
| মধ্যস্বত্ব ভোগী | মধ্য স্বত্বভোগী বলতে বোঝায় যে বা যারা প্রজাপত্তন করে খাজনা আদায়ের জন্য জমি চাষ আবাদ করান এবং এই উদ্দেশ্যে জমিদারের নিকট থেকে জমি ভোগ করার স্বত্বপ্রাপ্ত হন। |
| মহাজন | বণিক বা ঋণদাতা। |
| মহাল | জমিদারি বা ভূ সম্পত্তি, স-কর ভূমি। |
| মালগুজারী | রাজস্ব, জমির জন্য সরকারে যে রাজস্ব দিতে হয়। |
| মুকদ্দম | সরকার নিযুক্ত বিচার বিভাগীয় কর্মচারী, যে গ্রামস্থ লোকের বিবাদ মেটায়। |
| মুৎসদ্দী বা মুৎসুদ্দী | সরকারী অফিসের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। |
| মুন্সী | চিঠিপত্রের মুসাবিদা করে যে কর্মচারী। |
| মুন্সেফ | পরগণার নিম্ন আদালতের বিচারপতি। |
| মুসমা | ছাড়্। |
| মোকররী বা মৌকররী | চিরস্থায়ী। |
| মোরল্যাণ্ড | ঐতিহাসিক W. H. Moreland. |
| মোহর করা | সীল মোহর বা তাহার ছাপ। |
| মৌজা | গ্রাম বা নির্দিষ্ট চৌহদ্দী ভুক্ত গ্রাম। |
| রায়ত | প্রজা। যে ব্যক্তি স্বয়ং অথবা পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি দ্বারা অথবা চাকর বা জনমজুর দ্বারা কিংবা অংশীদারের সাহায্যে চাষ করার জন্য জমির স্বত্ব অর্জ্জন করেন। যাঁরা চির-স্থায়ী ভাবে নির্দ্দিষ্ট খাজনা জমা রাখেন। |
| রায়জাদা | রায় ( রাজা অর্থে ) জাদা ( পুত্র ) রাজপুত্র। |
| রোকড় | জমাখরচের খাতা (Cash book)। |
| লস্কর | পদাতিক সৈন্য। |
| লাখেরাজ | যে জমির জন্য রাজস্ব দিতে হয় না। নিষ্কর ও লাখেরাজ জমির পার্থক্য হ'ল এই লাখেরাজ জমি রাজসরকারের প্রদত্ত আর নিষ্কর জমি প্রজাকে জমিদারের দান (Revenue free আর Rent free)। |
| লাটবন্দী | যথাসময়ে খাজনা না দেওয়ায় জমি নিলামে ওঠা। |
| শিকদার | প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের শাসক। |

| | |
|---|---|
| শিকস্তী | জমির যে অংশ নদীর দ্বারা ভঙ্গ হয়েছে। |
| শিরোপা | সম্মানসূচক শিরস্ত্রাণ। |
| শিবোত্তর | শিবের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পত্তি। |
| শেহা | যে কাগজে দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব ও বাকি কাটা হয়। |
| শুখা | অনাবৃষ্টি বশতঃ অজন্মা, খরা। |
| সনদ | ভূমি বা সম্মানসূচক নিয়োগ পত্র। |
| সরকার | মোগল আমলে সমস্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি সুবা এবং সুবাগুলি সরকারে বিভক্ত ছিল। |
| সামন্ত রাজা | বৃহৎ ভূস্বামী। |
| সালতামামি | সংবাৎসরিক জমা খরচের হিসাব। |
| Sale law | সূর্যাস্ত আইন ইত্যাদির ফলে খাজনা অনাদায়ে জমিদারের জমি নিলামে বিক্রয় ব্যবস্থা। |
| সেলামি | নজর। |
| সুবা | প্রদেশ। |
| সুবাদার | প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা। |
| সূর্যাস্ত আইন | চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সূর্যাস্ত সময়ের মধ্যে খাজনা না দিলে সরকার জমিদারী নিলামে বিক্রয় করে দিতেন। |
| সেরেস্তা | কাছারি, জমিদারী সংক্রান্ত কাজের দফ্তর। |
| সেরেস্তাদার | ভূমি রাজস্ব এবং করের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য সেরেস্তাদার নিযুক্ত হত (Highest ministerial officer of the Court)। |
| হফ্ত পঞ্চম্ | ১৭৯৯ সালের সপ্তম রেগুলেশন ও ১৮১৩ সালের পঞ্চম রেগুলেশন একত্রে হফ্ত পঞ্চম বলে উল্লিখিত হয়। |
| হাজা | অতি বৃষ্টিতে যখন শস্য নষ্ট হয়। |
| হালদার | সরকারী কর্মচারী বিশেষ। |
| হাসিল ( হাঁসিল ) | আবাদ করা। |

# শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা সংখ্যা | লাইন | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২ | ৬ | চন্দ্রানীড় | চন্দ্রাপীড় |
| ৭ | ২০ | বণিকশ্রেণিকে | ধণিকশ্রেণীকে |
| ১০ | ২৫ | বাংলাসাহিত্য | বাংলাসাহিত্যে |
| ১৪ | ৩ | কলিঙ্গরাজ | কলিঙ্গরাজ্য |
| ১৪ | ২৮ | হাজার কলিঙ্গ | হাজাব কলিঙ্গ |
| ২০ | ২৩ | ভূস্বাম | ভূস্বামী |
| ২৩ | ১ | নিজ বংশ রূপে | নিজ বংশকে রাজবংশরূপে |
| ২৪ | ২৪ | কাশীরামেরই | কাশীনাথেরই |
| ২৭ | ১ | ধীরেন্দ্রকুমার | ধীরেন্দ্রনাথ |
| ৩১ | ১১ | জমিনদারী | জামিনদারী |
| ৩২ | ১৯ | শূণ্যগর্ত | শূণ্যগর্ভ |
| ৩৩ | ২৩ | ১৭৯০ | ১৭৯৩ |
| ৩৮ | ১৮ | সমাজতন্ত্রের | সামন্ততন্ত্রের |
| ৪৬ | ৩১ | তোরাশ | তোরাপ |
| ৫০ | ১৮ | লাখেরাজদের | লাখেরাজ |
| ৫২ | ৪ | চোট | চৌট |
| ৬৪ | ৮, ৯ | জোড়া দীঘির | জোড় দীঘির |
| | | চৌধুরী পরিবার | উদয়াস্ত |
| ৬৫ | ৯ | দেউলিরা | দেউলিয়া |
| ৬৯ | ১৬ | হাদের | যাঁহাদের |
| ৭২ | ৯ | হফরম | হফ্ত |
| ৭৮ | ২৭ | বাজ বুনেছে | বীজ বুনেছে |
| ৭৯ | ১ | বাকা থোকা | বাকী থোকা |
| ৮২ | ২১ | হাতে | হতে |
| ৮৩ | ২৪ | তাব | তাই |
| ৮৭ | ৩ | হার | জয় |
| ৮৩ | ৩০ | তাঁহাদের সেই | তাঁহাদের বাস সেই |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯৬ | ৩১ | কেউ কেউ | কেউ কেউ। |
| ৯৮ | ২৮ | ওপর দিয়েছেন | ওপর জোর দিয়েছেন |
| ১০৫ | ৯ | সিঃ সহায় | নিঃসহায় |
| ১০৭ | ১৬ | জমিদার সে | জমিদার সে কথা |
| ১০৭ | ২৪ | আবিষ্কার | অধিকার |
| ১০৯ | ১৮ | পায়না কখনও | পায়না কখনও। |
| ১১৪ | ১ | সাজগ | সাজস |
| ১২১ | ৯ | মার | মায় |
| ১২৩ | ১২ | অংশভাগে | অংশভোগী |
| ১২৪ | ২ | টোল | ঢোল |
| ১২৫ | ৫ | করতে লাগল | করতে লাগল। |
| ১২৭ | ৪ | এই | এর |